مختصر إظهار الحق

« باللغة البنغالية »

د. محمد أحمد محمد عبد القادر الملكاوي

ترجمة: د/ خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانكير

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2013 - 1434

IslamHouse.com

ইসলাম ও খৃস্টধর্মের তুলনামূলক আলোচনায় আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবীর কালজয়ী গ্রন্থ ইযহারুল হক্ক-এর সার-সংক্ষেপ

সংক্ষেপিত ইযহারুল হক্ক

ড. মুহাম্মাদ আহমদ আব্দুল কাদির মালকাবী
অধ্যাপক, কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ

বঙ্গানুবাদ

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
অধ্যাপক, আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

সূচীপত্র

সংক্ষেপকের পূর্বকথন

প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত। আর সালাত ও সালাম উম্মী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এবং তাঁর পরিবার-অনুসারী ও সহচরগণের উপর।

মহান আল্লাহর তাওফীকে আমি আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহ ইবনু খালীলুর রাহমান কিরানবী উসমানী হিন্দী রচিত 'ইযহারুল হক্ক' গ্রন্থটি সম্পাদনা করি। সম্পাদনার ক্ষেত্রে আমি গ্রন্থকারের নিজের হস্তলিখিত ও তাঁর সামনে পঠিত দুটি সুবর্ণ পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করি। আমার সম্পাদিত ইযহারুল হক্ক গ্রন্থটি চার খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৪১০ হিজরী অব্দে /১৯৮৯ খৃস্টাব্দে। সৌদী সরকারের রিয়াদস্থ ইলমী গবেষণা, ফাতওয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ বিষয়ক কেন্দ্রীয় কার্যালয় তা প্রকাশ করে।

অনেক সহকর্মী আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন যে, আমি যেন "ইযহারুল হক্ক" গ্রন্থটিকে সহজবোধ্য সরল ভাষায় সংক্ষেপ করে এক খণ্ডে প্রকাশ করি; যাতে গ্রন্থটি অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা সহজ হয়। বিশ্বব্যাপী খৃস্টান মিশনারি ও প্রচারকগণ ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল অপপ্রচার চালাচ্ছেন তার প্রতিরোধে সংক্ষেপিত গ্রন্থটি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে তারা আশা করেন। কিন্তু আমার

কয়েকটি গ্রন্থ মুদ্রণের বিষয়ে আমার ব্যস্ততা তাদের এ অনুরোধ বাস্তবায়নের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

এমতাবস্থায় সৌদি সরকারের ইসলামী কর্মকান্ড, ওয়াক্ফ, দাওয়া ও ইরশাদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগের উপ-সচিব ড. আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদ আল-যাইদ-এর পরামর্শ ও নির্দেশনা আমার সহকর্মীদের অনুপ্রেরণার সাথে সংযুক্ত হয়ে একে গতিশীল করে। তিনি আমাকে এ কর্মটি দ্রুত সম্পাদনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন। বিশেষত নতুন পরিস্থিতিতে ক্রুসেডারগণ বিশ্বব্যপী ইসলামের বিরুদ্ধে বৈরিতার প্রকাশ্য ঘোষণা দিচ্ছে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে মুসলিম বিশ্বকে ধর্মান্তরিত করে খৃস্টান বানানোর বিষয়ে তাদের আগ্রহ সগৌরবে প্রকাশ করছে।

এ প্রেক্ষাপটে আমি এ সংক্ষেপিত গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য সক্রিয় হই। যদি কেউ এ গ্রন্থটি অন্য কোনো ভাষায় অনুবাদ করতে চান তবে তার জন্য আমার অনুরোধ যে, বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের যে সকল উদ্ধৃতি এ গ্রন্থে প্রদান করা হয়েছে সেগুলি যেন তিনি তার নিজের মত করে অনুবাদ না করেন; বরং তার ভাষায় প্রচারিত ‘‘বাইবেল’’ থেকে উদ্ধৃত করেন।

এ সংক্ষেপিত গ্রন্থের মধ্যে আমি মূল গ্রন্থের বক্তব্য সুস্পষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত কিছু তথ্য সংযোজন করেছি। যেমন, কোনো কোনো ঘটনার সন-তারিখ, কোনো কোনো ব্যক্তির মৃত্যু-সন উল্লেখ করেছি।

যদি কোনো নাম দুভাবে লেখার প্রচলন থাকে বা কোনো শহরের প্রাচীন ও আধুনিক দুটি নাম থাকে তাহলে আমি দুটি নামই লিখেছি। যেক্ষেত্রে একই নামে দুটি শহর বিদ্যমান সেক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট শহরকে চিহ্নিত করেছি। কিছু পরিভাষা ব্যাখ্যা করেছি। বিষয়বস্তুর সহজবোধ্যতার জন্য খৃস্টীয় ও ইসলামী ঐতিহাসিক কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে কিছু তথ্য সংযোজন করেছি। অস্পষ্টতা দূর করে বিশুদ্ধ উচ্চারণ নিশ্চিত করতে কিছু শব্দে হরকত বা জের-জবর-পেশ ব্যবহার করেছি। মূল গ্রন্থে লেখকের নাম উল্লেখ না করে কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমি এ সকল গ্রন্থের লেখকদের নাম ও তাদের মৃত্যু তারিখ উল্লেখ করেছি। বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের কিছু উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন সংস্করণের ভাষ্য উল্লেখ করেছি। এছাড়া মূল গ্রন্থের কিছু তথ্য আমি আগে পিছে করে নতুন করে সাজিয়েছি; যেন পাঠকের জন্য অধিক সহজ ও উপযোগী হয় এবং তার চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত না হয়।

মূল "ইযহারুল হক্ক" গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায় আমি একটি অধ্যায়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছি। ফলে অধ্যায়টি ইয়াহূদী-খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থগুলির পরিচয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে তাদের গ্রন্থগুলির নাম, বিকৃতি ও রহিত হওয়া বিষয়ক বর্ণনা রয়েছে। আমার উদ্দেশ্য, যেন এ সংক্ষেপিত গ্রন্থটি মূল

গ্রন্থের বিষয়বস্তু অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি পাঠকের জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণ বয়ে আনে।

সবশেষে মহান আল্লাহর তাওফীকের উপর নির্ভর করে বলছি, আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহ ইবনু খালীলুর রাহমান কীরানবী তাঁর মহামূল্যবান গ্রন্থ “ইযহারুল হক্ক” একটি ভূমিকা ও ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। নিম্নে এ গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ প্রদত্ত হলো।

ড. মুহাম্মাদ আহমদ আব্দুল কাদির মালকাবী
সহকারী অধ্যাপক
কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ
০১/০১/১৪১৫ হি./ ১০/০৬/১৯৯৪ খৃ.

ভূমিকা

কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য

(১) প্রটেস্টান্ট[1] পণ্ডিতগণের গ্রন্থ থেকে যে সকল উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে শুধু তাদের কথা দ্বারা তাদের বিভ্রান্তি প্রমাণের জন্য, আমাদের বিশ্বাস প্রকাশের জন্য নয়।

(২) প্রটেস্টান্ট পণ্ডিতগণ সর্বদা তাদের লিখিত গ্রন্থগুলি বিষয়বস্তু পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন ইত্যাদির মাধ্যমে পাল্টে

---

[1] গোড়া থেকেই খৃস্টানগণ বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত। মধ্যযুগে ইউরোপে ভ্যাটিকানের পোপের নিয়ন্ত্রিত 'রোমান ক্যথলিক' মতবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমান যুগেও খৃস্টানদের মধ্যে এই মতই সর্বাধিক প্রচলিত। ষষ্ঠদশ শতকে মার্টিন লুথার: **Martin Luther** (১৪৮২-১৫২৯ খৃ) পোপের আধিপত্য, অত্যাচার ও ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এরা প্রটেস্টান্ট নামে পরিচিত। ধর্মবিশ্বাস প্রায় একই, তবে এরা রাষ্ট্র, ব্যক্তি বা ধর্মের উপর পোপের কতৃত্ব মানেন না। রাজনৈতিক কারণেই ইংল্যান্ডের রাজারা প্রটেস্টান্ট মত গ্রহণ করেন। উনবিংশ শতকের শুরুতে মূলত ইংল্যান্ডের প্রটেস্টান্ট খৃস্টানদের মিশনারীরাই ভারতে কাজ করছিল। এজন্য গ্রন্থকার এদের বিভ্রান্তি প্রমাণের জন্য তাদের পন্ডিতদের গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। (অনুবাদক। এখানে উল্লেখ্য যে, এ গ্রন্থের সকল পাদটীকা অনুবাদকের পক্ষ থেকে সংযোজিত।)

ফেলেন। ফলে আগের সংস্করণ ও পরের সংস্করণের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। পাঠককে এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে।

(৩) "বাইবেল"-এর মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন কাহিনীকে মিথ্যা বা ভুল বলায় কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এগুলি নবীগণের নামে বানানো জাল ও ভিত্তিহীন গল্প এবং আসমানী কিতাবের বিকৃতির অংশ। এ সকল কাহিনী কোনোটিই আল্লাহর কালাম নয়। আর এ সকল জাল কাহিনীকে মিথ্যা বা ভুল বললে "আসমানী কিতাবের" প্রতি বে-আদবী হয় না। বরং এ সকল আসমানী গ্রন্থে যে সকল বিকৃতি ও মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটেছে সেগুলি প্রকাশ করা ও সেগুলির নিন্দা করা মুসলিমের আবশ্যকীয় দায়িত্ব।

(৪) খৃস্টান পণ্ডিতগণের রীতি ও অভ্যাস হলো, তারা মুসলিম আলিমগণের লিখনির মধ্যে বিদ্যমান সামান্য দু-একটি দুর্বল বক্তব্য খুঁজে বের করে তাদের গ্রন্থে সেগুলির উল্লেখ করেন এবং সেগুলির প্রতিবাদ করেন। এভাবে তারা পাঠককে বুঝাতে চান যে, মুসলিম পণ্ডিতদের বইগুলি এরূপ দুর্বল কথায় ভরা। আর প্রকৃত বিষয় হলো, মুসলিম আলিমগণের গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান অগণিত শক্তিশালী বক্তব্যগুলি তারা এড়িয়ে যান এবং সেগুলির কোনোরূপ উল্লেখ তারা করেন না। যদি কখনো এরূপ কোনো বক্তব্য তারা উল্লেখ করেন তবে পরিপূর্ণ অবিশ্বস্ততার সাথে বাড়িয়ে কমিয়ে বা বিকৃত করে সে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এ তাদের সবচেয়ে নিন্দনীয় অভ্যাসগুলির

অন্যতম। জ্ঞানবৃত্তিক বিতর্কের মূলনীতি হলো প্রতিপক্ষের বক্তব্য পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে বিশুদ্ধভাবে উপস্থাপন করা; কিন্তু তারা এ মূলনীতি লঙ্ঘন করেন। পাদরি কার্ল গোটালেব ফান্ডার (**Carl Gottaleb Pfander**) এরূপ করেছেন আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবীর সাথে তার প্রকাশ্য বিতর্কের বিবরণে। ১২৭০ হি,/১৮৫৪ খৃ ভারতের আগ্রায় তাদের মধ্যে এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। মি. ফান্ডার এ বিতর্কের বিবরণ সম্পূর্ণ বিকৃতভাবে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেন। এতে তিনি প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ বিকৃত করে উভয়পক্ষের বক্তব্য বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেন। মি. ফান্ডার তার বিভিন্ন পুস্তকে কুরআন কারীমের বিভিন্ন শ্লোক নিজের মনমর্জি মত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতেন। এরপর দাবি করতেন যে, তার অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় সঠিক এবং মুসলিম মুফাস্‌সিরগণের ব্যাখ্যা ভুল। অথচ প্রকৃত ও প্রমাণিত বিষয় যে, তিনি আরবী ভাষায় অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। এছাড়া কুরআন বিষয়ক প্রাসঙ্গিক জ্ঞানও তার ছিল না। এরপরও তিনি দাবি করতেন তার ভাষাজ্ঞান-বিহীন অশুদ্ধ অনুবাদ ও ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে মানতে হবে এবং মুসলিম উম্মাহর সকল মুফাস্‌সিরের ব্যাখ্যাকে ভুল বলতে হবে!

হে আল্লাহ, আমাদেরকে সত্যকে সত্যরূপে বুঝার এবং তার অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আর বাতিল ও অসত্যের অসারত্ব

আমাদের সামনে প্রতিভাত করুন এবং তা পরিহার করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন।

প্রথম অধ্যায়
বাইবেল পরিচিতি

নতুন ও পুরাতন নিয়মের গ্রন্থাবলির বর্ণনা ও সেগুলির বিকৃতি ও রহিত হওয়ার প্রমাণ

এই অধ্যায়টি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত:

প্রথম পরিচ্ছেদ: বাইবেলের পুস্তকগুলির নাম ও পরিচয়
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বাইবেলের পুস্তকগুলির সনদ-হীনতা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: বাইবেলের অগণিত বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তি
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: বাইবেলের রহিত হওয়ার প্রমাণ

প্রথম পরিচ্ছেদ:

বাইবেলের পুস্তকগুলির নাম ও সংখ্যা

খৃস্টানগণ তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলিকে দুভাগে ভাগ করেন। প্রথমভাগের গ্রন্থাবলি সম্পর্কে তারা দাবি করেন যে, যীশুর (ঈসা আ) পূর্বে আগত নবীগণের মাধ্যমে সেগুলি তাদের নিকট পৌঁছেছে। দ্বিতীয় ভাগের গ্রন্থগুলির বিষয়ে তারা দাবি করেন যে, যীশুর (ঈসা আ.) -এর পরে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা (**Divine Inspiration**)-এর মাধ্যমে সেগুলি লিখিত হয়েছে। প্রথমভাগের গ্রন্থগুলির সমষ্টিকে 'পুরাতন নিয়ম' এবং দ্বিতীয়ভাগের গ্রন্থগুলির সমষ্টিকে 'নতুন নিয়ম' বলে অভিহিত করা হয়। উভয় নিয়মের সমষ্টিকে বলা হয় 'বাইবেল'। এটি একটি গ্রীক শব্দ। এর অর্থ 'গ্রন্থ'। পুরাতন ও নতুন নিয়ম একত্রে ছাপানো বইটির উপরে লেখা হয়: "পবিত্র বাইবেল"।

১. ১. ১. পুরাতন নিয়মের গ্রন্থাবলি

প্রটেস্টান্ট খৃস্টানগণের নিকট স্বীকৃত "প্রটেস্টান্ট বাইবেল" বা কিং জেমস ভার্সন অনুসারে পবিত্র বাইবেলের প্রথম অংশ বা পুরাতন নিয়মের মধ্যে বর্তমানে ৩৯টি পুস্তক বিদ্যমান[2]। সেগুলির বিবরণ নিম্নরূপ:

---

[2] প্রথম খৃস্টীয় শতাব্দীর (৩৭-৯৫ খৃ) প্রসিদ্ধতম ইহূদী ঐতিহাসিক যোসেফাস (**Flavius Josephus**) বাইবেলের পুরাতন নিয়ম বা ইহূদী বাইবেলের গ্রন্থের বর্ণনায় বলেন: আমাদের পবিত্র ঐশ্বরিক গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ২২টি। তন্মধ্যে ৫টি

1. আদি পুস্তক (**Genesis**)
2. যাত্রা পুস্তক (**Exodus**)
3. লেবীয় পুস্তক (**Leviticus**)
4. গণনা পুস্তক (**Numbers**)
5. দ্বিতীয় বিবরণ (**Deuteronomy**)

এ পাঁচটি গ্রন্থ একত্রে 'তাওরাহ' (**Torah or Pentateuch**) নামে অভিহিত। 'তাওরাহ' একটি হিব্রু শব্দ। এর অর্থ 'শিক্ষা ও বিধিবিধান'। কখনো কখনো রূপকভাবে পুরাতন নিয়মের সকল গ্রন্থের সমষ্টিকে, অর্থাৎ উপর্যুক্ত ৫টি গ্রন্থ ও নিম্নের ৩৪টি গ্রন্থের সমষ্টিকে 'তাওরাত' বা 'তোরাহ' বলে অভিহিত করা হয়:

6. যিহোশূয়ের পুস্তক (**The Book of Joshua**)[3]
7. বিচারকর্তৃগণের বিবরণ (**The Book of Judges**)
8. রূতের বিবরণ (**The Book of Ruth**)
9. শমুয়েলের প্রথম পুস্তক (**The First Book of Samuel**)
10. শমুয়েলের দ্বিতীয় পুস্তক (**The Second Book of Samuel**)

মোশির। পরবর্তী নবীগণের লেখা গ্রন্থ ১৩টি। বাকি চারটি গ্রন্থ ঈশ্বরের বন্দনায় গীত সঙ্গীত ও অনুরূপ বিষয়ের সংকলন। যোসেফাস-এর বক্তব্য দেখুন: **Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, page 97, 244-245.**

[3] তিনি সম্ভবত ইউশা' ইবন নূন। যার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

11. রাজাবলির প্রথম খণ্ড (**The First Book of Kings**)
12. রাজাবলির দ্বিতীয় খণ্ড (**The Second Book of Kings**)
13. বংশাবলির প্রথম খণ্ড (**The First Book of The Chronicles**)
14. বংশাবলির দ্বিতীয় খণ্ড (**The Second Book of The Chronicles**)
15. ইস্রার পুস্তক (**The Book of Ezra**)
16. নহিমিয়ের পুস্তক (ইস্রার দ্বিতীয় পুস্তক) (**The Book of Nehemiah**)
17. ইস্টেরের বিবরণ (**The Book of Esther**)
18. ইয়োবের[4] বিবরণ (**The Book of Job**)
19. গীতসংহিতা (যাবূর) (**The Book of Psalms**)
20. হিতোপদেশ (সুলাইমানের প্রবাদাবলী) (**The Proverbs**)
21. উপদেশক (**Ecclesiastes or, the Preacher**)
22. শলোমনের পরমগীত (**The Song of Solomon**)
23. যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক (**The Book of The Prophet Isaiah**)
24. যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তক (**The Book of The Prophet**

---

[4] (**Job**) বা ইয়োব আরবীতে আইউব। এই গ্রন্থটি আইউব (আর) এর নামে প্রচারিত।

Jeremiah)

25. যিরমিয়ের বিলাপ (**The Lamentations of Jeremiah)**
26. যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তক (**The Book of The Prophet Ezekiel)**
27. দানিয়েলের পুস্তক (**The Book of Daniel)**
28. হোশেয় ভাববাদীর পুস্তক (**Hosea)**
29. যোয়েল ভাববাদীর পুস্তক (**Joel)**
30. আমোষ ভাববাদীর পুস্তক (**Amos)**
31. ওবদিয় ভাববাদীর পুস্তক (**Obadiah)**
32. যোনা[5] ভাববাদীর পুস্তক (**Jonah)**
33. মীখা ভাববাদীর পুস্তক (**Micah)**
34. নহূম ভাববাদীর পুস্তক (**Nahum)**
35. হবক্কূক ভাববাদীর পুস্তক (**Habakkuk)**
36. সফনিয় ভাববাদীর পুস্তক (**Zephaniah)**
37. হগয় ভাববাদীর পুস্তক (**Haggai)**
38. সখরিয়[6] ভাববাদীর পুস্তক (**Zechariah)**
39. মালাখি ভাববাদীর পুস্তক (**Malachi)**

---

[5] ইউনূস (আ)।

[6] আরবীতে যাকারিয়া।

ঈসা-মসীহ আলাইহিস সালাম এর জন্মের প্রায় ২৪০ বৎসর পূর্বে মালাখি নবী হিসেবে[7] ইহুদীদের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন।

শমরীয় (**Samaritans**) ইয়াহূদীগণ এগুলির মধ্য থেকে শুধু প্রথম সাতটি গ্রন্থ বিশুদ্ধ ও পালনীয় বলে স্বীকার করে, মূসা আলাইহিস সালাম এর গ্রন্থ বলে কথিত ৫ টি গ্রন্থ, যিহোশূয়ের পুস্তক (**The Book of Joshua**) ও বিচারকর্তৃগণের বিবরণ (**The Book of Judges**)। শমরীয়দের মধ্যে প্রচলিত 'তাওরাত'-এর এ ৭টি পুস্তকের বক্তব্য সাধারণ ইয়াহূদীদের মধ্যে প্রচলিত তাওরতের এ ৭টি পুস্তকের বক্তব্য থেকে ভিন্ন। আবার তাওরাতের শমরীয় সংস্করণ ও হিব্রু সংস্করনের সাথে এর গ্রীক সংস্করণের বক্তব্যের অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাওরাতের গ্রীক সংস্করণের মধ্যে উপর্যুক্ত ৩৯টি পুস্তক ছাড়াও অতিরিক্ত ৭টি পুস্তক রয়েছে, যেগুলিকে প্রটেস্টান্টগণ জাল বা সন্দেহজনক পুস্তক (**Apocrypha**) বলে আখ্যায়িত করেন।[8] এ সাতটি গ্রন্থের নাম:

---

[7] অর্থাৎ তাদের মতে। [সম্পাদক]

[8] এখানে উল্লেখ্য যে, খৃস্টানদের প্রধান দল রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানদের নিকট এই সন্দেহযুক্ত গ্রন্থগুলিও বিশুদ্ধ বলে গৃহীত। এজন্য রোমান ক্যথলিক বাইবেলে (**RCV: Roman Catholic Version/ Douay**) পুরাতন নিয়মের গ্রন্থ সংখ্যা ৪৬। বাইবেলের প্রাচীন সংস্করণে এসকল গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। প্রোটেস্ট্যান্টরা ১৭শ শতাব্দীতের এগুলি মুছে দিয়ে তাদের বাইবেল মুদ্রণ করে। এজন্য

1. বারুখের পুস্তক (**The Book of Baruch**)
2. তোবিয়াসের পুস্তক (**The Book of Tobias/Tobit**)
3. যুডিথের পুস্তক (**The Book of Judith**)
4. উইসডম বা জ্ঞান পুস্তক (**The Book of Wisdom/Wisdom of Solomon**)
5. যাজকগণ বা **Ecclesiasticus (The Wisdom of Jesus the Son of Sirach)**
6. মাকাবিজের প্রথম পুস্তক (**The First Book of Maccabees**)
7. মাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক **(The Second Book of Maccabees)**

এভাবে আমরা দেখছি যে, গ্রীক তাওরাত বা ক্যাথলিক তাওরাতের পুস্তক সংখ্যা ৪৬।

১. ১. ২. নতুন নিয়মের গ্রন্থাবলি

প্রোটেস্ট্যান্টদের বাইবেলে (**AV: Authorised Version/ KJV: King James Version**) পুরাতন নিয়মের গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ৩৯। রোমান ক্যাথলিকগণ যদিও মনে করেন যে, প্রোটেস্ট্যান্টগণ **'**ইশ্বরের বাণী**'** বাদ দিয়েছে, কিন্তু তারা বর্তমানে প্রটেস্টান্ট বাইবেলই প্রচার করেন। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, বাইবেলের নতুন নিয়মের গ্রন্থাবলীর মধ্যে এসকল মুছে ফেলা গ্রন্থগুলির পরোক্ষ উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। দেখুন: **(The New Encyclopedia Britannica, 15th Edition, Vol-2, Biblical Literature, pp883, 932-935)**.

আমরা বলেছি যে, খৃস্টধর্মের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেলের দ্বিতীয় অংশকে “নতুন নিয়ম” বলে আখ্যায়িত করা হয়। বর্তমানে এ অংশের মধ্যে নিম্নের ২৭টি পুস্তক বিদ্যমান:

1. মথি লিখিত সুসমাচার[9] (**The Gospel According To St. Matthew**)
2. মার্ক লিখিত সুসমাচার (**The Gospel According To St. Mark**)

---

[9] এভাবে প্রটেস্টান্টদের প্রচারিত ইংরেজী অথরাইযড ‘বাইবেলে’ এর নাম (**The Gospel According To St. Matthew**)। পক্ষান্তরে রোমান ক্যাথলিক বাইবেলে এর নাম (**The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. Matthew**)। কিন্তু বাংলায় এর অনুবাদ করা হয়েছে ‘মথিলিখিত সুসমাচার’। আবার বাইবেল সোসাইটি প্রচারিত ‘ইঞ্জিল শরীফ’-এ এর অনুবাদ করা হয়েছে ‘প্রথম খন্ড: মথি’। এ দুই অনুবাদই ধোঁকাপূর্ণ। মূল নামের অনুবাদ হবে ‘মথির মতানুসারে যীশু সুসমাচার’। ঈসা (আ) একটি সুসমাচার বা ইঞ্জিল প্রচার করেছিলেন বলে সকলেই জানত। তবে কারো কাছেই এর কোনো কপি ছিল না। তাঁর তিরোধানের প্রায় শতবৎসর পরে অনেক মানুষ ‘সুসমাচার’ লিখে প্রচার করেন যে, এটি ঈসা (আ) এর সুসমাচার। এজন্য এগুলির এইরূপ নামকরণ করা হয়। অর্থাৎ নাম করা হয় ‘অমুকের মতানুসারে এ-ই হলো সুসমাচার’, সঠিক সুসমাচার কোনটি তা কেউ জানে না। এই বিষয়টি চাপা দেওয়ার জন্যই তারা সঠিক অনুবাদ না করে জালিয়াতি করেছেন। বাকী সুসমাচারগুলিরও একই অবস্থা। আমরা অনুবাদে তাদের ব্যবহৃত পরিভাষাই ব্যবহার করেছি।

3. লূক লিখিত সুসমাচার (**The Gospel According To St. Luke**)
4. যোহন লিখিত সুসমাচার (**The Gospel According To St. John**)

এই চারটি গ্রন্থকে ‘ইঞ্জিল চতুষ্ঠয়’ বলা হয়। ‘ইঞ্জিল’ শব্দটি এই চারটি গ্রন্থের জন্য শুধু প্রযোজ্য। ইঞ্জিল শব্দটি মূলত গ্রীক ভাষা থেকে আরবীকৃত শব্দ। গ্রীক (**eu**) অর্থ ভাল (**good**) এবং (**aggelein**) অর্থ ঘোষণা (**announce**), একত্রে (**euaggelos**) অর্থ সুসংবাদ ঘোষণা (**bringing good news**)। গ্রীক (**euaggelion**) শব্দের অর্থ (**good news**)। এ শব্দটি থেকে আরবী ইঞ্জিল শব্দ এবং ইংরেজী ইভাঞ্জেল (**evangel**) শব্দটির উৎপত্তি। আর ইঞ্জিল বা ইভাঞ্জেল (**evangel**) বলতে এ চারটি পুস্তক বুঝানো হয়। তবে অনেক সময় রূপকভাবে নতুন নিয়মের সকল গ্রন্থকে একত্রে ‘ইঞ্জিল’ বলা হয়। অর্থাৎ এ চারটি পুস্তক ও নিম্নের ২৩টি পুস্তকের সমষ্টিকে রূপকভাবে ইঞ্জিল বলা হয়:

5. প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণ (**The Acts of the Apostles**)
6. রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (**The Letter of Paul to the Romans/ The Epistle of Paul The Apostle to the Romans**)
7. করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র (**The First**

Epistle of Paul The Apostle to the Corinthians)

8. করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র (**The Second Epistle of Paul The Apostle to the Corinthians)**
9. গালাতীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (**The Epistle of Paul The Apostle to the Galatians)**
10. ইফিষীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (**The Epistle of Paul The Apostle to the Ephesians)**
11. ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (**The Epistle of Paul The Apostle to the Philippians)**
12. কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (**The Epistle of Paul The Apostle to the Colossians)**
13. থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র (**The First Epistle of Paul The Apostle to the Thessalonians)**
14. থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র (**The Second Epistle of Paul The Apostle to the Thessalonians)**
15. তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র (**The First Epistle of Paul The Apostle to the Timothy)**
16. তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র (**The Second Epistle of Paul The Apostle to Timothy)**

17. তীতের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (**The Epistle of Paul to Titus**)
18. ফিলীমনের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র (**The Epistle of Paul to Philemon**)
19. ইব্রীয়দের প্রতি পৌলের পত্র (**The Letter of Paul to the Hebrews**) পত্রটি পৌলের লিখিত বলে কথিত।
20. যাকোবের পত্র (**The Letter of James/The General Epistle of James**)
21. পিতরের প্রথম পত্র (**The First Epistle General of Peter**)
22. পিতরের দ্বিতীয় পত্র (**The Second Epistle General of Peter**)
23. যোহনের প্রথম পত্র (**The First Epistle General of John**)
24. যোহনের দ্বিতীয় পত্র (**The Second Epistle General of John**)
25. যোহনের তৃতীয় পত্র (**The Third Epistle of John**)
26. যিহূদার পত্র (**The General Epistle of Jude**)
27. যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য (**The Revelation of St.**

John The Divine)[10]

এভাবে আমরা দেখছি যে, পুরাতন নিয়মের হিব্রু সংস্করণ বা প্রটেস্টান্ট বাইবেল (**AV: Authorised Version/ KJV: King James Version**) অনুসারে পবিত্র বাইবেলের পুস্তক সংখ্যা ৩৯+২৭= ৬৬। আর পুরাতন নিয়মের গ্রীক সংস্করণ বা রোমান ক্যাথলিক বাইবেল (**RCV: Roman Catholic Version/ Douay**) অনুসারে পবিত্র বাইবেলের পুস্তক সংখ্যা ৪৬+২৭=৭৩।

১. ১. ৩. গ্রন্থগুলির সংখ্যায় হেরফেরের ইতিহাস

৩২৫ খৃস্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পৌত্তলিক সম্রাট কন্সটান্টাইনের[11] (রাজত্ব: ৩২৩-৩৩৭ খৃ) সময়ে নিকীয়া (**Nicaea**)

---

[10] নতুন নিয়মের সন্দেহজনক গ্রন্থাবলী সম্পর্কে দেখুন, (**The New Encyclopedia Britannica, 15th Edition,Vol-2, Biblical Literature, New Testament Apocrypha, p 973**).

[11] (**Constantine the Great**) ২৮৮ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৩১২ খৃস্টাব্দে রোমের একচ্ছত্র শাসকে পরিণত হন। খৃস্টধর্মের শুরু থেকে ৩১২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রোমের সম্রাটগণ খৃস্টানধর্মকে রাষ্ট্র বিরোধী বলে গণ্য করতেন এবং খৃস্টানদের উপর অত্যাচার করতেন। ৩১৩ খৃস্টাব্দে কন্সটান্টাইন 'মিলান ঘোষণা' (**Edict of Milan**) এর মাধ্যমে খৃস্টধর্মকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। এতদিন খৃস্টধর্ম একটি 'গোপন' ধর্ম বলে গণ্য ছিল। এখন খৃস্টানগণ প্রকাশ্যে ধর্মমত প্রকাশ ও পালন করতে শুরু করেন। এখন তাদের মধ্যকার এতদিনের

শহরে খৃস্টান বিশপ-যাজকদের প্রথম সাধারণ মহা-সম্মেলন (**ecumenical council**) অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল বাইবেলের সন্দেহভাজন গ্রন্থাবলি বা বাইবেল নামে প্রচলিত "জাল" পুস্তকগুলি সম্পর্কে পরামর্শ, মতবিনিময়, গবেষণা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সম্মেলনে উপস্থিত (তিনশতাধিক) বিশপ ও মহাযাজকগণ এ সকল গ্রন্থের বিষয়ে গবেষণা, আলোচনা ও বিশ্লেষণের পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, 'যুডিথের পুস্তক' (**The Book of Judith**) বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর নিম্নের ১৪টি গ্রন্থ জাল বা সন্দেহজনক (**Apocrypha**) বলে বিবেচিত হবে, যেগুলিকে বাইবেলের পুস্তক বা ঐশী পুস্তক বলে কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ করা যাবে না। এ জাল বা সন্দেহজনক পুস্তকগুলি নিম্নরূপ:

1. ইস্টেরের বিবরণ (**The Book of Esther**)
2. যাকোবের পত্র (**The Letter of Jame**)

বিরোধিতাগুলি প্রকাশ পায়। বিশেষত, একত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ, যীশুর ঈশ্বরত্ব, বাইবেলের গ্রন্থ বা যীশুর সুসমাচার হিসাবে প্রচারিত বিভিন্ন গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মধ্যকার মতভেদ প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তখন পৌত্তলিক সম্রাট কন্সটান্টাইনের নির্দেশে ও তার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে খৃস্টান ধর্মগুরুগণ ৩২৫ সালে নিসিয়া সম্মেলন সমবেত হন। ৩৩৭ খৃস্টাব্দে মৃত্যুর কিছু পূর্বে সম্রাট কন্সট্যান্টাইন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন।

3. পিতরের দ্বিতীয় পত্র (**The Second Epistle General of Peter**)
4. যোহনের দ্বিতীয় পত্র (**The Second Epistle General of John**)
5. যোহনের তৃতীয় পত্র (**The Third Epistle of John**)
6. যিহূদার পত্র (**The General Epistle of Jude**)
7. ইব্রীয়দের প্রতি পত্র (**The Letter of Paul to the Hebrews**)
8. উইসডম বা জ্ঞান পুস্তক (**The Book of Wisdom/Wisdom of Solomon**)
9. তোবিয়াসের পুস্তক (**The Book of Tobias/Tobit**)
10. বারুখের পুস্তক (**The Book of Baruch**)
11. যাজকগণ বা **Ecclesiasticus** (**The Wisdom of Jesus the Son of Sirach**)
12. মাকাবিজের প্রথম পুস্তক (**The First Book of Maccabees**)
13. মাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক (**The Second Book of Maccabees**)
14. যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য (**The Revelation of St. John The Divine**)

'যুডিথের পুস্তক' (**The Book of Judith**)-এর ভূমিকায় সেন্ট জীরোম (**St. Jerome: ৩৪২-৪২০ খৃ)-**এর বক্তব্য থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বিষয়টি জানা যায়।

এর মাত্র ৩৯ বৎসর পরে ৩৬৪ খৃস্টাব্দে লোডেসিয়ায় আরেকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ধর্মগুরুগণ উপর্যুক্ত ১৪টি 'জাল' পুস্তকের মধ্যে প্রথম ৭টিকে (১-৭ নং) বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যেগুলিকে নিকীয় মহাসম্মেলনে 'জাল' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এগুলি জাল নয়, বরং বিশুদ্ধ। অবশিষ্ট ৭টি পুস্তককে (৮-১৪ নং) এ সম্মেলনেও জাল ও বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়। তারা এ সিদ্ধান্ত একটি সাধারণ পত্রের মাধ্যমে প্রজ্ঞাপন করেন।

এর ৩৩ বৎসর পর ৩৯৭ খৃস্টাব্দে আরেকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন 'কার্থেজ' সম্মেলন নামে পরিচিত। উপরের উভয় সম্মেলনে যে ৭টি পুস্তককে (৮-১৪ নং) জাল ও সন্দেহজনক বলে গণ্য করা হয় এ সম্মেলনে উপস্থিত ধর্মগুরুগণ সেগুলিকেও আইনসম্মত ও গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেন। এভাবে উপরের ১৪টি জাল পুস্তকের সবগুলিকেই তারা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ঐশ্বরিক গ্রন্থ এবং খৃস্টানদের জন্য অবশ্য মান্য ও পালনীয় বলে ঘোষণা করেন।

এভাবে এ ১৪টি পুস্তক সহ মোট ৭৩টি গ্রন্থ "পবিত্র বাইবেলের" অবিচ্ছেদ্য অংশ, ঐশ্বরিক ও অবশ্য পালনীয় ও অবশ্য মান্য ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয় সুদীর্ঘ প্রায় ১২০০ বৎসর যাবত।[12]

এরপর খৃস্টীয় ১৬শ শতকের মাঝামাঝি প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তারা নিম্নের গ্রন্থগুলিকে বাতিল বলে প্রত্যাখ্যান করেন:

1. বারুখের পুস্তক (**The Book of Baruch**)
2. তোবিয়াসের পুস্তক (**The Book of Tobias**)
3. যুডিথের পুস্তক (**The Book of Judith**)
4. উইসডম বা জ্ঞান পুস্তক (**The Book of Wisdom**)
5. যাজকগণ বা **Ecclesiasticus** (**The Wisdom of Jesus the Son of Sirach**)
6. মাকাবিজের প্রথম পুস্তক (**The First Book of Maccabees**)
7. মাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক (**The Second Book of Maccabees**)

[12] কেউ এগুলির একটি শব্দ বা বাক্য সম্পর্কে সন্দেহ করলে বা এর কোনো অর্থে বিপরীত কথা সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান বা ভূগোলের নামে বললে তাকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হতো বা অনুরূপ কঠিন শাস্তি প্রদান করা হতো।

তারা বলেন যে, এই গ্রন্থগুলি জাল, অগ্রহণযোগ্য এবং বাতিল। এগুলিকে কোনোভাবেই বাইবেলের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। এছাড়া তারা 'ইস্টেরের বিবরণ' (**The Book of Esther**)-এর কিছু অংশ বাতিল বলে গণ্য করেন এবং কিছু অংশ গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থে ১৬টি অধ্যায় ছিল। তারা বলেন যে, প্রথম ৯ টি অধ্যায় এবং দশম অধ্যায়ের তিনটি শ্লোক সঠিক বলে স্বীকৃত। দশম অধ্যায়ের অবশিষ্ট ১০ শ্লোক ও বাকী ৬টি অধ্যায় বাতিল হিসেবে প্রত্যাখ্যাত। উপরের গ্রন্থগুলি বাতিল ও বানোয়াট বলে গণ্য করার ক্ষেত্রে তারা ৬ প্রকারের যুক্তি পেশ করেন:

1. এই গ্রন্থগুলি মূলত হিব্রু, ক্যালিডিয় ইত্যাদি ভাষায় লেখা ছিল। সেসব ভাষায় লিখিত এ সকল গ্রন্থের মূল উৎসগুলি হারিয়ে গিয়েছে।

2. ইয়াহূদীগণ এ সকল গ্রন্থকে ঐশী বা ঐশ্বরিক বলে মানেন না।

3. সকল খৃস্টান গ্রন্থগুলি মেনে নেন নি।

4. জীরোম (**St. Jerome**) বলেছেন যে, ধর্মের বিধিবিধান বর্ণনা ও প্রমাণ করার জন্য এই গ্রন্থগুলি যথেষ্ট নয়।

5. ক্লাউস বলেছেন যে, এ গ্রন্থগুলি সর্বত্র পঠিত হয় না।

6. ৩য়-৪র্থ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খৃস্টান বিশপ ও ঐতিহাসিক ইউসেবিয়াস (**Eusebius Pamphilus**) তার **Ecclesisatical History** গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই গ্রন্থগুলি, বিশেষ

করে মাকাবিজের দ্বিতীয় পুস্তক বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়েছে।

এখানে লক্ষ্য করুন। তারা নিজেরাই নিজেদের ধর্মের পূর্ববর্তী প্রজন্মদের অধার্মিকতার স্বীকৃতি প্রদান করছে। তারা নিজেরাই স্বীকার করছে যে, যে সকল গ্রন্থের মূল উৎস হারিয়ে গিয়েছে এবং শুধু অনুবাদগুলি রয়েছে, যেগুলিকে ইয়াহূদীগণ তাদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে মানেন না, যেগুলির ঐশ্বরিক বা প্রেরণালব্ধ হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই এবং এ সকল কারণে যে সকল পুস্তককে প্রথম প্রজন্মের খৃস্টানগণ জাল বা সন্দেহজনক বলে ঘোষণা করেছেন, সেগুলিকেই আবার পরবর্তী প্রজন্মের খৃস্টানগণ ঐশী বা আসমানী গ্রন্থ হিসেবে অবশ্য মান্য ও অবশ্য পালনীয় বলে ঘোষণা করেছেন। ক্যাথলিকগণ কার্থেজ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে এখন পর্যন্ত এই গ্রন্থগুলিকে ঐশী ও ঐশ্বরিক হিসেবে মেনে থাকেন; যেগুলির মধ্যে পুরাতন নিয়মের ও নতুন নিয়মের জাল বা সন্দেহজনক পুস্তকগুলি রয়েছে।

যে পুস্তককে পূর্ববর্তীরা জাল বলেছেন তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে পরবর্তীদের সিদ্ধান্তের কীই বা মূল্য থাকতে পারে? বরং এ সকল সম্মেলনের সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে, খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থগুলির অশুদ্ধতা ও অনির্ভরযোগ্যতার বিষয়ে বিরুদ্ধবাদিদের মতামতই সঠিক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাইবেলের পুস্তকগুলির অপ্রামাণ্যতা

পুরাতন এবং নতুন নিয়মের কোনো একটি গ্রন্থেরও অবিচ্ছিন্ন সূত্র (**chain of authorities**) ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণের নিকট সংরক্ষিত নেই। আর এ সকল পুস্তক ঐশ্বরিক প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ দ্বারা লিখিত হয়েছে বলে দাবি করার কোনো সুযোগ ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের নেই।

কোনো গ্রন্থকে ওহী (**Divine Inspiration**)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ঐশী, ঐশ্বরিক বা আসমানী গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করার পূর্ব শর্ত হলো:

প্রথমত, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে যে, গ্রন্থটি অমুক নবী বা ভাববাদীর মাধ্যমে লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে হবে যে, উক্ত নবী যেভাবে গ্রন্থটি রেখে গিয়েছেন হুবহু সেভাবে কোনোরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা বিকৃতি ব্যতীরেকেই 'অবিচ্ছিন্ন সূত্রে'[13] গ্রন্থটি আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

---

[13] অর্থাৎ ভাববাদী থেকে গ্রন্থটি কে বা কারা লিখিত পাণ্ডুলিপি ও মৌখিক শ্রুতির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তাদের থেকে গ্রন্থটি কে বা কারা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তার স্পষ্ট বর্ণনা থাকবে এবং সূত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ সুপরিচিত ধর্মীয়

শুধু ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে কোনো গ্রন্থকে কোনো ওহী বা প্রেরণা (**Inspiration**)-প্রাপ্ত ব্যক্তির নামে চালানো হলে বা লিখে দিলেই তা সে ব্যক্তির লেখা গ্রন্থ বলে প্রমাণিত বা স্বীকৃত হতে পারে না। অনুরূপভাবে কোনো এক বা একাধিক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠি একটি গ্রন্থকে এরূপ কোনো নবী বা ভাববাদীর লেখা গ্রন্থ বলে দাবি করলেই তা তার লেখা বলে প্রমাণিত হয় না।

এরূপ অনেক গ্রন্থই অনেক নবীর নামে প্রচারিত, যেগুলি ইয়াহূদী খৃস্টানগণও সে সকল নবীর গ্রন্থ বলে স্বীকার করেন না। মূসা আলাইহিস সালাম, ইয্রা, যিশাইয়, যিরমিয়, হবক্কুক, সুলাইমান আলাইহিস সালাম প্রমুখ নবীর নামে অনেক পুস্তক পুরাতন নিয়মের অংশ হিসেবে লিখিত ও প্রচলিত হয়েছে যেগুলিকে ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ এ সকল নবীর লেখা পুস্তক বলে স্বীকার করেন না; কারণ এগুলির কোনো অবিচ্ছিন্ন সনদ নেই এবং কোনোভাবে প্রমাণিত হয় নি যে, এগুলি এ সকল নবীর লেখা। ইয়াহূদী-খৃস্টানগণই এগুলিকে জাল (**Pseudepigrapha**) বলে গণ্য করেন।

নতুন নিয়মের উপর্যুক্ত ২৭টি গ্রন্থ ছাড়াও ৭০টির অধিক গ্রন্থ খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, যেগুলি যীশু, মেরি, শিষ্যগণ বা তাদের শিষ্যদের নামে প্রচারিত ও প্রচলিত ছিল। আজকাল সকল

ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রসিদ্ধ হবেন, যাদের বুদ্ধি, বিশ্বস্ততা, সততা ও ধার্মিকতা হবে প্রশ্নাতীত।

খৃস্টান সম্প্রদায় একমত যে, এগুলি সবই বানোয়াট ও জাল **(Pseudepigrapha/ Apocrypha)**।

পাঠক দেখেছেন যে, 'সন্দেহজনক' **(Apocrypha)** গ্রন্থগুলি ক্যাথলিকদের নিকট অবশ্য মান্য ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু ইয়াহূদী ও প্রটেস্টান্টদের নিকট অবশ্য পরিত্যাজ্য জালগ্রন্থ।

অবস্থা যখন এরূপ তখন কোনো একটি গ্রন্থকে কোনো একজন নবী বা শিষ্যের নামে প্রচার করলেই আমরা গ্রন্থটিকে সেই নবী বা শিষ্যের লেখা বা সংকলিত গ্রন্থ বলে মেনে নিতে পারি না। শুধু এইরূপ দাবির ভিত্তিতে কোনো গ্রন্থকে ঐশী বা ঐশ্বরিক বলে স্বীকার করা যায় না।

এজন্য গ্রন্থকার আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহ কিরানবী খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রাজ্ঞ জাঁদরেল পণ্ডিতদের নিকট বারংবার দাবি করেছেন যে, বাইবেলের যে কোনো একটি গ্রন্থের অবিচ্ছিন্ন সনদ বা সূত্র পেশ করুন। তারা সূত্র উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পাদরিগণের কেউ কেউ একথা বলে ওজরখাহি পেশ করেন যে, এ সকল গ্রন্থের সূত্র বা সনদ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। খৃস্টধর্মের শুরু থেকে ৩১৩ বৎসর পর্যন্ত আমাদের উপর যে জুলুম-অত্যাচার হয়েছিল তার ফলে এই গ্রন্থগুলির সনদ বা সূত্র পরম্পরার বিবরণ আমাদের নিকট থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

এভাবে প্রমাণিত যে, খৃস্টান পণ্ডিতগণ তাদের ধর্মীয় পুস্তকগুলির সনদ বা উৎস ও সূত্র বিষয়ে যা কিছু বলেন সবই ধারণা ও অনুমান মাত্র। এ ছাড়া তাদের কোনো প্রকার সূত্র (**chain of authorities**) নেই। এভাবে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, তাদের গ্রন্থগুলির কোনো অবিচ্ছিন্ন সনদ তাদের নেই। এখানে তাদের কয়েকটি বইয়ের অবস্থা আলোচনা করছি।

১. ২. ১. তোরাহ বা তাওরাত (Torah or Pentateuch)

মোশি (মূসা আ.)-এর নামে প্রচারিত তাওরাহ বা তোরাহ-এর গ্রন্থগুলি মোশির নিজের লিখিত বা সংকলিত নয়। নিম্নের বিষয়গুলি তা প্রমাণ করে:

প্রথম বিষয়: দাউদ বংশের শাসক যোশিয়া বিন আমোন (**Josiah, son of Amon**) খৃস্টপূর্ব ৬৪১ সালের কাছাকাছি সময়ে ইয়াহূদী রাজ্যের (যুডাহ প্রদেশের) শাসনভার গ্রহণ করেন। তার রাজত্ব গ্রহণের পূর্বেই তাওরাত বিলীন ও বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাওরাতের কোনোরূপ ব্যবহার বা প্রচলন ছিল না। তার রাজত্বের প্রথম ১৭ বৎসরে কেউ মোশির তোরাহ-এর কোনো পাণ্ডুলিপির চিহ্ন দেখেন নি বা এর কোনো কথাও কেউ শুনেন নি। তার সিংহাসনে আরোহণের ১৮ বৎসর পরে তাওরাতের যে কপিটি পাওয়া গিয়েছিল তা মোটেও নির্ভরযোগ্য ছিল না। যোশিয় রাজার রাজত্বের ১৮শ

বৎসরে (খৃ. পূ. ৬২০/৬২১ সালে) হিল্কিয় মহাযাজক (**Hilki'ah the high priest**) দাবি করেন যে, তিনি 'সদাপ্রভুর গৃহে', অর্থাৎ যিরূশালেমের ধর্মধাম বা শলোমনের মন্দিরের মধ্যে মোশির তোরাহ বা ব্যবস্থাপুস্তকখানি (**the book of the law**) পেয়েছেন। এ সকল বিষয় ২ রাজাবলির ২২ অধ্যায়ে এবং ২ বংশাবলির ৩৪ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।[14]

তোরাহ বা 'ব্যবস্থা পুস্তক' বলে কথিত এ পাণ্ডুলিপিটির নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা স্বীকৃত নয়। যাজক হিল্কিয়ের দাবিও গ্রহণযোগ্য নয়। বরং সামগ্রিক বিচারে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, এ পুস্তকটি বা 'তোরাহ'-এর এই পাণ্ডুলিপিটি পুরোটিই হিল্কিয় মহাযাজকের উদ্ভাবনা ও রচনা ছাড়া কিছুই নয়। এই প্রকৃত সত্যটিকে পাশ কাটিয়ে আমরা যদি ধরে নিই যে, হিল্কিয়ের এ পাণ্ডুলিপিটি সত্যই তাওরাতই ছিল তাহলেও কয়েক বছর পরে খৃস্টপূর্ব ৫৮৮ বা ৫৮৬ অব্দে[15] যখন ব্যবিলন সম্রাট নেবুকাদনেজার (**Nebuchadnezzar**) বা বখত নসর যেরুযালেম নগরী ও ইয়াহূদী রাজ্য ধ্বংস করে সকল ইয়াহূদীকে বন্দী করে ব্যবিলনে নিয়ে যান তখন এই অনির্ভরযোগ্য ও সূত্রবিহীন কপিটির প্রায় পুরোটুকুই

---

[14] ২ রাজাবলি ২২/৩-১১; ২ বংশাবলি ৩৪/১৪-১৯।

[15] বিস্তারিত দেখুন, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃষ্ঠা ১০-১১, **James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, Volume 7, page 449.**

হারিয়ে যায়। নেবুকাদনেজারের এ ঘটনার মধ্য দিয়ে তোরাহ ও পুরাতন নিয়মের পূর্বেকার সকল গ্রন্থ ভূপৃষ্ঠ থেকে একেবারেই বিলীন হয়ে যায়।

ইয়াহূদীরা দাবি করেন যে, প্রায় এক শতাব্দী পরে ইয্রা পুনরায় পুরাতন নিয়মের এ সকল গ্রন্থ নিজের পক্ষ থেকে লিখেন। প্রায় ৩০০ বৎসর পরে সিরিয়ার গ্রীক শাসক চতুর্থ এন্টিয়ক **(Antiochus Epiphanes)**-এর আক্রমনের সময় ইয্রার লেখা এ পাণ্ডুলিপিও বিনষ্ট হয়ে যায়।

চতুর্থ এন্টিয়ক খৃ. পূ. ১৭৫-১৬৩ সালের মধ্যে সিরিয়ার শাসক ছিলেন। তিনি ইয়াহূদী ধর্ম সম্পূর্ণ নির্মূল ও উচ্ছেদ করে ফিলিস্তিনে গ্রীক হেলেনীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি অর্থের বিনিময়ে ইয়াহূদী ধর্মযাজকদের পদ ক্রয় করে নেন। তিনি প্রায় ৮০ হাজার ইয়াহূদী হত্যা করেন, যেরুজালেম ধর্মালয়ের সকল সম্পদ লুণ্ঠন করেন এবং ইয়াহূদীদের বেদিতে শূকর জবাই করেন। তিনি ২০ হাজার সৈন্যকে যেরুজালেম অবরোধ করতে নির্দেশ দেন। শনিবার ইয়াহূদীরা যখন ধর্মালয়ে প্রার্থনার জন্য জমায়েত হয় তখন তার সৈন্যরা তাদের উপর আক্রমন চালায়, নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করে, সকল বাড়িঘর ধ্বংস করে অগ্নিসংযোগ করে। পাহাড়ে-গুহায় পলাতক কিছু ইয়াহূদী ছাড়া

কেউই এ হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা পায় না। (এ গ্রন্থের ---- পৃষ্ঠায় (খ) বিষয়টি দেখুন।)

দ্বিতীয় বিষয়: ইয়াহূদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই বলেন যে, ইয্রা হগয় ভাববাদী ও ইদ্দোর পুত্র সখরিয়, এই দুইজন ভাবাবদীর সহায়তায় 'বংশাবলির প্রথম খণ্ড' **(The First Book of The Chronicles)** ও 'বংশাবলির দ্বিতীয় খণ্ড' **(The Second Book of The Chronicles)** গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। এই গ্রন্থদ্বয় মূলত এ তিন ভাববাদীর লেখা। অথচ এ দুই গ্রন্থের সাথে তোরাহ-এর বিবরণের ব্যাপক বৈপরীত্য রয়েছে। ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ একমত যে, ইয্রা তাওরাতের অসম্পূর্ণ ও আংশিক কাগজপত্রের উপর নির্ভর করেছিলেন এজন্য পুত্র ও পৌত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন নি। একথা তো স্পষ্ট যে, এই তিনজন ভাববাদী তাদের নিকট প্রচলিত 'তোরাহ' এর বর্ণনা অনুসরণ করে তাদের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। যদি মোশির (মূসা আ. এর) যে তোরাহ-এর উপর তাঁরা নির্ভর করেছিলেন আজকের প্রচলিত তোরাহ যদি সেই মোশির 'তোরাহ'ই হতো, তাহলে কোনো মতেই এ তিন ভাববাদীর বর্ণনার সাথে তোরাহ-এর বর্ণনার বৈপরীত্য দেখা দিত না বা তারা কোনোভাবেই তোরাহ-এর বিরোধিতা করতেন না। আর যদি ইয্রার সময়ে মোশির তোরাহ-এর কোনো অস্তিত্ব থাকত তাহলে তিনি

কখনোই তোরাহ বাদ দিয়ে ‘অসম্পূর্ণ বংশতালিকা’র উপর নির্ভর করতেন না।

ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, ইয্রা ওহী বা ইলহামের (**Divine Inspiration**) মাধ্যমে তোরাহ নতুন করে লিখেছিলেন। যদি বর্তমান প্রচলিত তোরাহ-ই ইয্রা লিখিত তোরাহ হতো তাহলে কখনোই ইয্রার লিখিত বিবরণের সাথে তোরাহ-এর বিবরণে বৈপরীত্য থাকতো না।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, বর্তমানে বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত তোরাহ (পুরাতন নিয়মের প্রথম ৫টি গ্রন্থ) মোশি বা মূসা আলাইহিস সালাম প্রদত্ত তোরাহ নয় এবং তা ইয্রা লিখিত তোরাহ-ও নয়। সত্য কথা হলো, তোরাহ (**Torah or Pentateuch**) নামে প্রচলিত এই গ্রন্থগুলি তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন গল্প, কাহিনী, বর্ণনা ইত্যাদির সংকলন মাত্র। ইয়াহূদী ধর্মগুরুগণ এ সকল প্রচলিত গল্প কাহিনী ইত্যাদি কোনো রকম বাছবিচার ও বাছাই ছাড়াই সংকলন করেছেন এবং “পুরাতন নিয়ম” নামক পুস্তক সংকলনের মধ্যে তা সংকলন করেছেন। তাওরাত ও পুরাতন নিয়মের বিষয়ে এ মতটি ইউরোপে এবং বিশেষত জার্মান পণ্ডিতদের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

তৃতীয় বিষয়: যদি কেউ যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ৪৫শ ও ৪৬শ অধ্যায়দ্বয়ের সাথে গণনা পুস্তকের ২৮শ ও ২৯শ অধ্যায়দ্বয়ের তুলনা করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, উভয়ের মধ্যে ঐশ্বরিক

বিধানাদি বর্ণনার ক্ষেত্রে স্পষ্ট বৈপরীত্য রয়েছে। একথা স্পষ্ট যে, যিহিষ্কেল ভাববাদী নিজ গ্রন্থে লিখিত ঐশ্বরিক বিধানাদি বর্ণনার ক্ষেত্রে তার যুগে প্রচলিত 'তোরাহ'-এর উপর নির্ভর করেছিলেন। যদি বর্তমান যুগে প্রচলিত তোরাহ-ই তার যুগের তোরাহ হতো তাহলে কখনোই তিনি ঐশ্বরিক বিধানের বর্ণনায় তোরাহ-এর বিরোধিতা করতেন না।

চতুর্থ বিষয়: প্রচলিত 'তোরাহ' বা তাওরাতের একটি স্থান থেকেও বুঝা যায় না যে মোশি (মূসা) নিজে এই গ্রন্থের কথাগুলি লিখেছেন। বরং তোরাহ-এর ভাষা ও ভাব স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করে যে, 'অন্য কোনো ব্যক্তি এই গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেছেন। এই 'অন্যব্যক্তি' ইয়াহূদীদের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন গল্প-কাহিনী ও বর্ণনাগুলি সংকলন করেছেন। সংকলক যে কথাটিকে 'ঈশ্বরের কথা' বলে মনে করেছেন সে কথার বিষয়ে বলেছেন 'ঈশ্বর/ সদাপ্রভু বলেন'। আর যে কথাকে মোশির কথা বলে মনে করেছেন সে কথার বিষয়ে বলেছেন: 'মোশি বলেন'। সকল ক্ষেত্রে 'মোশির' জন্য 'নাম পুরুষ' বা 'তৃতীয় পুরুষ' ব্যবহার করেছেন। যদি এ সকল গ্রন্থ মোশির নিজের প্রণীত হতো তাহলে তিনি তার নিজের ক্ষেত্রে 'উত্তম পুরুষ' ব্যবহার করতেন। কিছু না হলেও অন্তত একটি স্থানে নিজের জন্য 'উত্তম পুরুষ' ব্যবহার করতেন। কারণ 'উত্তম পুরুষ' ব্যবহার পাঠক বা শ্রোতার অতিরিক্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে।

এভাবে তোরাহ-এর গ্রন্থাবলী থেকে এ কথাটিই স্পষ্ট যে, এগুলি মোশি কতৃক সংকলিত বা প্রদত্ত নয়; বরং পরবর্তী যুগের কেউ এগুলি সংকলন করেছেন। এর বিপরীতে কোনো শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত এই কথাটিই স্বীকৃত সত্য বলে গৃহীত হবে। কেউ যদি এর বিপরীত কোনো দাবি করেন তাহলে তাকে তার দাবি প্রমাণ করতে হবে।

পঞ্চম বিষয়: প্রখ্যাত নির্ভরযোগ্য খৃস্টান পণ্ডিত আলেকজান্ডার কীথ নতুন বাইবেলের ভূমিকায় লিখেছেন: "বিভিন্ন প্রমাণের মাধ্যমে তিনটি বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে:

(ক) প্রচলিত তোরাহ মোশির রচিত নয়।

(খ) তোরাহ-এর গ্রন্থগুলি ইয়াহূদীদের কেনানে (সিরিয়ায়) আগমনের পরে বা যেরুজালেমে আগমণের পরে লেখা হয়েছে। অর্থাৎ মোশির সময়ে, যখন ইস্রাঈল সন্তানগণ মরুভূমিতে অবস্থান করছিলেন তখন লেখা হয়নি।

(গ) প্রচলিত তাওরাত সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর যুগে, অর্থাৎ খৃ. পূ. ১০ শতাব্দীতে, অথবা এর পরে খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর দিকে লিখিত হয়েছে। মূল কথা হলো, প্রচলিত তোরাহ-এর গ্রন্থগুলি মোশির মৃত্যুর ৫০০ বৎসরেরও বেশি পরে লেখা হয়েছে।

ষষ্ঠ বিষয়: বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা অবিসংবাদিত সত্য যে, একই ভাষার শব্দভাণ্ডার ও বাচনভঙ্গিতে যুগের আবর্তনে

পরিবর্তন ঘটে। ৪০০ বৎসর আগের ইংরেজির সাথে বর্তমান সময়ের ইংরেজির তুলনা করলেই উভয় ইংরেজির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য ধরা পড়বে। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ খৃস্টান পণ্ডিত নর্টন বলেন: "তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি গ্রন্থের ভাষার ব্যবহার বা বাচনভঙ্গি এবং পুরাতন নিয়মের অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি, যেগুলি ইস্রাঈল সন্তানদের ব্যবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্তির পরে লেখা সেগুলির ভাষার ব্যবহার বা বাচনভঙ্গির মধ্যে কোনো গ্রহণযোগ্য পার্থক্য নেই। অথচ মোশির যুগ এবং মুক্তি পরবর্তী যুগ এই দুই যুগের মধ্যে ৯০০ বৎসরের ব্যবধান। যেহেতু তোরাহ-এর ভাষা ও পরবর্তী গ্রন্থগুলির ভাষার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই সেহেতু হিব্রু ভাষায় পরিপূর্ণ বুৎপত্তি সম্পন্ন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত লিউসডিন মনে করেন যে, এ সকল গ্রন্থ সবই একই যুগে লেখা হয়েছে।

সপ্তম বিষয়: দ্বিতীয় বিবরণের ২৭ অধ্যায়ের ৫, ৮ শ্লোকে বলা হয়েছে: "৫ আর সে স্থানে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞবেদি, প্রস্তরের এক বেদি গাঁথিবে, তাহার উপরে লৌহাস্ত্র তুলিবে না।... ৮ আর সেই প্রস্তরের উপরে এই ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য অতি স্পষ্টরূপে লিখিবে।"

যিহোশূয়ের পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ের ৩০, ৩৩ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মোশি যেভাবে আদেশ করেছিলেন সেভাবে যিহোশূয় যজ্ঞবেদি নির্মাণ করেন এবং সেই বেদির উপরে তাওরাত লিখে

রাখেন: “তৎকালে যিহোশূয় এবল পর্বতে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞবেদি নির্মাণ করিলেন। সদাপ্রভুর দাস মোশি ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে যেমন আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তেমনি তাহারা মোশির ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত আদেশানুসারে অতক্ষিত প্রস্তরে, যাহার উপরে কেহ লৌহ উঠায় নাই, এমন প্রস্তরে ঐ যজ্ঞবেদি নির্মাণ করিল।...। আর তথায় প্রস্তরগুলির উপরে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে তিনি মোশির লিখিত ব্যবস্থার এক অনুলিপি লিখিলেন।”[16]

উপরের বিবরণ থেকে জানা গেল যে, মোশির উপর অবতীর্ণ বা মোশি লিখিত তাওরাত বা তোরাহ-এর আকৃতি ও পরিমাণ এমন ছিল যে, একটি যজ্ঞবেদির পাথরে তা পুরোপুরি লিখে রাখা যেত। তোরাহ বলতে যদি বর্তমানে প্রচলিত বিশালাকৃতির ৫টি গ্রন্থ বুঝানো হতো তাহলে কোনো অবস্থাতেই তা সম্ভব হতো না।

অষ্টম বিষয়: প্রচলিত তোরাহ-এর মধ্যে অনেক ভুল রয়েছে। আবার তোরাহ-এর পুস্তকগুলির একটির সাথে আরেকটির বর্ণনার বৈপরীত্য রয়েছে। এদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এগুলি কখনোই মূসা আলাইহিস সালাম-এর তাওরাত নয়। ওহীর মাধ্যমে পাওয়া মোশির (মূসা আ.) কথায় এই ধরনের ভুল থাকতে পারে না।

---

[16] যিহোশূয়ের পুস্তক ৮/৩০-৩২।

১. ২. ২. যিহোশূয়ের পুস্তক (The Book of Joshua)

উপরের আলোচনা থেকে পাঠক ইস্রায়েলী ধর্মের মূল ভিত্তি তাওরাত (**Torah or Pentateuch**) -এর অবস্থা জানতে পারলেন। এখন আমরা তাওরাতের পরেই যে গ্রন্থের স্থান সেই 'যিহোশূয়ের পুস্তক'-এর অবস্থা আলোচনা করব। প্রথমেই যে কথা উল্লেখ করা দরকার তা হলো, এখন পর্যন্ত ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ নিশ্চিতরূপে জানেন না যে, গ্রন্থটির লেখক কে এবং কোন্ যুগে তা লেখা হয়েছে। এই গ্রন্থটির বিষয়ে তাদের পাঁচটি মত রয়েছে:

1. কেউ কেউ বলেন, গ্রন্থটি (মোশির শিষ্য) যিহোশূয়ের লিখিত।
2. কেউ কেউ বলেন, গ্রন্থটি (হারোণের পৌত্র) পীনহস কর্তৃক লিখিত।
3. কেউ কেউ বলেন, গ্রন্থটি (হারোণের পুত্র, পীনহসের পিতা) ইলিয়াসর কর্তৃক প্রণীত।[17]
4. কেউ কেউ বলেন, গ্রন্থটি শমূয়েল কর্তৃক রচিত।
5. কেউ কেউ বলেন, গ্রন্থটি যিরমিয় কর্তৃক রচিত।

উল্লেখ্য যে, যিহোশূয় এবং যিরমিয়র মধ্যে সময়ের ব্যবধান হলো কমবেশি প্রায় ৮৫০ বৎসর।[18] তাদের নিজেদের ধর্মের মূল

---

[17] পীনহস ও ইলিয়াসরের পরিচয় দেখুন: ১ বংশাবলী ৬/৩-৪।

[18] যিরমিয় ভাববাদী খৃস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের মানুষ। আর মোশির শিষ্য যিহোশূয়ের সময়কাল নিয়ে ইহূদী-খৃস্টান পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মোশির মৃত্যুর

ধর্মগ্রন্থের লেখকের বিষয়ে এ ব্যাপক মতভেদ পূর্ণরূপে প্রমাণ করে যে, গ্রন্থটির লেখক সম্পর্কে তাদের নিকট কোনো সূত্র নেই। প্রত্যেক গবেষক তার নিজের ধারণা ও অনুমানের উপর নির্ভর করে মতামত প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেকে পারিপার্শ্বিক কিছু নির্দেশনার উপর নির্ভর করে সম্পূর্ণ আন্দাজে ঢিল ছুড়ে বলেছেন যে, অমুকই বোধহয় এই গ্রন্থের লেখক। এ আন্দাজই তাদের একমাত্র সনদ বা সূত্র।

যিহোশূয়ের পুস্তকের মধ্যে কিছু শ্লোক ও অনুচ্ছেদ রয়েছে যেগুলি কখনোই যিহোশূয়ের বক্তব্য বা তাঁর নিজের লেখা হতে পারে না। অনুরূপভাবে এ পুস্তকের মধ্যে এমন কিছু অনুচ্ছেদ বিদ্যমান যেগুলি দাউদ আলাইহিস সালাম-এর সমসাময়িক কোনো ব্যক্তির লেখা বলে প্রমাণিত। এ সকল অনুচ্ছেদ সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, এ গ্রন্থটি কখনোই যিহোশূয়ের লেখা নয়।

প্রচলিত তাওরাতের কিছু বর্ণনা ও বিধানের সাথে যিহোশূয়ের পুস্তকের কিছু বর্ণনা ও বিধানের সুস্পষ্ট বৈপরীত্য ও সংঘর্ষ রয়েছে। ইয়াহূদী-খৃস্টানদের দাবি অনুসারে যদি প্রচলিত তোরাহ মোশির রচিত হতো অথবা যিহোশূয়ের পুস্তকটি তার নিজের রচনা হতো তাহলে কখনোই মোশির শিষ্য যিহোশূয় মোশির তাওরাতের

পরে খৃস্টপূর্ব ১৬শ, ১৫শ বা ১৩শ শতকে তিনি ইহূদীদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। উভয়ের মধ্যে ৭, ৮ বা ৯ শতকের ব্যবধান।

বিরোধিতা করতেন না এবং তার নিজের উপস্থিতিতে মোশি যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন তা পাল্টে দিতেন না।

উপরের আলোচনা থেকে পাঠক পুরাতন নিয়মের মূল ৬টি গ্রন্থ- তাওরাত ও যিহোশূয়ের পুস্তকের অবস্থা জানতে পেরেছেন। পুরাতন নিয়মের অবশিষ্ট ৩৩টি বা ৪০টি পুস্তকের অবস্থা এ ছয়টি পুস্তকের চেয়ে মোটেও ভাল নয়। এগুলির লেখকদের নাম, পরিচয় ও সংকলনের সময়কালের বিষয়ে ইয়াহূদী-খৃস্টান গবেষকদের মতভেদ আরো বেশি ব্যাপক। অনেক গবেষক পুরাতন নিয়মের অনেকগুলি পুস্তক পুরাতন নিয়মের অংশ নয় বলে উল্লেখ করেছেন এবং এগুলিকে একেবারেই বাতিল ও কল্পকাহিনী বলে গণ্য করেছেন। তারা দাবি করেছেন যে, প্রাচীন ইয়াহূদীগণ অনেক জাল কাহিনী ও জাল পুস্তক ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সংযুক্ত করেছেন, যেগুলি মূলত বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত।

এগুলি সবই সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের নিকট বাইবেলের কোনো গ্রন্থেরই অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা নেই। তারা যা কিছু বলেন সবই আন্দাজ ও কল্পনা মাত্র। আর কোনো গ্রন্থকে কোনো নবী, ভাববাদী বা ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তির নামে প্রচার করলেই তা ঐশ্বরিক বা ঐশী গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হয় না, বরং গ্রন্থটি সত্যই উক্ত ব্যক্তি লিখেছেন বলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে হয়।

১. ২. ৩. ইঞ্জিল বা সুসমাচারগুলির সূত্র পর্যালোচনা

১. ২. ৩. ১. মথিলিখিত সুসমাচার

সকল প্রাচীন খৃস্টান ধর্মবেত্তা পণ্ডিত ও অগণিত আধুনিক খৃস্টান পণ্ডিত একমত যে, মথিলিখিত সুসমাচারটি মূলত হিব্রু ভাষায় লেখা ছিল। খৃস্টান সম্প্রদায়গুলির বিকৃতির কারণে এবং প্রথম তিন শতাব্দীর সমস্যাদির কারণে মূল হিব্রু গ্রন্থটি হারিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত হিব্রু সংস্করণ গ্রন্থটির গ্রীক অনুবাদের অনুবাদ। বস্তুত সুসমাচারটির গ্রীক অনুবাদই গ্রন্থটির প্রাচীনতম সূত্র হিসেবে বিদ্যমান। এই গ্রীক অনুবাদটিরও কোনো সূত্র পরম্পরা তাদের নিকট নেই। এমনকি, এখন পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি যে, এই গ্রীক অনুবাদটির অনুবাদক কে? প্রাচীন খৃস্টান ধর্মবেত্তা পণ্ডিত জীরোম (**St. Jerome**: ৩৪২-৪২০ খৃ) তা স্বীকার করেছেন। অনুবাদকের নামই যখন জানা যায়নি, তখন অনুবাদকের সততা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি অবস্থা জানার আর সুযোগ কোথায়!?

খৃস্টান ধর্মগুরু পণ্ডিতগণ সম্পূর্ণ আন্দাজে ঢিল ছুড়ে বলেন যে, সম্ভবত অমুক বা তমুক হয়ত অনুবাদ করেছিলেন। এরূপ প্রমাণবিহীন আন্দাজ ও অনুমানের উপর নির্ভর করে কোনো পুস্তকের লেখকের নামও নির্ধারণ করা যায় না।

মথির নামে প্রচলিত ইঞ্জিলই প্রথম এবং প্রাচীনতন ইঞ্জিল। এ ইঞ্জিলটির বিষয়ে পঞ্চাশেরও অধিক খৃস্টান গবেষক পণ্ডিত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, যীশুর শিষ্য মথি এর লেখক নন। নতুন নিয়মের সকল পুস্তক ও পত্র গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছে। কেবলমাত্র মথির ইঞ্জিল ও ইব্রীয়দের প্রতি পত্র। অগণিত অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন প্রমাণের আলোকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে এ দুটি পুস্তক হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছে। সুসমাচার লেখকগণের মধ্যে একমাত্র মথিই তার সুসমাচার হিব্রু ভাষায় লিখেন। ফিলিস্তিনের হিব্রুভাষী ইয়াহূদীদের উদ্দেশ্যে এ সুসমাচারটি লেখা হয়, যারা ইব্রাহীম ও দাউদের বংশের একজন ত্রানকর্তার অপেক্ষা করছিলেন। এরপর বিভিন্ন অনুবাদক প্রত্যেকে নিজ নিজ বুঝ ও সাধ্য অনুসারের সুসমাচারটি অনুবাদ করেন। মথি নিজে তার সুসমাচারটি গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করেন নি। প্রচলিত গ্রীক সুসমাচারটির অনুবাদক কে বা তার পরিচয় কি তা কেউই জানেন না। অন্যান্য সুসমাচার গ্রীক ভাষায় লেখা হয়েছে। কেউ যদি বলেন যে, মথি তার সুসমাচারটি গ্রীক ভাষায় লিখেছিলেন তাহলে তিনি ভুল ও অসত্য বলবেন।

পণ্ডিত ও গবেষক নর্টন একটি বৃহদাকার পুস্তক রচনা করেছেন। এ পুস্তকে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, প্রচলিত তোরাহ নিঃসন্দেহে ও নিশ্চিতরূপে জাল ও বানোয়াট। এগুলি কখনোই মোশির রচনা নয়। তিনি নতুন নিয়ম বা সুসমাচারের পুস্তকগুলির মূল অস্তিত্ব স্বীকার

করেছেন। তবে সেগুলির মধ্যে অনেক বিকৃতি রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

তিনি এ পুস্তকে লিখেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে, মথি তাঁর সুসমাচারটি হিব্রু ভাষায় লিখেছিলেন। কারণ প্রাচীন যে সকল পণ্ডিত বিষয়টি আলোচনা করেছেন তাঁদের সকলেই ঐকমত্যের সাথে এই একই কথা বলেছেন। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, মথি হিব্রু ভাষায় সুসমাচার লিখেন। কেনো একজন প্রাচীন পণ্ডিতও তাঁদের বিপরীত কিছু বলেন নি। তাঁদের এ সাক্ষ্যের বিপরীতে একটি আপত্তিও পাওয়া যায় নি যে কারণে এ বিষয়ে কোনো গবেষণা বা পর্যালোচনার প্রয়োজন হতে পারে। এটি অত্যন্ত বড় সাক্ষ্য ও শক্তিশালী প্রমাণ। উপরন্তু প্রাচীন ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, সেন্ট জিরোমের যুগ পর্যন্ত (মৃত্যু ৪২০ খৃ) মথির লিখিত হিব্রু সুসমাচারটি ইব্রীয় খৃস্টান বা ইয়াহূদী ধর্ম থেকে আগত খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রচলিত মথিলিখিত সুসমাচারটি হারিয়ে যাওয়া মূল হিব্রু সুসমাচারটির অনুবাদ, তবে অনুবাদকের নাম, পরিচয় বা অন্য কোনো কিছুই নিশ্চিতভাবে জানা যায় না।

প্রচলিত মথিলিখিত সুসমাচারের বর্ণনাভঙ্গি ও উপস্থাপনা প্রাচীন পণ্ডিতগণের বক্তব্য প্রমাণ করে। পুস্তকটির উপস্থাপনা ও বর্ণনা পদ্ধতি থেকে বুঝা যায় যে, পুস্তকটি মথির নিজের রচিত নয়। কারণ মথি যীশুর প্রেরিত ১২ শিষ্যের একজন ছিলেন। খৃস্টের অধিকাংশ

অবস্থা ও ঘটনা তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি নিজে যদি এই সুসমাচারটি লিখতেন তবে পুস্তকটির কোথাও না কোথাও তাঁর উপস্থাপনা থেকে প্রকাশ পেত যে, তিনি তাঁর নিজে দেখা ঘটনাগুলি লিখছেন। এছাড়া তিনি নিজের কথা বলতে অবশ্যই উত্তম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করতেন। প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত লেখকগণ এভাবেই লিখেন। এভাবে প্রচলিত মথিলিখিত সুসমাচারের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে, গ্রন্থটি মথির নিজের লেখা নয়।

মানিকীয (**Manichees**) সম্প্রদায়ের চতুর্থ শতাব্দীর অস্ট্রীয় পণ্ডিত ফাস্টিস বলেন, মথির নামে প্রচলিত সুসমাচারটি তাঁর রচিত নয়।

মারসিওনের (**Marcion**) অনুসারিগণ এবং এবোনাইট (**Ebionites**) সম্প্রদায়ের মতে প্রচলিত গ্রন্থটির প্রথম দুটি অধ্যায় জাল ও সংযোজিত। ইউনিট্যারিয়ান (একত্ববাদী) খৃস্টান সম্প্রদায় এবং পাদ্রী উইলিয়ামসও অধ্যায় দুটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। নর্টন এ দুটি অধ্যায় এবং এ সুসমাচারের অধিকাংশ বক্তব্য অনির্ভরযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

১. ২. ৩. ২. মার্কলিখিত সুসমাচার

৪র্থ-৫ম শতাব্দীর প্রসিদ্ধতম খৃস্টান পণ্ডিত সেন্ট জীরোম লিখেছেন যে, কোনো কোনো প্রাচীন ধর্মগুরু পণ্ডিত মার্কলিখিত

সুসমাচারের শেষ অধ্যায়ের (১৬ অধ্যায়ের) বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন। কোনো কোনো প্রাচীন পণ্ডিত ধর্মগুরু লূকলিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ের কিছু শ্লোকের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন। কতিপয় প্রাচীন ধর্মগুরু পণ্ডিত এই সুসমাচারের প্রথম দুইটি অধ্যায়ের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন। মারসিওনীয় সম্প্রদায়ের খৃস্টানগণের নিকট সংরক্ষিত বাইবেলে লুকলিখিত সুসমাচারে এই অধ্যায় দুটি নেই।

গবেষক পণ্ডিত নর্টন মার্কলিখিত সুসমাচারের বিষয়ে লিখেছেন যে, এ সুসমাচারের ১৬শ অধ্যায়ের ৯ শ্লোক থেকে শেষ (২০ শ্লোক) পর্যন্ত অংশটুকু জাল ও পরবর্তীকালে সংযোজিত।[19] তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, বাইবেল লেখক ও লিপিকারগণ কোনো কথাকে গ্রন্থ থেকে বের করার চেয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতেই বেশি পারঙ্গম ও অধিক আগ্রহী ছিলেন।

১. ২. ৩. ৩. যোহনলিখিত সুসমাচার

---

[19] ১৯৫২ খৃস্টব্দে মুদ্রিত বাইবেলের (**RSV**) -এ মার্কলিখিত সুসমাচারের এই শেষ বা ১৬তম অধ্যায়টির ১-৮ শ্লোক রাখা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৯-২০ শ্লোক বাদ দেওয়া হয়েছিল পরবর্তীতে আবার সেগুলি সংযোজিত করা হয়েছে। বিস্তারিত দেখুন, **Ahmed Deedat, The Choice, Vol-2 (Is The Bible God's Word?) page 80-97.**

কোনো পূর্ণ সূত্র পরম্পরার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়নি যে, এই সুসমাচারটি যীশুর শিষ্য যোহন কর্তৃক রচিত। বরং বিভিন্ন বিষয় প্রমাণ করে যে, এ সুসমাচারটি যীশুর শিষ্য যোহনের লেখা নয়:

প্রথম বিষয়: যোহনলিখিত সুসমাচার পাঠ করে মোটেও বুঝা যায় না যে যীশুর শিষ্য যোহন নিজের চোখে দেখে সে সকল বিষয় লিখছেন। বরং বাহ্যত বুঝা যায় যে, পরবর্তী কোনো ব্যক্তি এগুলির বর্ণনা করছেন। উপরন্তু এ সুসমাচারের বক্তব্য প্রমাণ করে যে, গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অন্য কেউ, যীশু শিষ্য যোহন নন। যোহনলিখিত সুসমাচারের শেষে, ২১ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "সেই শিষ্যই এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন এবং এই সকল বিষয় লিখিয়াছেন; আর আমরা জানি, তাঁহার সাক্ষ্য সত্য।"

এখানে আমরা দেখছি যে, সুসমাচারের লেখক শিষ্য যোহনের বিষয়ে বলছেন: 'সেই শিষ্যই এই সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন', 'তাঁহার সাক্ষ্য', ইত্যাদি। এভাবে তিনি যোহনের জন্য নাম পুরুষে সর্বনাম ব্যবহার করছেন। পক্ষান্তরে লেখক তার নিজের জন্য উত্তম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করে বলছেন: 'আমরা জানি'[20]। এথেকে

---

[20] এর পরের শ্লোকটি (যোহন ২১/২৫) নিম্নরূপ: "যীশু আরও অনেক কর্ম করিয়াছেন। সে সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে আমার বোধ হয়, লিখিতে লিখিতে এত গ্রন্থ হইয়া উঠে যে, জগতেও তাহা ধরে না।" এ দু শ্লোকের মাধ্যমে এ সুসমাচারের ইতি টানা হয়েছে। এখানে এ শ্লোকের 'আমার'

স্পষ্টতই জানা যায় যে, এই সুসমাচারের লেখক যোহন ছাড়া অন্য কেউ।

দ্বিতীয় বিষয়: দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকে অনেকেই এই 'সুসমাচারটিকে' অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, এটি যোহনের লিখিত নয়। এ সময়ে আরিনূস (১৩০-২০০খৃ)[21] জীবিত ছিলেন।

(I) ও উপরের শ্লোকের 'আমরা' (We) এর সাথে সেই শিষ্য... তাহার.. ইত্যাদির তুলনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, সেই শিষ্য বলতে যোহনকে বুঝানো হয়েছে। যোহনের কথার ভিত্তিতে অন্য কেউ এ গসপেল বা সুসমাচারটি রচনা করেছেন এবং সুসমাচারের শেষে বিষয়টি বর্ণনা করে এর ইতি টেনেছেন।

[21] (Irenaeus) দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের প্রখ্যাত খৃস্টান। তিনিই সর্বপ্রথম খৃস্টানধর্মকে একটি কেতাবী ধর্ম হিসাবে রূপ প্রদানের চেষ্টা করেন। এরপূর্বে খৃস্টান ধর্মপ্রচারক ও ধমগুরুগণ মূলত ইহূদীদের ধর্মগ্রন্থ বা পুরাতন নিয়মের গ্রন্থগুলিকেই নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থরূপে মেনে চলতেন। যীশুর শিক্ষা মৌখিক প্রচার করা হতো, যদিও কিছু কিছু শিক্ষা, গসপেল, চিঠি ইত্যাদি তাদের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ছিল। তিনিই প্রথম ২০০ খৃস্টাব্দের দিকে প্রথম তিনটি গসপেলের (মথি, মার্ক ও লূক) কথা উল্লেখ করেন। সর্বপ্রথম তার কথা থেকেই এই তিনটি গসপেলের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এরপর ২১৬ খৃস্টাব্দে ক্লিমেন্ট ইসকান্দ্রিয়ানূস (Clement of Alexandira) এই তিনটি গসপেলের কথা উল্লেখ করেছেন। দেখুন: **Oxford Illustrated History of Christianity, New York, Oxford University Press, 1990, page 30-31.** তারিখ কানীসাতিল মাসীহ, পৃষ্ঠা ৪৫।

আরিনূস ছিলেন পোলিকার্পের **(St. Polycarp, Bishop of Smyrna c. 69-155)** শিষ্য। আর পোলিকার্প ছিলেন যীশু-শিষ্য যোহনের শিষ্য। যখন মানুষেরা যোহনের নামে প্রচারিত এই সুসমাচারটি অস্বীকার করছিলেন তখন তিনি একটিবারের জন্যও বলেন নি যে, আমি আমার গুরু পোলিকার্পকে বলতে শুনেছি যে, এই সুসমাচারটি তার গুরু যোহনের রচিত।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যীশু শিষ্য যোহন যদি কোনো 'সুসমাচার' লিখে থাকতেন তাহলে তার শিষ্য পোলিকার্প তা জানতেন এবং আরিনূসকে বলতেন।

আরিনূস মৌখিক বর্ণনা মুখস্থ করতে অতীব আগ্রহী ছিলেন। তিনি পোলিকার্প থেকে অনেক গুরুত্বহীন বিষয় মুখস্ত ও বর্ণনা করেছেন। একথা কল্পনা করা যায় না যে, আরিনূস তার গুরু পোলিকার্প থেকে বিভিন্ন অতি সাধারণ বিষয় বারংবার শুনবেন এবং উদ্ধৃত করবেন, অথচ সুসমাচার-এর মত এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটিবারও শুনবেন না বা শুনলেও তা বলবেন না, এমনকি বিতর্ক ও সংঘাতের মধ্যেও সে বিষয়ে কিছু বলবেন না।

সর্বোপরি আরিনূসই সর্বপ্রথম ২০০ খৃস্টাব্দের দিকে প্রথম তিনটি সুসমাচার: মথি, মার্ক ও লূকের সুসমাচারের কথা উল্লেখ করেন। তার বক্তব্য থেকেই সর্বপ্রথম এ তিনটি পুস্তকের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। কিন্তু তিনি যোহনের সুসমাচারের কথা উল্লেখ করেন নি।

এরপর ২১৬ খৃস্টাব্দে ক্লিমেন্ট ইসকাদ্রিয়ানূস (**Clement of Alexandira**) এ তিনটি গসপেলের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনিই প্রথম যোহন লিখিত সুসমাচারের কথা উল্লেখ করেন। যারা বিশ্বাস বা দাবি করেন যে, এ গ্রন্থটি যীশু শিষ্য যোহনের লেখা তারা তাদের মতের পক্ষে একটিও প্রমাণ পেশ করতে পারেন নি, এমনকি আরিনূসের বক্তব্যে তাদের মতের সমর্থন পাওয়া যায় নি।

তৃতীয় বিষয়: শুধু মুসলিম পণ্ডিতগণই নয়, প্রাচীনকাল থেকেই অনেক খৃস্টান ও অখৃস্টান পণ্ডিত বলেছেন যে, এ সুসমাচারটি যোহনের লিখিত নয়। কয়েকটি নমুনা দেখুন:

(১) দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের একজন প্রসিদ্ধ পৌত্তলিক পণ্ডিত ছিলেন সেলসাস (**Celsus**)।[22] তিনি সেই সময়েই চিৎকার করে বলতেন যে, খৃস্টানগণ তাদের ইঞ্জিলগুলি তিনবার বা চারবার বা তারও বেশিবার কঠিনভাবে পরিবর্তন করেছে, এমনকি সেগুলির বিষয়বস্তুও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।

(২) 'মানীকীয' (**Manichees/Manichaeism**) সম্প্রদায়ের অস্ট্রীয় পণ্ডিত ফাস্টিস চতুর্থ শতকে চিৎকার করে ঘোষণা করেছেন: "একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, নতুন নিয়ম যীশু খৃস্ট লিখেন

---

[22] **Philosopher Celsus, an influential 2nd-century Platonist of Alexandria and perhaps the first serious critic of Christianity. Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007. Article Origen, Contra Celsum (Against Celsus)**

নি এবং তার শিষ্যগণও লিখেন নি। বরং কোনো অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তা লিখেছে এবং সেগুলিকে যীশুর শিষ্যগণ এবং তাদের সহচরদের নামে চালিয়েছে। কারণ সে ভয় পেয়েছিল যে, যেহেতু যীশু সময়কালীন যে সকল ঘটনা সে লিখেছে সেগুলি সে প্রত্যক্ষ করেনি এজন্য মানুষেরা তার লেখা গ্রন্থ গ্রহণ করবে না। এই জালিয়াতি কর্মের মাধ্যমে সে যীশুর অনুসারীদেরকে অত্যন্ত কঠিনভাবে কষ্ট দিয়েছে। কারণ সে অগণিত ভুল ও বৈপরীত্যে ভরা কিছু বই লিখেছে।"

(৩) ইস্টাডলিন লিখেছেন যে, "এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আলেকজেন্দ্রীয় স্কুলের একজন ছাত্র যোহনলিখিত সুসমাচারটি লিখেছে।"

(৪) পণ্ডিত ব্রিটিশনিডার বলেছেন: "এই সুসমাচারটির কোনো কিছু এবং যোহনের নামে প্রচলিত পত্রগুলি যোহনের নিজের রচিত নয়; বরং দ্বিতীয় শতকের শুরুতে কোনো একজন তা রচনা করেছে।"

(৫) প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ক্রোটিস বলেছেন: "এই সুসমাচারটি ছিল ২০ অধ্যায়। যোহনের মৃত্যুর পরে অফসিস চার্চের পক্ষ থেকে এতে ২১ অধ্যায়টি সংযুক্ত করা হয়।"

(৬) দ্বিতীয় শতকে বিদ্যমান 'এ্যালোগিন' নামক খৃস্টীয় সম্প্রদায় এই সুসমাচারটি এবং যোহনের নামে প্রচালিত পত্রগুলি মানতেন না এবং এগুলিকে বাইবেলের অংশ মনে করতেন না।

বাইবেল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হর্ন-এর বক্তব্য দিয়ে এ আলোচনা শেষ করছি। তিনি তার রচিত বাইবেলের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন যে, প্রাচীন চার্চের বা খৃস্টধর্মের ঐতিহাসিকগণের পক্ষ থেকে সুসমাচারগুলির রচনার সময় ও অবস্থা সম্পর্কে সে সকল তথ্য আমরা পেয়েছি সেগুলি অনির্ধারিত ও অসম্পূর্ণ। এ সকল মতামত ও বক্তব্য আমাদেরকে কোনো একটি নির্ধারিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দেয় না। প্রথম যুগের ধর্মগুরু পণ্ডিতগণ বানোয়াট, বাতুল বা দুর্বল বর্ণনাগুলিকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছেন এবং লিখে রেখেছেন। তাদের পরে যারা এসেছেন তারা পূর্ববর্তীদের প্রতি ভক্তির কারণে এসকল বাতুল বিবরণগুলিকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। এ সকল সত্য ও মিথ্যা বিবরণ এক লেখক থেকে অন্য লেখক গ্রহণ করেছেন। এখন বর্তমান যুগে এগুলির মধ্য থেকে সঠিক তথ্য বাছাই করার কোনো সুযোগ আর নেই।

অতঃপর হর্ন উল্লেখ করেছেন যে, সুসমাচারগুলির প্রণয়নের সময়কাল সম্পর্কে নিম্নরূপ মতভেদ উল্লেখ করেছেন:

ক. মথিলিখিত সুসমাচার। এ পুস্তকটি ৩৭ অথবা ৩৮ অথবা ৪১ অথবা ৪৩ অথবা ৪৮ অথবা ৬১ অথবা ৬২ অথবা ৬৩ অথবা ৬৪ খৃস্টাব্দে রচিত হয়েছে।

খ. মার্কলিখিত সুসমাচার। এ পুস্তকটি ৫৬ অথবা তার পরে ৬৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে রচিত হয়েছে। যতদূর মনে হয়, গ্রন্থটি ৬০ খৃস্টাব্দে অথবা ৬৩ খৃস্টাব্দে রচনা করা হয়েছে।

গ. লূকলিখিত সুসমাচার। এ পুস্তকটি ৫৩ অথবা ৬৩ অথবা ৬৪ খৃস্টাব্দে রচিত হয়েছে।

ঘ. যোহনলিখিত সুসমাচার। এটি ৬৮ অথবা ৬৯ অথবা ৭০ অথবা ৯৭ অথবা ৯৮ খৃস্টাব্দে রচিত হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে পাঠক খৃস্টধর্মের মূল চারটি 'ইঞ্জিল' বা সুসমাচারের অবস্থা জানতে পেরেছেন। নতুন নিয়মের অবশিষ্ট পুস্তক বা পত্রগুলির অবস্থার এগুলির চেয়ে মোটেও ভাল নয়।

১. ২. ৪. পবিত্র বাইবেলের পুস্তকগুলি ঐশী নয়

উপরের আলোচনা থেকে জ্ঞানী পাঠকের নিকট এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, খৃস্টানগণের নিকট বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের গ্রন্থগুলির কোনোটিরই কোনো মূল উৎস বা সূত্র পরম্পরা সংরক্ষিত নেই। এজন্য ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের এ কথা দাবি করার সুযোগ নেই যে, "পবিত্র বাইবেল" নামে প্রচারিত পুস্তকসংকলনের পুস্তকগুলি আসমানী, ঐশ্বরিক বা ঐশী পুস্তক বা ওহী, ইলহাম বা

ঐশ্বরিক প্রেরণার (**Divine Inspiration, Revelation**) ভিত্তিতে লেখা পুস্তক। যদি কেউ তা দাবি করেন তবে তা ভিত্তিহীন ও বাতিল বলে প্রমাণিত হবে। উপরের আলোচনার পাশাপাশি নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

(১) নতুন ও পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলিতে উল্লিখিত তথ্য ও বিবরণের মধ্যে অগণিত অর্থগত বৈপরীত্য রয়েছে। ইয়াহূদী-খৃস্টান গবেষক, পণ্ডিত ও ভাষ্যকারগণ এ সকল বৈপরীত্যের কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, দুই বা ততোধিক পরস্পর-বিরোধী বিবরণের একটি সত্য ও অন্যটি বা অন্যগুলি মিথ্যা ও জাল। ইচ্ছাকৃত বিকৃতি অথবা অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে এই মিথ্যা তথ্যটি পরিবেশিত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা এ সকল বৈপরীত্য ও পরস্পরবিরোধিতা সমন্বয়ের জন্য এমন অবাস্তব ও ফালতু কথা বলেছেন যা কোনো স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন বিবেক গ্রহণ করতে পারে না। 'ঐশ্বরিক প্রেরণা' বা প্রত্যাদেশ (**Divine Inspiration/ Revelation**)-লব্ধ কথায় কখনো এরূপ অর্থগত বৈপরীত্য ও ভুল থাকতে পারে না। ঐশী কথা ভুলের শত যোজন দূরে থাকবে।

বাইবেল ভাষ্যকার হর্ন তার বাইবেলের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন যে, বাইবেলের লেখকগণ বা বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকের রচয়িতাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রকৃতি, অভ্যাস ও জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে লিখার

অনুমতি ছিল। ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানকে তারা প্রচলিত জ্ঞানের ন্যায় ব্যবহার করতেন। একথা কল্পনা করা যায় না যে, তারা যে সকল বিষয় লিখেছেন বা যে সকল বিধিবিধান প্রদান করেছেন সেগুলি সবই তারা ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ বা প্রেরণার মাধ্যমে লাভ করেছিলেন।

হেনরী ও স্কট-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ লিখেছেন যে, এ কথা মোটেও জরুরী নয় যে, একজন ভাববাদী (তার পুস্তকে) যা কিছু লিখেছেন তা সবই ঐশী প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ হবে বা বাইবেলের (**canonical text**) অংশ হবে।

'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা'-য় উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেক খৃস্টান পণ্ডিতই মনে করেন, বাইবেলের পুস্তকাবলির সকল কথা এবং সকল বর্ণনা ইলহাম বা ঐশ্বরিক প্রেরণা (**Inspiration**)-লব্ধ নয়। যারা বলেন যে, বাইবেলের পুস্তকাবলির মধ্যে উল্লিখিত সকল কথাই ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ, তাদের জন্য এ দাবি প্রমাণ করা সহজ হবে না।

আব্রাহাম রীস (**Abraham Rees**) অনেক গবেষক পণ্ডিতের সমন্বয়ে দীর্ঘদিনের গবেষণায় (১৮০২-১৮২০ সালে) ৪৫ খণ্ডে একটি বিশ্বকোষ প্রকাশ করেন, যা রীস এনসাইক্লোপীডিয়া (**New Cyclopaedia; or, Universal Dictionary of Arts and Sciences**) নামে পরিচিত। এ বিশ্বকোষে লেখা হয়েছে:

বাইবেলের এ সকল পুস্তকের রচয়িতাদের কর্মে ও কথায় অনেক ভুলভ্রান্তি ও বৈপরীত্য রয়েছে। প্রাচীন খৃস্টানগণ প্রেরিতদেরকে ভুলভ্রান্তির ঊর্ধ্বে বা ঐশ্বরিক প্রেরণায় ভুলভ্রান্তি থেকে সংরক্ষিত বলে বিশ্বাস করতেন না; কারণ, কখনো কখনো তারা তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছেন।

অনুরূপভাবে মার্ক, লূক ও অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ, যারা যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণের শিষ্য ছিলেন, তাদের রচিত পুস্তকগুলির বিষয়েও অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন যে, এগুলি ঐশ্বরিক প্রেরণা বা ইলহাম দ্বারা লিখিত পুস্তক নয়, এগুলি নিতান্তই মানবিক রচনা। এজন্য প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ ধর্মগুরুগণ মার্ক ও লূকের লেখা ইঞ্জিল ও লূকের লেখা প্রেরিতগণের কার্যবিবরণকে ইলহাম বা ঐশ্বরিক প্রেরণানির্ভর নয় বরং মানবীয় কর্ম বলে গণ্য করেছেন।

(২) প্রসিদ্ধ বাইবেল বিশারদ ও খৃস্টধর্ম গবেষক খৃস্টান পণ্ডিত মহাত্মা নরটন পণ্ডিত একহার্ন থেকে উদ্ধৃত করেছেন: খৃস্টান ধর্মের প্রথম অবস্থায় যীশুর অবস্থাদি বর্ণনার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা ছিল। একথা বলা যায় যে, এই পুস্তিকাটিই ছিল 'মূল সুসমাচার'। যে সকল নতুন খৃস্টান খৃস্টের কথাবার্তা নিজের কানে শুনেন নি এবং তাঁর অবস্থাদি স্বচক্ষে দেখেন নি, সম্ভবত তাদের জন্য এই পুস্তিকাটি রচনা করা হয়েছিল। এই সুসমাচারটি একটি অতি সাধারণ

সংকলনের আকৃতিতে ছিল। এতে যীশুর ঘটনাবলি সুশৃঙ্খল পরম্পরায় লিখিত ছিল না।[23]

এ সুসমাচারটিই ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত সকল 'সুসমাচারের' মূল উৎস। মথি, মার্ক ও লূকের উৎসও ছিল এই সুসমাচারটি। এ তিনটি ছাড়া আরো অনেক সুসমাচার এ সময়ে লেখা হয়। এ সকল সুসমাচার পরবর্তী মানুষদের হাতে পড়ে। তারা এগুলির মধ্যে অপূর্ণতা অনুভব করেন এবং বিভিন্ন সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে অপূর্ণতা পূর্ণ করতে থাকেন। এভাবে সংযোজন ও সংমিশ্রণের ফলে সুসমাচারগুলিতে সত্য এবং মিথ্যা সংমিশ্রিত হয়ে গিয়েছে। অনুরূপভাবে সত্য ঘটনার সাথে দীর্ঘ বানোয়াট কাহিনীগুলি সংমিশ্রিত হয়ে একটি অত্যন্ত কদর্য চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। এই কাহিনীগুলি যতবারই এক মুখ থেকে অন্য মুখে

---

[23] খৃস্টান গবেষকগণ প্রায় সকলেই একমত যে, মথি, মার্ক ও লূকের সুসমাচারের উৎস মূল একটি সংক্ষিপ্ত 'সুসমাচার'। যাতে বিস্তারিত ঘটনাবলি কিছুই ছিল না। শুধু যীশুর বক্তব্যসমূহ তাতে সংকলিত ছিল। হারিয়ে যাওয়া এই মূল সুসমাচারটিকে খৃস্টান গবেষকগণ 'কিউ' **(Q)** বলে অভিহিত করেন। জার্মান **(Quelle)** শব্দ থেকে এই 'কিউ' অক্ষরটি নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ **(source)** বা উৎস। এতে ইস্টার, প্যাশন ইত্যাদি কিছুই ছিল না। যেহেতু এতে শুধু যীশুর বচন সংকলন করা হয়েছিল এজন্য গবেষকগণ একে **(Logia)** বলে অভিহিত করেন। দেখুন: **The New Encyclopedia Britannica, 15th Edition, Vol-10, Jesus Christ, p 146.**

গিয়েছে, ততবারই তাতে নতুন অপছন্দনীয় সংযোজন যুক্ত হয়েছে। আবর্তনের পরিমাণে অসংলগ্ন সংযোজন বেড়েছে।

একারণে দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে অথবা তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে খৃস্টীয় চার্চ সত্য সুসমাচার সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হয়। সে সময়ে প্রচলিত ৭০টিরও অধিক ইঞ্জিল বা সুসমাচারের মধ্য থকে এ চারটি ইঞ্জিল বাছাই করে। খৃস্টীয় চার্চ চায় যে, মানুষেরা অন্য সকল প্রচলিত সুসমাচার বাদ দিয়ে শুধু এই চারটিই মেনে চলে। প্রাচীন প্রচারকদের প্রচারকার্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য যে মূল সুসমাচারটি সংকলন করা হয়েছিল, যদি চার্চ সেই মূল সুসমাচারটি সকল সংযোজন ও বৃদ্ধি থেকে মুক্ত করে প্রকাশ করত তবে পরবর্তী প্রজন্মগুলি তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকতো। কিন্তু এ কাজটি তাদের জন্য কঠিন ছিল। কারণ ইঞ্জিলের পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে এরূপ সংযোজন ছিল খুবই বেশি এবং একটি পাণ্ডুলিপিও এইরূপ বৃদ্ধি ও সংযোজন থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে সংযোজন থেকে মূল বক্তব্য পৃথক করা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে যায়।

প্রাচীন যুগের অধিকাংশ ধর্মবেত্তা পণ্ডিতই প্রচলিত এ সুসমাচারগুলির অনেক অংশ সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু তারা তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। সে যুগে প্রেস বা মুদ্রণ-যন্ত্র ছিল না। একটি পাণ্ডুলিপি একজন মানুষের মালিকানাধীন। প্রত্যেক মালিক তার পাণ্ডুলিপিটির মধ্যে তার নিজের পক্ষ থেকে ইচ্ছামত

কিছু বক্তব্য বা গল্পকাহিনী সংযোজন করতেন বা পুস্তকের মূল পাঠের নীচে বা পার্শ্বে লিখে রাখতেন। এরপর যখন এ পাণ্ডুলিপি থেকে অনেক কপি করা হতো, তখন এ কপিগুলি শুধু মূল লেখকের কথাই কপি করছে, না সংযোজিত বাক্যগুলিও কপি করছে তা খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা হতো না। অনেক ধর্মগুরু পণ্ডিত কঠিনভাবে অভিযোগ করেছেন যে, তাদের লেখা বইগুলি কিছুদিনের মধ্যেই লিপিকার ও পাণ্ডুলিপির মালিকেরা বিকৃত করে ফেলেছে। তারা অভিযোগ করতেন যে, শয়তানের শিষ্যরা এগুলির মধ্যে অপবিত্র কথা সংযোজন করেছে, কিছু বিষয় বের করে দিয়েছে এবং তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় সংযোজন করে। এভাবে পবিত্র পুস্তকগুলির মূল রূপও সংরক্ষিত থাকে নি। ফলে এগুলি "ঐশ্বরিক", "ঐশী" বা ঐশ্বরিক প্রেরণাভিত্তিক গ্রন্থ বলে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা হারায়।

তৎকালীন মানুষদের মধ্যে এরূপ সংযোজনের অভ্যাসের বড় প্রমাণ যে, সে যুগের খৃস্টান লেখকগণের রীতি ছিল, তাদের লিখনির মধ্যে কেউ যেন কোনো বিকৃতি না করে সে বিষয়ে তারা কঠিন প্রতিজ্ঞা ও অভিশাপের ঘোষণা দিতেন।

যীশুর ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ই ঘটেছে। এ বিকৃতি ও সংযোজন এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, রোমান পণ্ডিত সিলসূস

অভিযোগ করেন, তারা তিনবার বা চারবার বা তার বেশি বার তাদের সুসমাচারগুলিকে পরিবর্তন করেছে।

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তৎকালীন মানুষদের গবেষণা ও চুলচেরা বিশ্লেষণের কোনো আগ্রহ ও মানসিকতা ছিল না। খৃস্টীয় ইতিহাসের শুরু থেকেই মানুষেরা তাদের কাছে সংরক্ষিত ওয়াজ-উপদেশের বাক্যাবলি এবং যীশুর বিভিন্ন ঘটনাবলি নিজেদের জ্ঞানানুসারে পরিবর্তন পরিবর্ধন করতেন। প্রথম প্রজন্মের খৃস্টানগণই এ অভ্যাস চালু করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মেও তা অব্যাহত থাকে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই অভ্যাস অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। ফলে খৃস্টধর্মের বিরোধীরাও বিষয়টি অবগত ছিলেন। দ্বিতীয় শতকের শেষে ক্লীমেন্স (**Clement of Alexandira**) উল্লেখ করেছেন যে, কিছু মানুষের কর্মই ছিল সুসমাচারগুলি বিকৃত করা।

একহার্নের বক্তব্যের উপর মন্তব্য করে নর্টন বলেন: কেউ যেন মনে না করে যে, এ মতটি একহার্নের একার মত। অনেক সমসাময়িক জার্মান গবেষকই একহার্নের সাথে একমত। এ সাতটি স্থান সংযোজিত ও ঐশ্বরিক প্রেরণা-লব্ধ নয় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যীশুর অলৌকিক চিহ্নসমূহ উল্লেখ করার ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা সংযোজন করা হয়েছে। তিনি আরো

বলেন যে, সত্যকে মিথ্যা থেকে বাছাই করা বর্তমান যুগে খুবই কঠিন।

প্রিয় পাঠক, যে পুস্তকের মধ্যে সত্যের সাথে মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে তাকে কি 'ঐশ্বরিক' বা ইলহাম-প্রাপ্ত পুস্তক (**Divine Scripture**) বলা যায়? ইয়াহূদী-খৃস্টান কারো কি এ অধিকার আছে যে, বাইবেলের সকল পুস্তককে ঐশ্বরিক, ইলহাম-প্রাপ্ত বা আসমানী কিতাব বলে দাবি করবেন? অথবা এ সকল পুস্তকের সকল তথ্য ও বর্ণনাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বলে দাবি করবেন?[24]

---

[24] খৃস্টান পন্ডিতগণ অনেক সময় সুসমচারগুলির বিশুদ্ধতার প্রমাণ হিসেবে বলেন যে, ১০৪ খৃস্টাব্দে মৃত রোমের বিশপ ক্লীমেন্ট (**Clement**) ও ১০৭ খৃস্টাব্দে নিহত এন্টিয়কের দ্বিতীয় বিশপ ইগনাটিয়াস (**Ignatius**)-এর চিঠিপত্রের মধ্যে দু-একটি বাক্য রয়েছে, যে বাক্যগুলি এ সকল সুসমাচারের মধ্যে বিদ্যমান। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সকল সুসমাচার তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বড় উদ্ভট প্রমাণ! তারা কখনোই এ সকল সুসমাচারের নাম উল্লেখ করেন নি, এগুলি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাও বলেন নি। সর্বপ্রথম এ সকল সুসমাচারের "নাম" শুনা যায় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে। আরিনূস (১৩০-২০০খৃ)-এর লিখনিতে সর্বপ্রথম প্রথম তিন সুসমাচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এ "উল্লেখ" বর্তমানে বিদ্যমান সুসমাচারের বিশুদ্ধতার প্রমাণ নয়। তার এবং পরবর্তীদের কথা থেকে বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় শতকের শেষে এ নামে কয়েকটি পুস্তক প্রচারিত ছিল। এমন একজন ব্যক্তির অস্তিত্বও পাওয়া যায় না যিনি বলেছেন যে, মথি, মার্ক, লূক, যোহন, পিতর, যাকোব বা অমুক... এ সুসমাচারটি বা পত্রটি লিখেছেন, অমুক ব্যক্তি তার নিকট থেকে পূর্ণ সুসমাচারটি বা পত্রটি শুনেছিলেন

বা পড়ে নিয়েছিলেন, তাঁর নিকট থেকে অমুক ব্যক্তি তা পড়েছিলেন, শুনেছিলেন বা অনুলিপি তৈরি করেছিলেন... তার নিকট থেকে আমি তা শুনেছি বা অনুলিপি তৈরি করেছি। প্রায় ২০০ বৎসর পর্যন্ত এরূপ কোনো সূত্র পরম্পরা নতুন নিয়মের কোনো একটি পুস্তক বা পত্রেরও নেই। প্রায় দুই শতাব্দী পরে এসে বলা হচ্ছে যে, এই সুসমাচারটি মথির লেখা, এই সুসমাচারটি মার্কের লেখা.... ইত্যাদি। তিনি আদৌ লিখেছেন কিনা, লিখলে কতটুকু লিখেছিলেন তা কিছুই জানা যাচ্ছে না। বড় অবাক লাগে যে, প্রথম যুগের খৃস্টানগণ সবচেয়ে অবহেলা করেছেন তাদের ধর্মগ্রন্থের প্রতি। প্রথম দুই শতাব্দীতে প্রথম দুই তিন প্রজন্মের খৃস্টানগণ অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে বিভিন্ন দেশে যীশুর বাণী ও বিশ্বাস প্রচার করেছেন, কিন্তু কেউই যীশুর শিক্ষা বা সুসমাচারের কোনো লিখিত রূপ সংরক্ষণ করেন নি বা সাথে রাখেন নি। সবাই যা শুনেছেন বা বুঝেছেন তাই নিজের মনমত প্রচার করেছেন। প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই যিরুশালেম, রোম, আলেকজেন্দ্রিয়া, এন্টিয়ক ইত্যাদি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে খৃস্টান চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিশপ নিযুক্ত হয়েছে। স্বভাবতই প্রত্যেক চার্চে অন্তত কয়েক কপি 'সুসমাচার' থাকার কথা ছিল, প্রত্যেক খৃস্টানের নিকট না হলেও হাজার হাজার খৃস্টানের মধ্যে অনেকের কাছেই ধর্মগ্রন্থ থাকার কথা ছিল। কিন্তু প্রকৃত বিষয় ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সকল বিশপের অনেকের অনেক চিঠি বা বই এখনো সংরক্ষিত আছে। তাতে অনেক উপদেশ রয়েছে। কিন্তু তাতে এ সকল সুসমাচারের কোনো উল্লেখ নেই। ২০০ বৎসর পর্যন্ত কোনো চার্চে কোনো সুসমাচার সংরক্ষিত রাখা বা পঠিত হওয়া তো দূরের কথা এগুলির কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না। এ সময়ের মধ্যে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, অনেক কথা লিখেছেন, সবই ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছিল। কেউই তাকে ঐশ্বরিক প্রেরণা নির্ভর বলে মনে করেন নি। নইলে প্রথম শতকের শেষভাগে

১. ২. ৫. পবিত্র বাইবেল বিষয়ে মুসলিম বিশ্বাস

ক. মূল তাওরাত ও ইঞ্জিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বেই হারিয়ে গিয়েছে।

আমরা মুসলিমগণ বিশ্বাস করি যে, মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ মূল তাওরাত এবং ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ মূল ইঞ্জিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের পূর্বেই হারিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের নামে প্রচলিত বই দুইটি মূলত কোনো আল্লাহপ্রদত্ত গ্রন্থ নয়। বরং এই বই দুইটি হচ্ছে জীবনী ও ইতিহাসমূলক দুইটি সংকলন, যাতে সত্য ও মিথ্য সকল প্রকার কথা ও কাহিনী সংকলন করা হয়েছে।

আমরা কখনোই বলি না যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে তাওরাত ও ইঞ্জিল সঠিকরূপে বিদ্যমান ছিল এবং তারপরে তা বিকৃত করা হয়েছে। আমরা

মথি, মার্ক, লূক বা যোহন তার সুসমাচার লিখে সকল বিশপের নিকট পাঠিয়ে দিতে পারতেন এই বলে যে, ইশ্বরের প্রেরণায় আমি এই সুসামাচর লিখলাম। একে মান্য করতে হবে।... কখনোই তারা তা করেন নি। ৩০০ বৎসর পরে এ সব অগণিত পুস্তকের মধ্য থেকে তৎকালীণ ধর্মগুরুগণ নিজেদের মর্জি মাফিক কিছু পুস্তক পছন্দ করে তাকে বিশুদ্ধ বা ক্যাননিক্যাল বলে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

কখনোই তা বলি না। কোনো একজন মুসলিমও এরূপ কথা বলেন না বা বিশ্বাস করেন না।

খ. পৌল ভাক্ত বা ভন্ড ভাববাদী, তার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়

পৌলের বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস যে, খৃস্টান ধর্মের প্রথম প্রজন্মে খৃস্টধর্মকে বিকৃত ও নষ্ট করতে যে সকল মিথ্যাবাদী ভাক্ত ভাববাদীর আবির্ভাব ঘটেছিল, পৌল ছিলেন তাদের অন্যতম। কাজেই নতুন নিয়মে সংকলিত পৌলের পত্রাবলি ও বক্তব্যসমূহ যদি প্রকৃতপক্ষে তার বলে প্রমাণিত হয় তাহলেও আমাদের নিকট সেগুলির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

গ. প্রেরিতগণ সৎ ও ধার্মিক ছিলেন, ভাববাদী ছিলেন না

যীশুখৃস্টের প্রেরিত শিষ্যগণের সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস হলো যে, তারা যীশুর ঊর্ধ্বারোহণের পরে সততা ও ধার্মিকতার মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। তবে আমরা তাদেরকে ভাববাদী বা নবী বলে বিশ্বাস করি না। আমাদের দৃষ্টিতে তাদের বক্তব্য ও মতামত অন্যান্য সাধারণ সৎ ও ধার্মিক ধর্মবিদ পণ্ডিতের মতামতের মতই, ভুলের ঊর্ধ্বে নয়।

যীশু ও তার শিষ্যদের যুগ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত নতুন নিয়মের কোনো পুস্তক বা পত্রের কোনো অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা পাওয়া যায় না। মূল ইঞ্জিলও হারিয়ে গিয়েছে। একারণে নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান যীশুশিষ্য মথি ও যোহনের

সুসমাচারদ্বয় এবং অন্যান্য প্রেরিতের পত্রগুলির বক্তব্য আসলেই তাদের কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত জানার কোনো উপায় নেই। সর্বোপরি প্রচলিত নতুন নিয়মের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত যে, প্রেরিতগণ, যীশুর শিষ্যগণ বা প্রথম যুগের খৃস্টানগণ যীশুর কথার মর্মও সঠিকভাবে বুঝতে পারতেন না। অপরদিকে মার্ক ও লূক যীশুর শিষ্য ছিলেন না। তারা ইলহাম বা ঐশ্বরিক প্রেরণাপ্রাপ্ত ছিলেন বলে কোনোভাবেই প্রমাণিত নয়। উপরন্তু তারা জীবনে একটিবারও যীশুকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেন নি।

ঘ. মুসলিম বিশ্বাসে তাওরাত ও ইঞ্জিল

আমাদের বিশ্বাস অনুসারে মূসা আলাইহিস সালাম-কে প্রত্যাদেশ বা ওহীর (**Revelation**) মাধ্যমে যা প্রদান করা হয়েছে তাই তাওরাত। আর ঈসা আলাইহিস সালাম প্রত্যাদেশের মাধ্যমে যা প্রদান করা হয়েছে তাই হলো ইঞ্জিল। এর মধ্যে যা ছিল সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী বা প্রত্যাদেশ। এগুলির মধ্যে সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্ত বা সম্পাদনের মাধ্যমে সামান্যতম পরিবর্তন বা বিকৃতিও বৈধ নয়।

সূলা বাকারা-৮৭, সূরা হূদ-১১০, সূরা মুমিনূন-৪৯, সূরা ফুরকান-৩৫, সূরা কাসাস-৪৩, সূরা সাজদা-২৩, সূরা ফুসসিলাত-৪৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন: “এবং আমি মূসাকে গ্রন্থ প্রদান করেছি।” সূরা মায়িদার-৪৬ ও সূরা হাদীদ-২৭ আয়াতে ঈসা আ. (যীশু) সম্পর্কে

আল্লাহ বলেছেন: “এবং আমি তাকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি”। সূরা মরিয়ম-৩০ আয়াতে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জবানীতে বলা হয়েছে: “আমাকে তিনি গ্রন্থ প্রদান করেছেন।” সূরা বাকারা-২৩৬ এবং সূরা আল-এমরান-৮৪ আয়াতে বলা হয়েছে: “এবং মূসা ও ঈসাকে যা প্রদান করা হয়েছে।”, অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিল।

কাজেই “পবিত্র বাইবেল” নামে প্রচারিত পুস্তক সংকলনের মধ্যে নতুন ও পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত এ সকল ঐতিহাসিক পুস্তকাদি এবং পত্রাবলি কুরআনে উল্লিখিত তাওরাত ও ইঞ্জিল নয়। কাজেই এগুলি বিশ্বাস বা মান্য করা জরুরী নয়। এ সকল পুস্তক, পত্রাবলি এবং নতুন ও পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তকের ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বাস নিম্নরূপ:

এ সকল পুস্তকের যে সকল কথা ও কাহিনীকে কুরআন সত্য বলেছে সেগুলি সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য। আমরা কোনো দ্বিধা ও আপত্তি ছাড়া সেগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করি। যেগুলিকে কুরআন মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছে সেগুলি নিঃসন্দেহে মিথ্যা ও প্রত্যাখ্যাত। আমরা কোনো দ্বিধা ছাড়াই সেগুলিকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করি। আর যেগুলি বিষয়ে কুরআন সত্য ও মিথ্যা কোনো প্রকারের কিছু না বলে চুপ থেকেছে, সেগুলির বিষয়ে আমরাও চুপ থাকি। আমরা সেগুলিকে সত্য বলেও গ্রহণ করি না, আবার সরাসরি মিথ্যাও বলি না।

মহান আল্লাহ সূরা মায়েদার ৪৮ আয়াতে বলেন: "এবং আপনার উপর সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, তার পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থক ও সংরক্ষক-নিয়ন্ত্রক রূপে।"

আল-কুরআনুল কারীমই পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের নিয়ন্ত্রক, সংরক্ষক বা বিশুদ্ধতা ও অশুদ্ধতার মাপকাঠি। কুরআন পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলির মধ্যে যা কিছু সত্য রয়েছে তা প্রকাশ ও সমর্থন করে এবং এগুলির মধ্যে বিদ্যমান মিথ্যা প্রকাশ করে দেয় এবং তার প্রতিবাদ করে।

যে সকল মুসলিম আলিম প্রচলিত তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এগুলির মধ্যে বিদ্যমান মিথ্যা ও বিকৃতি প্রকাশ করেছেন, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মূসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিরুদ্ধে কলম ধরেন নি বা সেগুলিকে উদ্দেশ্য করে গ্রন্থ রচনা করেন নি। বরং তারা "পবিত্র বাইবেলের" পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান এ সকল ঐতিহাসিক ও জীবনীমূলক পুস্তকগুলির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, যেগুলি কয়েক শতাব্দী ধরে লেখা ও সংকলন করা হয়েছে এবং এরপর দাবি করা হয়েছে যে, এগুলি ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে বা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত পুস্তক। এগুলির বিষয়েই আল্লাহ সূরা বাকারার ৭৮৯ আয়াতে/ শ্লোকে বলেছেন: "দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং এরপর বলে: এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে; যেন তারা এগুলির দ্বারা সামান্য বিনিময়মূল্য লাভ করতে

পারে। কাজেই যা তাদের হাতগুলি লিখেছে তার জন্য তাদের দুর্ভোগ এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্যও তাদের দুর্ভোগ।”

মুসলিম উম্মাহর সকলেই একমত যে, আল্লাহর নিকট থেকে ওহীর মাধ্যমে গ্রহণ করে মূসা আলাইহিস সালাম যা মুখে উচ্চারণ করেছিলেন তাই প্রকৃত তাওরাহ। আর আল্লাহর নিকট থেকে ওহীর মাধ্যমে গ্রহণ করে ঈসা আলাইহিস সালাম যা মুখে উচ্চারণ করেছিলেন তাই প্রকৃত ইঞ্জিল। আর “পবিত্র বাইবেল”-এর পুরাতন ও নতুন নিয়ম বা “তাওরাত শরীফ”, “ইঞ্জিল শরীফ” বা “যাবূর শরীফ” নামে প্রচলিত পুস্তকগুলি কখনোই সেই তাওরাত, ইঞ্জিল বা যাবূর নয়।

ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের নিকট সংরক্ষিত তাওরাতের মূল তিনটি সংস্করণ রয়েছে বা তিন প্রকারের “তাওরাত” রয়েছে। আর “ইঞ্জিল” বা সুসমাচার রয়েছে চারটি। এগুলির মধ্যে রয়েছে বৈপরীত্য ও সংঘাত। অথচ মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর একটিই তাওরাত নাযিল হয়েছিল এবং ঈসা আলাইহিস সালাম একটিই ইঞ্জিল পেয়েছিলেন।

কুরআনে উল্লিখিত মূসা আলাইহিস সালাম ও ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ মূল তাওরাত ও ইঞ্জিল যদি কেউ অস্বীকার করেন তবে তার ঈমান নষ্ট হবে। আর “পবিত্র বাইবেল” নামে বা তাওরাত বা ইঞ্জিল নামে বর্তমানে প্রচলিত, আল্লাহর বাণী

নাম দিয়ে বা নবী-রাসূলগণের লেখা বলে প্রচারিত জাল ও মিথ্যা এ সকল মিথ্যা গল্প, কাহিনী ও বিবরণ অস্বীকার করলে ঈমান নষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, বরং তাতে ঈমানী দায়িত্ব পালিত হবে। কারণ মহান আল্লাহর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং নবী-রাসূলগণের পবিত্রতা ও নিষ্পাপত্বের সাথে সাংঘর্ষিক এ সকল মিথ্যা ও জাল গল্প, কাহিনী ও বিবরণগুলির মিথ্যাচার ও জালিয়াতি প্রকাশ করা মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

তাওরাতের প্রচলিত তিনটি সংস্করণ বা ভার্সনের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক বৈপরীত্য। এগুলিতে রয়েছে অনেক ভুল ও পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। এতে মূসা আলাইহিস সালাম-এর মৃত্যু এবং মাওআব অঞ্চলে তার কবর দেওয়ার বিবরণ। আমরা নিশ্চিত যে, এগুলি কখনোই মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ বিশুদ্ধ তাওরাত নয়।

প্রচলিত চারটি ইঞ্জিল বা সুসমাচারের মধ্যেও রয়েছে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। এগুলির মধ্যে অনেক ভুল-ভ্রান্তি, বৈপরীত্য ও পরস্পর সাংঘর্ষিক বক্তব্য রয়েছে। এতে যীশুর ক্রুশারোহণ (খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে), ক্রুশে মৃত্যু, তার কবরস্থ করণ ইত্যাদি বিবরণ রয়েছে। আমরা সুনিশ্চিত যে, এগুলি কখনোই ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ ইঞ্জিল নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাইবেলের বৈপরীত্য, ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতি

পবিত্র বাইবেল নামে প্রচলিত এ গ্রন্থ-সংকলনের পুস্তকগুলি অগণিত বৈপরীত্য, ভুলভ্রান্তি[25] ও বিকৃতিতে ভরা। এ পরিচ্ছেদে আমরা তার সামান্য কিছু নমুনা আলোচনা করব।

১. ৩. ১. বৈপরীত্য ও পরস্পর বিরোধিতা

১- বিন্যামীনের সন্তানদের নাম ও সংখ্যায় বৈপরীত্য:

---

[25] বৈপরীত্য বলতে লেখক বুঝাচ্ছেন পরস্পর-বিরোধিতা। বাইবেলের এক গ্রন্থে বর্ণিত বিধান বা তথ্যের সাথে অন্য কোনো গ্রন্থে বর্ণিত বিধান বা তথ্যের মধ্যে অনেক বৈপরীত্য ও পরস্পরবিরোধিতা পাওয়া যায়। এমনকি একই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে বা একই গ্রন্থের একই অধ্যায়ের মধ্যে লিখিত তথ্যও অনেক সময় পরস্পর বিরোধী। এছাড়া বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, অনুবাদ ইত্যাদির মধ্যেও বৈপরীত্য ও পরস্পর বিরোধিতা দেখতে পাওয়া যায়। মূল গ্রন্থে গ্রন্থকার উদাহরণ হিসাবে ১২৫টি বৈপরীত্য উল্লেখ করেছেন। প্রদত্ত তথ্যের বা বিধানের শুদ্ধতা বা বিশুদ্ধতা এখানে বিচার করা হয় নি। শুধু বাইবেলের একাধিক স্থানে, সংস্করণে বা অনুবাদে প্রদত্ত তথ্যের তুলনা করে পরস্পর-বিরোধিতা ও বৈপরীত্য প্রমাণ করা হয়েছে।

অপরদিকে ভুলভ্রান্তি বলতে লেখক বুঝাচ্ছেন যে বাইবেলে প্রদত্ত অগণিত তথ্য ইতিহাস, বাস্তবতা বা নিরীক্ষার মাধ্যমে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। মূল গন্থে গ্রন্থকার বাইবেলের মধ্যে প্রদত্ত এইরূপ ভুলভ্রান্তির ১১০টি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন।

১ বংশাবলির (বংশাবলি ১ম খণ্ড) ৭ম অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে বলা হয়েছে: "বিন্যামীনের সন্তান- বেলা, বেখর ও যিদীয়েল, তিন জন।"

পক্ষান্তরে ১ বংশাবলিরই ৮ম অধ্যায়ের ১ শ্লোকে বলা হয়েছে: "বিন্যামীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেলা, দ্বিতীয় অস্বেল, তৃতীয় অহর্হ, চতুর্থ নোহা ও পঞ্চম রাফা।"

কিন্তু আদিপুস্তক ৪৬ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে বলা হয়েছে: "বিন্যামীনের পুত্র বেলা, বেখর, অস্বেল, গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুপ্পীম, হুপ্পীম ও অর্দ।"

তাহলে বিন্যামিনের সন্তান সংখ্যা প্রথম বক্তব্যে তিন জন এবং দ্বিতীয় বক্তব্যে ৫ জন। তাদের নামের বর্ণনাও পরস্পর বিরোধী, শুধু বেলার নামটি উভয় শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, বাকিদের নাম সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর তৃতীয় শ্লোকে বিন্যামীনের সন্তান সংখ্যা ১০ জন। নামগুলিও আলাদা। তৃতীয় শ্লোকের নামগুলির সাথে প্রথম শ্লোকের সাথে দুজনের নামের এবং দ্বিতীয় শ্লোকের দুজনের নামের মিল আছে। আর তিনটি শ্লোকের মিল আছে একমাত্র "বেলা" নামটি উল্লেখের ক্ষেত্রে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকদ্বয় একই পুস্তকের। উভয় পুস্তকের লেখক ইয্রা ভাববাদী। এভাবে একই লেখকের লেখা একই পুস্তকের দুটি বক্তব্য পরস্পর বিরোধী বলে প্রমাণিত হলো। আবার তাওরাতের

আদিপুস্তকের বক্তব্যের সাথে ইয্রার দুটি বক্তব্যের বৈপরীত্য প্রমাণিত হলো।

এ সুস্পষ্ট পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতগণকে হতবাক করে দিয়েছে। তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ইয্রাই ভুল করেছেন। এ ভুলের কারণ হিসেবে তার উল্লেখ করেন যে, ইয্রা পুত্র ও পৌত্রের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন নি এবং যে বংশতালিকা দেখে তিনি বংশাবলীর এই তালিকা লিখেছিলেন সেই মূল বংশতালিকাটি ছিল অসম্পূর্ণ।

২- ইস্রায়েল ও যিহূদা রাজ্যের সৈনিকদের সংখ্যার বৈপরীত্য

শমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তকের ২৪ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকটি নিম্নরূপ: "পরে যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা রাজার কাছে দিলেন; ইস্রায়েলে খড়্গ-ধারী আট লক্ষ বলবান লোক ছিল; আর যিহূদার পাঁচ লক্ষ লোক ছিল।"[26]

---

[26] দায়ূদের নির্দেশে তার সেনাপতি যোয়াব লোকসংখ্যা গণনা করেন। দায়ূদ ও শলোমনের পরে প্যালেস্টাইনে ইহূদীদের রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর প্যালেস্টাইনের রাজ্যকে শামেরা বা ইস্রাইল রাজ্য বলা হতো। এর রাজধানী ছিল নাবলুস। আর দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের রাজ্যকে 'যিহূদা রাজ্য' বলা হতো। এর রাজধানী ছিল যিরুশালেম। এখানে উভয় অংশের লোকগণনার কথা বলা হয়েছে।

অপর দিকে বংশাবলি প্রথম খণ্ডের ২১ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক নিম্নরূপ: "আর যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা দায়ূদের কাছে দিলেন। সমস্ত ইস্রায়েলের এগার লক্ষ খড়্গধারী লোক, ও যিহূদার চারি লক্ষ সত্তর সহস্র খড়্গধারী লোক ছিল।"

তাহলে প্রথম বর্ণনামতে ইস্রায়েলের যোদ্ধাসংখ্যা ৮,০০,০০০ এবং যিহূদার ৫,০০,০০০। আর দ্বিতীয় বর্ণনামতে তাদের সংখ্যা: ১১,০০,০০০ ও ৪,৭০,০০০। উভয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্যের পরিমাণ দেখুন! ইস্রায়েলের জনসংখ্যা বর্ণনায় ৩ লক্ষের কমবেশি এবং যিহূদার জনসংখ্যার বর্ণনায় ত্রিশ হাজারের কমবেশি।

বাইবেল ভাষ্যকার আদম ক্লার্ক তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের মধ্যে কোনটি সঠিক তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। বস্তুত বাইবেলের ইতিহাস বিষয়ক পুস্তকগুলিতে ব্যাপক বিকৃতি ঘটেছে এবং এবিষয়ে সমন্বয়ের চেষ্টা অবান্তর। বিকৃতি মেনে নেওয়াই উত্তম; কারণ তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এবং বাইবেলের বর্ণনাকারী ও লিপিকারগণ ইলহাম-প্রাপ্ত বা ঐশী প্রেরণা প্রাপ্ত ছিলেন না।

৩. গাদ দর্শকের সংবাদের বৈপরীত্য

শমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তকের ২৪ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "পরে গাদ দায়ূদের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন, কহিলেন, আপনার দেশে সাত বৎসর ব্যপিয়া কি দুর্ভিক্ষ হইবে? না

আপনার বিপক্ষগণ যাবৎ আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করে, তাবৎ আপনি তিন মাস পর্যন্ত তাহাদের অগ্রে অগ্রে পলায়ন করিবেন?..."

অপর দিকে বংশাবলি প্রথম খণ্ডের ২১ অধ্যায়ের ১২ শ্লোক নিম্নরূপ: পরে গাদ দায়ূদের নিকটে আসি তাঁহাকে বলিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যেটা ইচ্ছা, গ্রহণ কর: হয় তিন বৎসর দুর্ভিক্ষ, নয় তিন মাস পর্যন্ত শত্রুদের খড়্গ তোমাকে পাইয়া বসিলে তোমার বিপক্ষ লোকদের সম্মুখে সংহার...।"

উভয় বক্তব্যের মধ্যে দুর্ভিক্ষের সময় বর্ণনায় বৈপরীত্য রয়েছে। প্রথম শ্লোকে ৭ বৎসর ও দ্বিতীয় শ্লোকে ৩ বৎসর! বাইবেলের ব্যাখ্যাকারগণ স্বীকার করেছেন যে, প্রথম শ্লোকের তথ্য ভুল। আদম ক্লার্ক বলেন: নিঃসন্দেহে বংশাবলির বক্তব্যই সঠিক, গ্রীক বাইবেলের ভাষ্যের সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪- অহসিয় রাজার রাজ্যগ্রহণকালীন বয়স বর্ণনায় বৈপরীত্য:

রাজাবলি দ্বিতীয় খণ্ডের ৮ম অধ্যায়ের ২৬ শ্লোক নিম্নরূপ: "অহসিয় বাইশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া যিরুশালেমে এক বৎসর রাজত্ব করিলেন।"

আর বংশাবলি দ্বিতীয় খণ্ডের ২২ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক নিম্নরূপ: "অহসিয় বেয়াল্লিশ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং যিরূশালেমে এক বৎসরকাল রাজত্ব করেন।"

উভয় বর্ণনার মধ্যে মাত্র ২০ বৎসরের বৈপরীত্য! দ্বিতীয় তথ্যটি সন্দেহাতীত-ভাবে ভুল; কারণ, বংশাবলি দ্বিতীয় খণ্ডের ২১ অধ্যায়ের ২০ শ্লোক এবং ২২ অধ্যায়ের ১-২ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অহসিয়ের পিতা যিহোরাম ৪০ বৎসর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন এবং তার মৃত্যুর পরপরই অহসিয় রাজ-সিংহাসনে বসেন। এখন যদি দ্বিতীয় তথ্যটি যদি নির্ভুল হয় তাহলে প্রমাণিত হয় যে, অহসিয় তার পিতার চেয়েও দুই বছরের বড় ছিলেন!! আর এ যে অসম্ভব তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য আদম ক্লার্ক, হর্ন, হেনরি ও স্কট তাদের ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে স্বীকার করেছেন যে, বাইবেল লেখকের ভুলের কারণে এ বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে।

৫- যিহোয়াখীনের রাজত্ব গ্রহণকালীন বয়সের বর্ণনায় বৈপরীত্য:

২ রাজাবলীর ২৪ অধ্যায়ের ৮-৯ শ্লোক নিম্নরূপ: "(৮) যিহোয়াখীন আঠার বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, এবং যিরূশালেমে তিন মাস রাজত্ব করেন... (৯) সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই করিতেন।"

২ বংশাবলির ৩৬ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোক নিম্নরূপ: "যিহোয়াখীন আট বৎসর বয়সে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং যিরূশালেমে তিন মাস দশ দিন রাজত্ব করেন; সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ তাহাই তিনি করিতেন।"

উভয় তথ্যের মধ্যে দশ বৎসরের বৈপরীত্য। ইয়াহূদী-খৃস্টান ভাষ্যকারগণ স্বীকার করেছেন যে, দ্বিতীয় শ্লোকটি নিঃসন্দেহে ভুল। কারণ বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যিহোয়াখীন মাত্র তিন মাস রাজত্ব করেন। এরপর ব্যাবিলনে বন্দিরূপে নীত হন। বন্দিত্বের সময়ে তার সাথে তার স্ত্রীগণও ছিলেন। স্বভাবতই ৮ বা ৯ বৎসরের কোনো মানুষের অনেকগুলি স্ত্রী থাকে না। আর এরূপ ৮ বা ৯ বৎসরের একজন শিশুর ক্ষেত্রে একথাও বলা হয় না যে, সে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যা মন্দ ও পাপ তা করেছিল। এজন্য বাইবেল বিশেষজ্ঞ আদম ক্লার্ক বলেন, এ পুস্তকের এ স্থানটি বিকৃত।

৬- দায়ূদ আলাইহিস সালামের যোদ্ধা কর্তৃক নিহতগণের সংখ্যায় বৈপরীত্য:

২ শমূয়েল ২৩ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে দায়ূদের বীর যোদ্ধাগণের বর্ণনায় বলা হয়েছে: "তিনি আটশতের বিরুদ্ধে তার বর্শা উঠান, যাদেরকে তিনি এককালে বধ করিয়াছিলেন **(he lift up his spear against eight hundred, whom he slew at one time)**[27]

কিন্তু ১ বংশাবলি ১১ অধ্যায়ের ১১ পঙক্তি নিম্নরূপ: "তিনি তিনশতের বিরুদ্ধে তার বর্শা উঠান, যাদেরকে তিনি এককালে বধ

[27] কেরির বাংলা বাইবেলে এ পঙক্তির অনুবাদ নিম্নরূপ: তিনি এককালে নিহত আটশত লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন।

করিয়াছিলেন **(he lifted up his spear against three hundred slain by him at one time)**।[28]

উভয় বক্তব্যের মধ্যে তিন শতের বৈপরীত্য! আদম ক্লার্ক ও ড. কেনিকট **(Benjamin Kennicott)** উল্লেখ করেছেন যে, এ শ্লোকটিতে তিনটি মারাত্মক বিকৃতি রয়েছে।

৭- নূহের আলাইহিস সালাম নৌকায় উঠানো প্রাণীদের বর্ণনায় বৈপরীত্য:

আদিপুস্তকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১৯-২০ পঙ্ক্তি নিম্নরূপ: (১৯) আর মাংসবিশিষ্ট সমস্ত জীব-জন্তুর স্ত্রীপুরুষ জোড়া জোড়া লইয়া তাহাদের প্রাণরক্ষার্থে আপনার সহিত সেই জাহাজে প্রবেশ করাইবে; (২০) সর্বজাতীয় পক্ষী ও সর্বজাতীয় পশু ও সর্বজাতীয় ভূচর সরীসৃপ জোড়া জোড়া প্রাণরক্ষার্থে তোমার নিকটে প্রবেশ করিবে।"

এ পুস্তকের ৭ম অধ্যায়ের ৮-৯ পঙক্তি নিম্নরূপ: "(৮) নোহের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে শুচি অশুচি পশুর, এবং পক্ষীর ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবের (৯) স্ত্রীপুরুষ জোড়া জোড়া জাহাজে নোহের নিকট প্রবেশ করিল।"

এ পুস্তকেরই ৭ম অধ্যায়ের ২-৩ পঙক্তি নিম্নরূপ: "তুমি শুচি (পবিত্র) পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত সাত জোড়া এবং

---

28 কেরির বাংলা বাইবেলের অনুবাদ নিম্নরূপ: "তিনি তিন শত লোকের উপর আপন বড়শা চালাইয়া তাহাদিগকে এককালে বধ করিয়াছিলেন।"

অশুচি (অপবিত্র) পশুর স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির এক এক জোড়া এবং আকাশের পক্ষীদিগেরও স্ত্রীপুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত সাত জোড়া সমস্ত ভূমন্ডলে তাহাদের বংশ রক্ষার্থে আপনার সঙ্গে রাখ।”

এগুলি একই পুস্তকের তিনটি বক্তব্য। প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ নূহকে নির্দেশ দেন, সর্বজাতীয় পশু, সর্বজাতীয় পক্ষী ও সর্বজাতীয় ভূচর সরীসৃপ স্ত্রীপুরুষ জোড়া জোড়া সাথে নিতে এবং নূহ এ নির্দেশ এভাবে পালন করেছিলেন।

কিন্তু তৃতীয় বক্তব্য থেকে জানা যায়, তিনি তাকে সকল পবিত্র পশু এবং সকল পাখি সাত জোড়া করে সাথে নিতে নির্দেশ দেন। আর অপবিত্র পশু জোড়া জোড়া করে সাথে নিতে নির্দেশ দেন। প্রথম দুই বক্তব্যে “সাত জোড়ার” কোনোরূপ উল্লেখ নেই; বরং পবিত্র ও অপবিত্র সকল পশু ও পাখী এক জোড়া করে নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। পক্ষান্তরে তৃতীয় বক্তব্যে শুধু অপবিত্র পশু এক জোড়া করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে এখানে উভয় বক্তব্যের মধ্যে বড় রকমের বৈপরীত্য বিদ্যমান।

৮- দায়ূদ আলাইহিস সালাম-এর বন্দীদের সংখ্যা বর্ণনায় বৈপরীত্য

২ শমূয়েলের ৮ অধ্যায়ের ৪ পঙ্ক্তি নিম্নরূপ: “দায়ূদ তাঁহার নিকট হইতে সতের শত অশ্বারোহী ও বিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য হস্তগত করিলেন।”

একই ঘটনার বর্ণনায় ১ বংশাবলির ১৮ অধ্যায়ের ৪ পঙক্তিতে বলা হয়েছে: “দায়ূদ তাহার নিকট হইতে এক সহস্র রথ, সাত সহস্র অশ্বারোহী ও বিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য হস্তগত করিলেন।”

এখানে একই ঘটনার বর্ণনায় উভয় বক্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় শ্লোকে ১,০০০ রথ এবং ৫,৩০০ পদাতিক সৈন্যের কথা বেশি বলা হয়েছে।

৯- দায়ূদ কর্তৃক নিহত অরামীয় সৈন্যদের সংখ্যা বর্ণনায় বৈপরীত্য:

২ শমূয়েল ১০ অধ্যায়ের ১৮ পঙক্তি নিম্নরূপ: “আর দায়ূদ অরামীয়দের সাত শত রথারোহী ও চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য বধ করিলেন।”

পক্ষান্তরে ১ বংশাবলি ১৯ অধ্যায়ের ১৮ পঙক্তি নিম্নরূপ: “আর দায়ূদ অরামীয়দের সাত সহস্র রথারোহী ও চল্লিশ সহস্র পদাতিক সৈন্য বধ করিলেন।”

এখানে রথারোহীদের বর্ণনায় ৬,৩০০ জনের পার্থক্য। অবশিষ্ট ৪০ হাজার নিহত সৈন্য পদাতিক না অশ্বারোহী সে বিষয়েও বৈপরীত্য রয়েছে।

১০- সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর অশ্বশালার সংখ্যা বর্ণনায় বৈপরীত্য:

১ রাজাবলির ৪র্থ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকটি নিম্নরূপ: “শলোমনের রথের নিমিত্ত চল্লিশ সহস্র অশ্বশালা ও বারো সহস্র অশ্বারোহী ছিল। **(And Solomon had forty thousand stalls of horses for his chariots, and twelve thousand horsemen)”**

২ বংশাবলির ৯ম অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকটি নিম্নরূপ: “শলোমনের চারি সহস্র অশ্বশালা[29] ও দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল। **(And Solomon had four thousand stalls for horses and chariots, and twelve thousand horsemen)”**

এখানে উভয় বক্তব্যের মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। প্রথম শ্লোকে দ্বিতীয় শ্লোকের চেয়ে ৩৬,০০০ বেশি অশ্বশালার কথা বলা হয়েছে।

বাইবেল ভাষ্যকার আদম ক্লার্ক বলেন: সংখ্যাটির উল্লেখের ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটেছে বলে স্বীকার করে নেওয়াই আমাদের জন্য উত্তম।

১১- যীশুর বংশাবলি বর্ণনায় বৈপরীত্য:

যদি কেউ মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১-১৭ পঙক্তিতে প্রদত্ত যীশুখৃস্টের বংশতালিকা বা বংশাবলি-পত্রের সাথে লূকলিখিত সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ের ২৩-৩৮ পঙক্তিতে উল্লিখিত যীশু খৃস্টের

---

[29] কেরির অনুবাদে প্রথম শ্লোকে অশ্বশালা ও দ্বিতীয় শ্লোকে ঘর লেখা হয়েছে, যদিও উভয় শ্লোকেই ইংরেজীতে **(stalls of horses)** বলা হয়েছে।

বংশাবলি-পত্রের তুলনা করেন তাহলে উভয়ের মধ্যে নিম্নরূপ ৬টি মারাত্মক বৈপরীত্য দেখতে পাবেন:

1. মথি থেকে জানা যায় যে, মরিয়মের স্বামী যোশেফ-এর পিতার নাম 'যাকোব'। আর লূক থেকে জানা যায় যে, যোশেফ-এর পিতা এলি।

2. মথি থেকে জানা যায় যে, যীশু দায়ূদের পুত্র শলোমনের বংশধর। লূক থেকে জানা যায় যে, যীশু দায়ূদের পুত্র নাথন-এর বংশধর।

3. মথি থেকে জানা যায় যে, দায়ূদ থেকে ব্যবিলনের নির্বাসন পর্যন্ত যীশুর পূর্বপুরুষগণ সকলেই সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। লূক থেকে জানা যায় যে, দায়ূদ ও নাথন বাদে যীশুর পুর্বপুরুষগণের মধ্যে কেউই রাজা ছিলেন না বা কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন না।

4. মথি থেকে জানা যায় যে, শল্টীয়েল-এর পিতার নাম যিকিনিয়। আর লূক থেকে জানা যায় যে, শল্টীয়েলের[30] পিতার নাম

---

[30] যীশুর সুদীর্ঘ বংশতালিকার একটি সাথে আরেকটির কোনো মিল নেই। প্রথমে যোশেফ ও শেষে দায়ূদ এই দুইটি নামে মিল আছে। আর মধ্যস্থানে সরুববাবিল ও শল্টীয়েলের নাম উভয় তালিকাতেই আছে। তবে নামের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। মথির বর্ণনায় শল্টীয়েল যীশুর ১৩তম ঊর্ধ্বপুরুষ। আর লূকের বর্ণনায় শল্টীয়েল যীশুর ২২তম ঊর্ধ্বপুরুষ। ১ বংশাবলি ৩/১৫-১৯ থেকে জানা যায় যে, দায়ূদের বংশধর রাজা যোশিয়ের পুত্র যিহোয়াকীম, তার পুত্র যিকনিয়।

নেরি।

5. মথি থেকে জানা যায় যে, সরুববাবিলের পুত্রের নাম অবীহূদ। আর লূক থেকে জানা যায় যে, সরুববাবিলের পুত্রের নাম রীষা। মজার কথা হলো, ১ বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ে সরুববাবিলের সন্তানগণের নাম লেখা আছে, সেখানে অবীহূদ বা রীষা কোনো নামই লেখা নেই। এজন্য প্রকৃত সত্য কথা হলো মথি ও লূক উভয়ের বর্ণনায় ভুল।

6. মথির বিবরণ অনুযায়ী দায়ূদ থেকে যীশু পর্যন্ত উভয়ের মাঝে ২৬ প্রজন্ম। আর লূকের বর্ণনা অনুযায়ী উভয়ের মাঝে ৪১ প্রজন্ম। দায়ূদ ও যীশুর মধ্যে ১০০০ বৎসরের ব্যবধান। এতে প্রত্যেক প্রজন্মের সময়কাল মথির বিবরণ অনুসারে ৪০ বৎসর এবং লূকের বর্ণনা অনুসারে ২৫ বৎসর।

যিকনিয়ের ৭ পুত্রের মধ্যে একপুত্র শল্টীয়েল এবং অন্য পুত্র পদায়। এই পদায়ের পুত্র সরুববাবিল, তার দুই পুত্র মশুল্লম ও হনানিয়, আর এক কন্যা শালোমীৎ। তাহলে শল্টীয়েল সরুববাবিলের চাচা। মথি থেকে জানা যায় যে, রাজা যিকনিয় ও তার ভাইগণ রাজা যোশিয়ের পুত্র। যিকনিয়-এর পুত্র শল্টীয়েল, তার পুত্র সরুববাবিল, তার পুত্র অবীহূদ। লূক থেকে জানা যায় যে, মল্কির পুত্র নেরি, তার পুত্র শল্টীয়েল, তার পুত্র সরুববাবিল, তার পুত্র রীষা। এখানে জানা গেল যে, শল্টীয়েলের যোশিয় বা যিহোয়াকীমের বংশধর নন। তিনি নেরির পুত্র, তিনি মল্কির পুত্র....।

তৃতীয় শতাব্দীতে সুসমাচার দুটির প্রসিদ্ধি লাভের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সকল যুগের খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণ এ মারাত্মক বৈপরীত্য ও সাংঘর্ষিক বর্ণনার কারণে বিব্রত ও বিমূঢ় হয়েছেন। বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে এর সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন যা সবই ব্যর্থ চেষ্টা। তারা আশা করেছেন, যুগের আবর্তনে এ বৈপরীত্যের সমাধান প্রকাশিত হবে, কিন্তু তাদের আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়েছে। এ দুই বংশতালিকার বৈপরীত্য অতীতের মত একই ভাবে বর্তমান যুগের পণ্ডিতদেরকে হতবাক করছে।

১২- যীশু কর্তৃক আরোগ্যকৃতদের বর্ণনায় বৈপরীত্য:

মথির সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ের ২৯-৩৪ শ্লোকে দুই অন্ধ ব্যক্তির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে: "(২৯) পরে যিরীহো হইতে তাঁহাদের বাহির হইবার সময়ে বিস্তর লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। (৩০) আর দেখ, দুই জন অন্ধ পথের পাশে বসিয়াছিল। .... (৩৪) তখন যীশু করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন, আর তখনই তাহারা দেখিতে পাইল ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।"

মথির সুসমাচারের ৮ অধ্যায়ের ২৮-৩৪ শ্লোকে দুজন ভুত-গ্রস্ত লোকের গল্প বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে: "পরে তিনি পরপারে গাদারীয়দের দেশে গেলে দুই জন ভূতগ্রস্ত লোক কবরস্থান

হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; তাহারা এত বড় দুর্দান্ত ছিল যে, ঐ পথ দিয়া কেহই যাইতে পরিত না।...”

দুটি ঘটনাই মার্ক উল্লেখ করেছেন। প্রথম ঘটনা মার্কের সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ের ৪৬-৫২ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যিরীহো হতে বের হওয়ার পরে যীশু পথে ‘তিময়ের পুত্র বরতিময়’ নামক একজন অন্ধকে দেখতে পান এবং তাকে সুস্থ করেন। অর্থাৎ মার্কের বর্ণনানুসারে যীশু মাত্র একজন অন্ধকে দেখতে পান ও সুস্থ করেন। আর মথির বর্ণনানুসারে তিনি দুজন অন্ধকে দেখেন ও সুস্থ করেন।

দ্বিতীয় ঘটনা মার্কের ৫ অধ্যায়ের ১-২০ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে মাত্র একজন ভূতগ্রস্তের কথা বলা হয়েছে। তাহলে মথির বর্ণনা অনুসারে যীশু দুজন পাগলকে দেখেন ও সুস্থ করেন। আর মার্কের বর্ণনা অনুসারে তিনি মাত্র একজন পাগলকে দেখেন ও সুস্থ করেন।

১৩- প্রেরিতদের প্রতি যীশুর আজ্ঞায় লাঠির উল্লেখে বৈপরীত্য:

যীশু তাঁর ১২ জন শিষ্যকে প্রেরণ করার সময় যে আজ্ঞা প্রদান করেন তা মথি, মার্ক ও লূক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাদের বর্ণনার মধ্যে কিছু কিছু বৈপরীত্য রয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি প্রেরিতদের সাথে যষ্ঠি বা লাঠি রাখার বিষয়। মথির ১০ অধ্যায়ের ৯-১০ পঙক্তিতে প্রেরিতদেরকে সাথে লাঠি রাখতে নিষেধ করেন। তিনি

বলেন: “(৯) তোমাদের গেঁজিয়ায় স্বর্ণ কি রৌপ্য কি পিত্তল, (১০) এবং যাত্রার জন্য থলি কি দুইটি আঙ্ৰাখা কি পাদুকা কি যষ্ঠি, এ সকলের আয়োজন করিও না।”

লূকের বর্ণনাতেও দেখা যায় যে, যীশু লাঠি সাথে রাখতে নিষেধ করেছেন। লূকের ৯ অধ্যায়ের ৩ পঙক্তি নিম্নরূপ: “তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, পথের জন্য কিছুই লইও না, যষ্ঠিও না...।”

কিন্তু মার্কের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি প্রেরিতদেরকে লাঠি সাথে রাখার নির্দেশ দেন। মার্কলিখিত সুসমাচারের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৮-৯ পঙক্তি নিম্নরূপ: “(৮) আর আজ্ঞা করিলেন, তোমরা যাত্রার জন্য এক এক যষ্ঠি ব্যতিরেকে আর কিছু লইও না।, রুটীও না, ঝুলিও না, গেঁজিয়ায় পয়সাও না; (৯) কিন্তু পায়ে পাদুকা দেও, আর দুইটা আঙরাখা পরিও না।”

এভাবে আমরা দেখছি যে, যীশুর আজ্ঞা বর্ণনায় সুসমাচারত্রয়ের বর্ণনার মধ্যে সুস্পষ্ট বৈপরীত্য বিদ্যমান। প্রথম বক্তব্যদ্বয় অনুসারে যীশু প্রেরিতদেরকে লাঠি নিতে নিষেধ করেন। কিন্তু তৃতীয় বক্তব্য অনুসারে তিনি তাদেরকে লাঠি নিতে আদেশ করেন।

১৪- নিজের বিষয়ে যীশুর সাক্ষ্যের সত্যতার বিষয়ে বৈপরীত্য:

যোহনলিখিত সুসমাচারের ৫ম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে যীশু বলেন: “আমি যদি আপনার বিষয়ে আপনি (নিজের বিষয়ে নিজে) সাক্ষ্য দিই তবে আমার সাক্ষ্য সত্য নয়।”

আর এ পুস্তকেরই ৮ম অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে যীশু বলেন: "যদিও আমি আপনার বিষয়ে আপনি (নিজের বিষয়ে নিজে) সাক্ষ্য দিই তথাপি আমার সাক্ষ্য সত্য।"

প্রথম বক্তব্য অনুসারে যীশুর নিজের বিষয়ে প্রদত্ত তার নিজের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু দ্বিতীয় বক্তব্য অনুসারে তা গ্রহণযোগ্য।

১৫- বধ্যভূমিতে যীশুর ক্রুশবহনকারীর বর্ণনায় বৈপরীত্য

ক্রুশে চড়ানোর জন্য যীশুকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়ার বর্ণনায় মথি ২৭/৩২ এর বক্তব্য: "আর বাহির হইয়া তাহারা শিমোন নামে এক জন কুরীণীয় লোকের দেখা পাইল; তাহাকেই তাঁহার ক্রুশ বহন করিবার জন্য বেগার ধরিল (তাকে যীশুর ক্রুশটি বহন করতে বাধ্য করল: **him they compelled to bear his cross**)।"

লূকলিখিত সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে বলা হয়েছে: "পরে তাহারা তাঁহাকে লইয়া যাইতেছে, ইতিমধ্যে শিমোন নামে এক জন কুরীণীয় লোক পল্লীগ্রাম হইতে আসিতেছিল, তাহারা তাহাকে ধরিয়া তাহার স্কন্ধে ক্রুশ রখিল, যেন সে যীশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহা বহন করে।"[31]

পক্ষান্তরে এ বিষয়ে যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৯ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে বলা হয়েছে: "তখন তাহারা যীশুকে লইল; এবং তিনি আপনি

[31] লূক ২৩/২৬।

ক্রুশ বহন করিতে করিতে বাহির হইয়া মাথার খুলির স্থান নামক স্থানে গেলেন।"

এখানে একই ঘটনার বর্ণনায় সুসমাচারত্রয়ের মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। মথি ও লূকের বর্ণনা অনুসারে যীশুর ক্রুশটি বহন করেন শিমোন নামের এ কুরীণীয় লোক। আর যোহনের বর্ণনা অনুসারে ক্রুশটি বহন করেন যীশু নিজেই।

১৬- যীশু আগমন শান্তি না অশান্তির জন্য?

মথি ৫/৯ নিম্নরূপ: "ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয় (**Blessed are the peacemakers**), কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।"

লূক ৯/৫৬ নিম্নরূপ: "কারণ মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের প্রাণনাশ করিতে আইসেন নাই; কিন্তু রক্ষা করিতে আসিয়াছেন।"

মথি ১০/৩৪ নিম্নরূপ: "মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি; শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি।"

লূক ১২/৪৯ ও ৫১ নিম্নরূপ: "(৪৯) আমি পৃথিবীতে অগ্নি নিক্ষেপ করিতে আসিয়াছি; আর এখন যদি তাহা প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তবে আর চাই কি? ... (৫১) তোমরা কি মনে করিতেছ, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি? তোমাদিগকে বলিতেছি, তাহা নয়, বরং বিভেদ।"

উপরের বক্তব্যগুলির মধ্যে বৈপরীত্য সুস্পষ্ট। প্রথম দুটি বক্তব্যে শান্তি, ঐক্য ও মিলন সৃষ্টিকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যীশু নিজেও ধ্বংস নয়, বরং রক্ষা করতে আগমন করেন। কিন্তু শেষ দুটি বক্তব্যে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, তিনি খড়্গ, হানাহানি, ধ্বংস ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য আগমন করেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি মুক্তি, শান্তি, মিলন ও রক্ষার জন্য আগমন করেন নি; কাজেই যাদেরকে ধন্য বলা হবে এবং ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

১. ৩. ২. ভুলভ্রান্তি

পূর্বোক্ত বৈপরীত্য ও অনুরূপ অগণিত বৈপরীত্য ছাড়াও বাইবেলের পুস্তকগুলির মধ্যে রয়েছে অগণিত ভুলভ্রান্তি। বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য হলো, বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তক, পাণ্ডুলিপি বা সংস্করণের মধ্যে তুলনা করে বৈপরীত্য জানা যায়। আর ভুল জানা যায় জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, মানবীয় রীতি, ঐতিহাসিক তথ্য, গণিত বিদ্যা বা অন্য কোনো জ্ঞানের আলোকে বাইবেলের তথ্য বিচার করার মাধ্যমে। গবেষক পণ্ডিতগণ বাইবেলের মধ্যে এরূপ অনেক ভুলভ্রান্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে অল্প কয়েকটি দেখুন:

১- ইস্রায়েল সন্তানদের মিসরে অবস্থানকার সম্পর্কে ভুল তথ্য:

যাত্রাপুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘ইস্রায়েল-সন্তানেরা চারি শত ত্রিশ বৎসর কাল মিসরে প্রবাস করিয়াছিল।’

এ তথ্যটি ভুল। ইস্রায়েল-সন্তানগণ ৪৩০ বৎসর নয়, বরং ২১৫ বৎসরকাল মিশরে অবস্থান করেছিল। তবে কনান দেশে ও মিসরে উভয় স্থানে ইস্রায়েল সন্তানগণের পূর্বপুরুষ ও তাদের মোট অবস্থানকাল ছিল ৪৩০ বৎসর। কারণ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর কনান দেশে প্রবেশ থেকে তাঁর পুত্র ইসহাক আলাইহিস সালাম-এর জন্ম পর্যন্ত ২৫ বৎসর। ইসহাকের জন্ম থেকে ইয়াকূব আলাইহিস সালাম বা ইস্রায়েল-এর জন্ম পর্যন্ত ৬০ বৎসর। ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-এর অপর নাম বা প্রসিদ্ধ উপাধি “ইস্রায়েল” এবং তাঁর বংশধররাই বনী ইসরাঈল বা ইস্রায়েল সন্তানগণ বলে পরিচিত।

ইয়াকূব বা ইস্রায়েল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর বংশধরদের নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ১৩০ বৎসর। এভাবে আমরা দেখছি যে, ইব্রাহীমের আলাইহিস সালাম মিসরে প্রবেশ থেকে তাঁর পৌত্র ইয়াকূব (ইস্রায়েল)-এর মিসরে প্রবেশ পর্যন্ত সময়কাল (২৫+৬০+১৩০=) ২১৫।

ইস্রায়েল আলাইহিস সালাম-এর মিসরে প্রবেশ থেকে মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে তাঁর বংশধরদের মিসর ত্যাগ পর্যন্ত

সময়কাল ২১৫ বৎসর। এভাবে কানানে ও মিসরে তাদের মোট অবস্থানকাল (২১৫+২১৫=) ৪৩০ বৎসর।

ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, হিব্রু বাইবেলের এ তথ্যটি ভুল। তারা বলেন: শমরীয় তাওরাতে এখানে উভয় স্থানের অবস্থান একত্রে বলা হয়েছে এবং এখানে শমরীয় তাওরাতের বক্তব্যই সঠিক।

শমরীয় তাওরাত বা তাওরাতের শমরীয় সংস্করণ অনুসারে যাত্রাপুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৪০ পঙক্তি নিম্নরূপ: "ইস্রায়েল-সন্তানেরা ও তাদের পিতৃগণ কনান দেশে ও মিসরে চারি শত ত্রিশ বৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিল।'

এখানে গ্রীক তাওরাত বা তাওরাতে গ্রীক সংস্করণের ভাষ্য নিম্নরূপ: "কনান দেশে ও মিসরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ ও তাদের পিতা-পিতামহগণের মোট অবস্থানকাল চারি শত ত্রিশ বৎসর।"

খৃস্টান গবেষক ও পণ্ডিতগণের নিকট নির্ভরযোগ্য পুস্তক "মুরশিদুত তালিবীন ইলাল কিতাবিল মুকাদ্দাসিস সামীন" (মহামূল্য পবিত্র বাইবেলের ছাত্রগণের পথ নির্দেশক) নামক গ্রন্থে এভাবেই ইস্রায়েল সন্তানগণের ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-এর মিসরে আগমন থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জন্ম পর্যন্ত সময়কাল ১৭০৬ বৎসর। আর ইস্রায়েল সন্তানদের মিসর পরিত্যাগ ও ফিরাউনের

সলিল সমাধি থেকে ইসা আলাইহিস সালাম-এর জন্ম পর্যন্ত সময়কাল ১৪৯১ বৎসর। ১৭০৬ থেকে ১৪০৯ বাদ দিলে ২১৫ বৎসর থাকে, এটিই হলো ইয়াকূব আলাইহিস সালাম-এর মিসর আগমন থেকে ইস্রায়েল সন্তানদের মিসর পরিত্যাগ পর্যন্ত সময়।

এখানে অন্য একটি বিষয় এ সময়কাল নিশ্চিত করে। মূসা আলাইহিস সালাম ছিলেন ইয়াকূব (ইস্রায়েল আ.)-এর অধস্তন ৪র্থ পুরুষ। ইয়াকূবের পুত্র লেবি, তার পুত্র কহাৎ, তার পুত্র অম্রাম (**Amram**: ইমরান), তার পুত্র মূসা আলাইহিস সালাম। এতে বুঝা যায় যে, মিসরে ইস্রায়েল সন্তানগণের অবস্থান ২১৫ বৎসরের বেশি হওয়া অসম্ভব। আর ইয়াহূদী-খৃস্টান ঐতিহাসিক, ব্যাখ্যাকার ও গবেষকগণ একমত পোষণ করেছেন যে, ইস্রায়েলীয়গণ ২১৫ বৎসর মিসরে অবস্থান করেন। তাদের মিসরে ৪৩০ বৎসর অবস্থানের যে তথ্য বাইবেলের হিব্রু সংস্করণে দেওয়া হয়েছে তা ভুল বলে তারা একমত হয়েছেন। এজন্য আদম ক্লার্ক বলেন, "সকলেই একমত যে, হিব্রু সংস্করণে যা বলা হয়েছে তার অর্থ অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল। আর মূসা আলাইহিস সালাম-এর পাঁচ পুস্তক বা তোরাহ-এর বিষয়ে শমরীয় সংস্করণ অন্যান্য সংস্করণ থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ। আর ইতিহাস শমরীয় তাওরাতের বক্তব্য সঠিক বলে প্রমাণ করে।

হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ বলেন: শমরীয় তোরাহ-এর এই বক্তব্যই সত্য। এর দ্বারা হিব্রু তোরাহ-এর পাঠে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীভুত হয়।

এ থেকে জানা গেল যে, হিব্রু বাইবেলে যাত্রাপুস্তকের ১২/৪০-এ যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা ভুল বলে স্বীকার করা ছাড়া ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতদের কোনো উপায় নেই।

২- মিসর পরিত্যাগের সময় ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা বর্ণনায় ভুল:

গণনাপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ৪৪-৪৭ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে: "(৪৪) এই সকল লোক মোশি ও হারোণ ... কর্তৃক গণিত হইল। (৪৫) স্ব স্ব পিতৃকুলানুসারে ইস্রায়েল-সন্তানগণ, অর্থাৎ বিংশতি বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধে গমনযোগ্য (৪৬) সমস্ত পুরুষ গণিত হইলে গণিত লোকদের সংখ্যা ছয় লক্ষ তিন সহস্র পাঁচ শত পঞ্চাশ হইল। (৪৭) আর লেবীয়েরা আপন পিতৃবংশানুসারে তাহাদিগের মধ্যে গণিত হইল না।"[32]

এ শ্লোকগুলি থেকে জানা যায় যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন মোশির সাথে মিশর ত্যাগ করে তখন তাদের ২০ বৎসরের অধিক বয়সের যুদ্ধেসক্ষম পুরুষদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষের অধিক (৬,০৩,৫৫০)। লেবীর বংশের সকল নারী, লেবীয় বংশের সকল

---

[32] গণনাপুস্তক ১/৪৫-৪৭।

পুরুষ, অন্যান্য সকল বংশের সকল নারী এবং সকল বংশের ২০ বৎসরের কম বয়স্ক সকল যুবক ও কিশোর পুরুষ বাদ দিয়েই ছিল এই সংখ্যা।

চার শ্রেণীর মানুষ এই গণনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে: ১. লেবীর বংশের সকল নারী, ২. লেবীয় বংশের সকল পুরুষ, ৩. অন্যান্য সকল বংশের সকল নারী এবং ৪. সকল বংশের ২০ বৎসরের কম বয়স্ক সকল যুবক ও কিশোর পুরুষ বাদ দিয়েই ছিল এই সংখ্যা।

তাহলে যদি এই চার প্রকারের নারী, পুরুষ ও যুবক-কিশোরদের গণনায় ধরা হয় তাহলে মিশর ত্যাগকালে তাদের সংখ্যা দাঁড়াবে কমপক্ষে ২৫ লক্ষ। আর এই তথ্য কেনোমতেই সঠিক হতে পারে না। কারণ:

প্রথমত, আদিপুস্তক ৪৬/২৭, যাত্রাপুস্তক ১/৫, দ্বিতীয় বিবরণ ১০/২২ -এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন মিশরে প্রবেশ করে তখন তাদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন।

দ্বিতীয়ত, ইস্র্‌ায়েল-সন্তানগণ মিশরে অবস্থান করেছিলেন সর্বমোট ২১৫ বৎসর। এর বেশি তারা অবস্থান করেন নি।

তৃতীয়ত, যাত্রাপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ১৫-২২ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মিশর ত্যাগের ৮০ বৎসর পূর্ব থেকে তাদের

সকল পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হত থাকে এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখা হত।

এ তিনটি বিষয়ের আলোকে যে কোনো সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ নিশ্চিত হবেন যে, মিসর ত্যাগের সময় ইস্রায়েল সন্তানদের যে সংখ্যা (৬,০৩,৫৫০) উল্লেখ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ভুল।

আমরা যদি পুত্র সন্তান হত্যার বিষয়টি একেবারে বাদ দিই এবং মনে করি যে, ইস্রায়েল সন্তানগণ মিশরে অবস্থানকালে তাদের জনসংখ্যা এত বেশি বৃদ্ধি পেত যে, প্রতি ২৫ বৎসরে তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যেত, তাহলেও তাদের সর্বমোট জনসংখ্যা ২১৫ বৎসরে ৭০ থেকে ৩৬০০০ (ছত্রিশ হাজার)-ও হতে পারে না। তাহলে সর্বমোট জনসংখ্যা ২৫ লক্ষ হওয়া বা লেবীয়গণ বাদে মোট পুরুষ যোদ্ধার সংখ্যা ছয় লক্ষ হওয়া কিভাবে সম্ভব! এর সাথে যদি শেষ ৮০ বছরের পুরুষ সন্তান হত্যার বিষয় যোগ করা হয় তাহলে বিষয়টি আরো অসম্ভব ও অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হয়।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইবনু খলদূন (৮০৮ হি/১৪০৫খৃ) তার ইতিহাসের ভূমিকায় বাইবেলে উল্লেখিত এ সংখ্যা অবাস্তব বলে মতপ্রকাশ করেছেন। কারণ মূসা ও ইস্রায়েল (ইয়াকূব)-এর মধ্যে মাত্র তিনটি স্তর বা চারটি প্রজন্ম। যাত্রাপুস্তক ৬/১৬-২০, গণনাপুস্তক ৩/১৭-১৯ ও ১ বংশাবলী ৬/১৮-এর বর্ণনা অনুসারে: মোশির পিতা অম্রাম (ইমরান), তার পিতা কহাৎ, তার

পিতা লেবি, তার পিতা যাকোব। যাকোব ও মোশির মধ্যে তিন পুরুষ মাত্র। আর মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেক কখনোই মানতে পারে না যে, মাত্র চার পুরুষে ৭০ জনের বংশধর ২০-২৫ লক্ষ হতে পারে।

নিম্নের বিষয়দুটি এ ভুলকে আরো নিশ্চিত করে:

(১) যাত্রাপুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৩৮-৪২ শ্লোক থেকে জানা যায় যে, ইস্রায়েল-সন্তানগণ যখন মিশর পরিত্যাগ করে তখন তাদের সাথে ছিল গৃহপালিত পশুর বিশাল বাহিনী। সকল মানুষ ও পশু একরাতের মধ্যে সমূদ্র পার হয়েছিলেন। তারা প্রতিদিন পথ চলতেন এবং তাদের যাত্রার জন্য মোশির নিজের মুখের সরাসরি নির্দেশই যথেষ্ট ছিল। তারা সমূদ্র অতিক্রম করার পরে সিনাই পর্বতের পার্শে ১২টি ঝর্ণার পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করেন। যদি ইস্রায়েল সন্তানগণের সংখ্যা এ সময়ে ২০/২৫ লক্ষই হতো তাহলে কখনোই একরাতে তারা সকল মানুষ ও পশুর বিশাল বাহিনী সমূদ্র অতিক্রম করতে পারতেন না, প্রতিদিন পথ চলতে পারতেন না, মূসা আলাইহিস সালাম-এর মুখের কথা শুনেই সকলে যাত্রা শুরু করতে পারতেন না এবং সিনাই প্রান্তরের সীমিত স্থানে মাত্র ১২টি ঝর্ণায় তাদের এত মানুষ ও পশুর বিশাল বাহিনীর স্থান সংকুলান হতো না।

(২) যাত্রাপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ১৫-২২ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে মাত্র দুজন ধাত্রী ছিল:

একজনের নাম শিফ্রা ও অন্যজনের নাম পূয়া। মিশরের রাজা ফরৌণ এ দুই ইব্রীয়া ধাত্রীকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তোমরা ইব্রীয় (ইস্রায়েলী) মহিলাদের সন্তান প্রসব করানোর সময় তাদের পুত্র সন্তান হলে হত্যা করবে এবং কন্যা সন্তান হলে তাকে জীবিত রাখবে। যদি ইস্রায়েলীগণের সংখ্যা এত বেশি হতো তাহলে কোনো অবস্থাতেই মাত্র দুইজন ধাত্রী তাদের সকলের জন্য ধাত্রীকর্ম করতে পারতো না। বরং তাদের মধ্যে শতশত ধাত্রী থাকতো।

উপরের আলোচনা থেকে এথা স্পষ্ট যে, মিশর ত্যাগের সময় ইস্রায়েল-সন্তানদের সংখ্যা ছিল, ৭০ জন থেকে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ২১৫ বৎসরে যেমন হতে পরে, যাদের মহিলাদের ধাত্রী-কর্ম করার জন্য দুইজন ধাত্রীই যথেষ্ট ছিল, একটি রাতই যাদের সমূদ্র পারাপারের জন্য যথেষ্ট ছিল, একদিনে মৌখিক আদেশ প্রদান করেই মোশি যাদেরকে নিয়ে সমূদ্র পার হতে পেরেছেন, সিনাই পর্বতের পাদদেশে এবং ইলমের সংকীর্ণ স্থানে সাথের গৃহপালিত পশু সহ যাদের স্থান সংকুলান হয়েছিল। সামান্যতম সন্দেহ ছাড়াই আমরা সুনিশ্চিত যে মিসর ত্যাগের সময় ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যার বিষয়ে যাত্রাপুস্তকের ১/৪৪-৪৭-এর বর্ণনা ভুল ও অসত্য।

৩- যে ভুলের জন্য দায়ূদ আলাইহিস সালামের নুবুওয়াত বাতিল হয়!

দ্বিতীয় বিববরণ ২৩/২: "জারজ ব্যক্তি সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিবে না; তাহার দশম পুরুষ পর্যন্তও সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" এ বক্তব্যটি ভুল। কারণ এটি সত্য হলে দায়ূদ আলাইহিস সালাম সদাপ্রভুর সমাজে প্রবেশ করতে পারবেন না; নবী বা ভাববাদী হওয়া তো দূরের কথা। কারণ দায়ূদের দশম পূর্বপুরুষ পেরস তারা দাদা যিহূদার জারজ সন্তান ছিলেন।[33] যিহূদা তার পুত্রবধু -মৃতপুত্রের স্ত্রী- তামরের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন এবং এ ব্যভিচারের ফলে পেরসের জন্ম হয়। আদিপুস্তকের ৩৮/১২-৩০ শ্লোকে তা সুস্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে।

পেরস থেকে শুরু করলে দায়ূদ দশম পুরুষ হন। মথিলিখিত সুসমাচারের ১/১-৬ এবং লূকলিখিত সুসমাচারের ৩/৩১-৩৩-এ বর্ণিত দায়ূদের বংশতালিকা নিম্নরূপ: (১) দায়ূদ বিন (২) যিশয় বিন (৩) ওবেদ বিন (৪) বোয়স বিন (৫) সল্মোন বিন (৬) নহশোন বিন (৭) অম্মীনাদব বিন (৮) রাম বিন (৯) হিষ্রোন বিন (১০) পেরস। মথি ১/৩-৬: "যিহূদার পুত্র পেরস... পেরসের পুত্র হিষ্রোন, হিষ্রোণের পুত্র রাম, রামের পুত্র অম্মীনাদব, অম্মীনাদবের পুত্র সলমোন, সলমোনের পুত্র বোয়স ... বোয়সের পুত্র ওবেদ ... ওবেদের পুত্র যিশয়, যিশয়ের পুত্র দায়ূদ।"

---

[33] অর্থাৎ বর্তমান তোরাহ এর ভাষ্যমতে। [সম্পাদক]

দ্বিতীয় বিবরণের ৩২ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক সঠিক হলে দায়ূদ কখনোই নবী হতে পারেন না। অথচ দায়ূদ আলাইহিস সালাম- সদাপ্রভুর সমাজের নেতা ও গৌরব। তারই পরিচয়ে যীশুখৃস্টের পরিচয়।

গীতসংহিতার ৮৯ গীতের ২৬-২৭ শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে তিনি সদাপ্রভুর প্রথমজাত (**firstborn**) সন্তান বা জ্যৈষ্ঠ পুত্র এবং সকল রাজার সেরা ও সর্বোচ্চ রাজা। কাজেই দ্বিতীয় বিবরণের এ শ্লোকটি নিঃসন্দেহে ভুল ও অসত্য।

এখানে একটি জালিয়াতির অবস্থা দেখুন। লন্ডনে ১৮২৫ সালে মুদ্রিত রজার্ড ওয়াটস-এর বাইবেলে এবং ১৮২৬ সালে কলকাতায় মুদ্রিত বাইবেলে (উইলিয়াম কেরির বঙ্গানুবাদ বাইবেলে) লূকলিখিত সুসমাচারের তৃতীয় অধ্যায়ে যীশুর বংশতালিকায় দায়ূদের অষ্টম পূর্বপুরুষ “রাম” ও নবম পূর্বপুরুষ “হিম্রোন”-এর মধ্যে “অর্নি” নামটি সংযোজন করে বলা হয়েছে “রাম বিন অর্ণি বিন হিম্রোন বিন পেরস” (কেরির বাংলা বাইবেলে: ইনি অদমানের পুত্র, ইনি অর্নির পুত্র, ইনি হিম্রোনের পুত্র, ইনি পেরসের পুত্র)।

এ সংযোজনের উদ্দেশ্য দায়ূদকে বাঁচানো, যেন তিনি পেরসের দশম পুরুষ না হয়ে একাদশ পুরুষ হন। কিন্তু বিকৃতিকারীগণ এখানে সংযোজনের সময় মথির লেখা বংশতালিকায় “অর্নি” নামটি সংযোজন করতে ভুলে গিয়েছেন। ফলে উক্ত দুটি সংস্করণেই মথির

বংশতালিকা অনুসারে দায়ূদ পেরসের দশম পুরুষই রয়ে গিয়েছেন। ফলে তাদের সংস্করণেই মথির বক্তব্যের সাথে লূকের বক্তব্যের বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে এবং তাদের জালিয়াতি ধরা পড়ে গিয়েছে। আর সর্বাবস্থায় দায়ূদের জারজ সন্তানের দশম পুরুষ হওয়ার বিষয়টি থেকেই যাচ্ছে।

অনুরূপভাবে ১৮৪৪ সালের সংস্করণে ও ১৮৬৫ সালের সংস্করণেও "অর্নি" নামটি সংযোজন করা হয় নি, মথিতেও না, লূকেও না, বরং উভয় সুসমাচারেই "রাম বিন হিষ্রোন" লেখা হয়েছে।[34]

প্রকৃত সত্য কথা হলো, আদিপুস্তকের ৩৮ অধ্যায়ের ১২-৩০ শ্লোকে পুত্রবধু তামরের সাথে যিহূদার ব্যভিচারের যে ঘৃণ্য কাহিনী লেখা হয়েছে তা সম্পূর্ণ জাল ও বানোয়াট কাহিনী। পাশাপাশি দ্বিতীয় বিবরণের ২৩ অধ্যায়ের ২ শ্লোকটি (জারজ সন্তানের দশম পুরুষ পর্যন্ত জান্নাতে যাবে না) ভুল। কারণ এরূপ বিধান কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসতে পারে না। মূসা আলাইহিস সালাম কখনো এরূপ কথা লিখতে পারেন না। কারণ একের পাপের ভার অন্যে বহন

---

[34] ইংরেজি কিং জেমস ভার্সন (অথোরাইযড ভার্সন)-উভয় স্থানেই "হিষ্রোনের পুত্র রাম" বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্সনে মথির সুসমাচারে 'হিষ্রোনের পুত্র রাম' এবং লূকের সুসমাচারে 'হিষ্রোনের পুত্র অর্নি, অর্নির পুত্র রাম' লেখা হয়েছে।

করবে তা হতে পারে না। এজন্য বাইবেল ভাষ্যকার হার্সলি বলেন: "(দশম পরুষ পর্যন্ত সদাপ্রভুর সমাজে {জান্নাতে} প্রবেশ করতে পারবে না) কথাটি সংযোজিত (জাল ও বানোয়াট)।"

৪- বৈত-শেমস গ্রামের নিহতদের সংখ্যা বর্ণনায় ভুল

১ শমূয়েল-এর ৬ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে বলা হয়েছে: "পঞ্চাশ সহস্র জনকে"[35]। এই কথাটি নির্ভেজাল ভুল ও অসত্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আলোচ্যে পাঠক তা বিস্তারিত জানতে পারবেন।

শমূয়েল ভাববাদীর ১ম পুস্তকের ৪-৬ অধ্যায়ে ইস্রায়েল সন্তানদের নিয়ম-সিন্দুক বা ঈশ্বরীয় সিন্দুক পলেষ্টীয়দের হস্তগত হওয়া ও তা পুনরুদ্ধারের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সদাপ্রভুর-সিন্দুক ফেরত আনার সময়ে বৈৎ-শেমশ গ্রামের বাসিন্দারা মাঠে গম কাটছিল। তাঁরা চোখ তুলে সিন্দুকটি দেখতে পান এবং আনন্দিত হন। এজন্য সদাপ্রভু ঈশ্বর তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। শাস্তির বিবরণে ১ শমূয়েলের ৬ অধ্যায়ের ১৩ ও ১৯ শ্লোকে বলা হয়েছে: "(১৩) ঐ সময়ে বৈৎ-শেমন নিবাসীরা তলভূমিতে গোম কাটিতেছিল; তাহারা চুক্ষু তুলিয়া সিন্দুকটা দেখিল, দেখিয়া আহ্লাদিত হইল। ... (১৯) পরে তিনি বৈৎ-শেমশের লোকদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে আঘাত করিলেন, কারণ তাহারা সদাপ্রভুর সিন্দুকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, ফলত তিনি লোকদের মধ্যে

---

[35] "ফলতঃ তিনি লোকেদের মধ্যে সত্তর জনকে এবং পঞ্চাশ সহস্র জনকে আঘাত করিলেন।"

সত্তর জনকে এবং পঞ্চাশ সহস্র জনকে আঘাত করিলেন (**he smote of the people fifty thousand and threescore and ten men**)। তাহাতে লোকের বিলাপ করিল, কেননা সদাপ্রভু মহা আঘাতে লোকদিগকে আঘাত করিয়াছেন।”

এ কথাটি নিঃসন্দেহে ভুল ও বিকৃত। আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যখ্যাগ্রন্থের এ কথাগুলির ত্রুটি বর্ণনা করার পরে বলেন: বাহ্যত বুঝা যায় যে, হিব্রু পাঠ এখানে বিকৃত। সম্ভবত এখানে মূল পাঠ থেকে কিছু শব্দ ছুটে গিয়েছে, অথবা অজ্ঞতার কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে এর মধ্যে কিছু শব্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কারণ, একথা জ্ঞানত অসম্ভব যে, সেই ছোট্ট একটি গ্রামে এত পরিমাণ মানুষ বসবাস করবে অথবা এত অধিক সংখ্যক মানুষ একত্রে মাঠের মধ্যে গম কাটায় রত থাকবে। সবচেয়ে অসম্ভব বিষয় হলো, যে উটের পিঠে রাখা একটি ছোট্ট সিন্দকের দিকে বা মধ্যে পঞ্চাশ হাজার সত্তর জন মানুষ একত্রে বা একসাথে দৃষ্টিপাত করবেন বা দেখতে পাবেন।

অতঃপর তিনি বলেন: “ল্যাটিন অনুবাদে রয়েছে: ‘সত্তর জন নেতা ও ৫০ হাজার সাধারণ মানুষ’, সিরীয় অনুবাদে রয়েছে: ‘পাঁচ হাজার ৭০ জন মানুষ’, অনুরূপভাবে প্রাচীন আরবী অনুবাদে রয়েছে: ‘পাঁচ হাজার ৭০ জন মানুষ’। ঐতিহাসিক জোসেফাস (**Flavius Josephus**) শুধু ‘৭০ জন মানুষ’ লিখেছেন। ইয়াহূদী পণ্ডিত শলোমন গার্গি ও অন্যান্য রাব্বি বিভিন্ন সংখ্যা লিখেছেন। এ সকল

পরস্পরবিরোধী তথ্য এবং বাইবেলের পাঠে উল্লিখিত সংখ্যার অবাস্তবতার ভিত্তিতে আমরা নিশ্চিত যে, নিঃসন্দেহে এ স্থানে বিকৃতি সাধিত হয়েছে। হয়তবা কিছু কথা বৃদ্ধি করা হয়েছে অথবা কিছু কথা পড়ে গিয়েছে।”

হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে: মূল হিব্রু বাইবেলে নিহতদের সংখ্যা (৫০,০৭০) বলা হয়েছে উল্টাভাবে (৭০ ও ৫০ হাজার)। এ ছাড়াও একটি ছোট্ট গ্রামের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক মানুষের পাপে লিপ্ত হওয়া ও নিহত হওয়ার বিষয়টি অস্বাভাবিক ও অবিশ্বাস্য। কাজেই এই ঘটনার সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। জোসেফাস নিহতদের সংখ্যা শুধু ‘৭০’ লিখেছেন।

তাহলে দেখুন, কিভাবে এ সকল পণ্ডিত এ ঘটনা অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিলেন, এ বর্ণনাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং এখানে ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ঘটেছে বলে স্বীকার করলেন।

৫- সুলাইমান আলাইহিস সালাম-এর বারান্ডার উচ্চতা বর্ণনায় ভুল

২ বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে সুলাইমান আলাইহিস সালাম এর মসজিদ বা আল-মাসজিদুল আকসার (বাইবেলের ভাষায়: শলোমনের মন্দিরের) বর্ণনায় বলা হয়েছে: “আর গৃহের সম্মুখস্থ বারান্ডা গৃহের প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও এক শত বিংশতি হস্ত উচ্চ হইল।”

"১২০ হাত উচ্চ" কথাটি নিখাদ ভুল। ১ রাজাবলির ৬ অধ্যায়ের ২ শ্লোকে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, শলোমনের নির্মিত মন্দিরটির উচ্চতা ছিল ত্রিশ হস্ত। তাহলে বারান্ডা কিভাবে ১২০ হাত উচু হবে?

আদম ক্লার্ক তার ভাষ্যগ্রন্থে ২ বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের ভুল স্বীকার করেছেন। এজন্য সিরিয় (সুরিয়ানী) ভাষায় ও আরবী ভাষায় অনুবাদে অনুবাদকগণ ১২০ সংখ্যাকে বিকৃত করেছেন। তারা "এক শত" কথাটি ফেলে দিয়ে বলেছেন: "বিশ হাত উচ্চ"।

১৮৪৪ সালের আরবী অনুবাদে মূল হিব্রু বাইবেলের এ ভুল "সংশোধন" (!) করে লেখা হয়েছে: "আর গৃহের সম্মুখস্থ বারান্ডা গৃহের প্রস্থানুসারে বিংশতি হস্ত দীর্ঘ ও বিংশতি হস্ত উচ্চ হইল।"

৬- অবিয় ও যারবিয়ামের সৈন্যসংখ্যা বর্ণনায় ভুল

২ বংশাবলির ১৩ অধ্যায়ে ৩ ও ১৭ শ্লোকে বলা হয়েছে: "(৩) অবিয় চারি লক্ষ মনোনিত যুদ্ধবীরের সহিত যুদ্ধে গমন করিলেন, এবং যারবিয়াম আট লক্ষ মনোনীত বলবান বীরের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য রচনা করিলেন। ... (১৭) আর অবিয় ও তাঁহার লোকেরা মহাসংহারে উহাদিগকে সংহার করিলেন; বস্তুত ইস্রায়েলের পাঁচ লক্ষ মনোনীত লোক মারা পড়িল।"

উপরের শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি সবই ভুল। বাইবেল ব্যাখাকারগণ তা স্বীকার করেছেন। সে যুগের ছোট্ট দুটি 'গোত্র রাজ্য' যিহূদা ও ইস্রায়েরের জন্য উপরের সংখ্যাগুলি অস্বাভাবিক ও অবাস্তব। এ কারণে ল্যাটিন অনুবাদের অধিকাংশ কপিতে 'লক্ষ'-কে হাজারে নামিয়ে আনা হয়েছে, অর্থাৎ প্রথম স্থানে 'চারি লক্ষ' পাল্টিয়ে 'চল্লিশ হাজার', দ্বিতীয় স্থানে 'আট লক্ষ' পাল্টিয়ে 'আশি হাজার' ও তৃতীয় স্থানে 'পাঁচ লক্ষ' পাল্টিয়ে '৫০ হাজার' করা হয়েছে। বাইবেলের ব্যাখ্যাকারগণ এই বিকৃতি ও পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছেন। হর্ন ও আদম ক্লার্ক এ "সংশোধন" (!) সমর্থন করেছেন। আদম ক্লার্ক অনেক স্থানেই বারংবার সুস্পষ্টত উল্লেখ করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, বাইবেলের ইতিহাস বিষয়ক পুস্তগুলিতে বিকৃতি সাধিত হয়েছে।

৭- ফল ভোজন ও মানুষের আয়ু বিষয়ক ভুল

আদিপুস্তকের ২য় অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "কিন্তু সদসদ্-জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে (**for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die**)।"

এ কথাটি ভুল। কারণ আদম আলাইহিস সালাম এই বৃক্ষের ফল ভোজন করেছেন এবং যে দিন এই বৃক্ষের ফল ভোজন করেছেন,

সে দিন তিনি মরেন নি। বরং এর পরেও ৯০০ বৎসরেরও বেশি সময় তিনি জীবিত ছিলেন।

আদিপুস্তকের ৬ অধ্যায়ের ৩ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, আমার আত্মা মানুষের মধ্যে সর্বদা অবস্থান করিবে না; কারণ সেও তো মাংসমাত্র; পরন্তু তার সময় এক শত বিংশতি বৎসর হইবে।"[36]

"মানুষের আয়ু ১২০ বৎসর হবে" এই কথাটি ভুল। কারণ পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের বয়স আরো অনেক দীর্ঘ ছিল। আদিপুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ১-৩১ শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে আদম ৯৩০ বৎসর জীবিত ছিলেন। অনুরূপভাবে শিস (শেথ) ৯১২ বৎসর, ইনোশ ৯০৫ বৎসর, কৈনন ৯১০ বৎসর, মহললেল ৮৯৫ বৎসর, যেরদ ৯৬২, হানোক (ইদরীস আ.) ৩৬৫ বৎসর, মথূশেলহ ৯৬৯ বৎসর, লেমক ৭৭৭ বৎসর পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। নোহ

---

[36] এই শ্লোকটির ইংরেজী পাঠ নিম্নরূপ: (**And the Lord said, My Spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh; yet his days shall be a hundred and twenty years**) এই ইংরেজী পাঠের ভিত্তিতে ও গ্রন্থকারের প্রদত্ত আরবী পাঠের ভিত্তিতে উপরের বাংলা অনুবাদটি করা হয়েছে। এখানে প্রচলিত বাংলা বাইবেলের ভাষা নিম্নরূপ: "তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, আমার আত্মা মনুষ্যদের মধ্যে নিত্য অধিষ্ঠান করিবে না; তাহাদের বিপথগমনে তাহারা মাংসমাত্র। পরন্তু তাহাদের সময় এক শত বিংশতি বৎসর হইবে।"

(নূহ) ৯৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন।[37] শেম (সাম) ৬০০ বৎসর জীবিত ছিলেন।[38] অর্ফক্ষদ ৩৩৮ বৎসর আয়ু লাভ করেন।[39] এভাবে অন্যান্যরা দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। আর বর্তমান যুগে ৭০ বা ৮০ বৎসর আয়ু পাওয়ার ঘটনাও কম ঘটে। এভাবে প্রমাণিত যে, মানুষের আয়ু ১২০ বৎসর বলে নির্ধারণ করা ভুল।

৮- যীশুর বংশতালিকায় পুরুষ গণনায় ভুল

মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১-১৭ শ্লোকে যীশুর বংশতালিকা বর্ণনা করা হয়েছে। ১৭ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "এইরূপে আব্রাহাম অবধি দায়ূদ পর্যন্ত সর্বশুদ্ধ চৌদ্দ পুরুষ; দায়ূদ অবধি বাবিলে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; এবং বাবিলে নির্বাসন অবধি খ্রীষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।"

এখানে স্পষ্টত বলা হয়েছে যে, যীশুর বংশতালিকা তিন অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশে ১৪ পুরুষ রয়েছে এবং যীশু থেকে আব্রাহাম পর্যন্ত ৪২ পুরুষ। এ কথাটি সুস্পষ্ট ভুল। মথির ১/১-১৭-র বংশ তালিকায় যীশু থেকে আবরাহাম পর্যন্ত ৪২ পুরুষ নয়, বরং ৪১ পুরুষের উল্লেখ রয়েছে। প্রথম অংশ: ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকে দায়ূদ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ১৪ পুরুষ, দ্বিতীয় অংশ

---

[37] আদিপুস্তক ৯/২৯।

[38] আদিপুস্তক ১১/১০-১১।

[39] আদিপুস্তক ৯/১২-১৩।

সুলাইমান আলাইহিস সালাম থেকে যিকনিয় পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ এবং তৃতীয় অংশ শল্টীয়েল থেকে এবং যীশু পর্যন্ত মাত্র ১৩ পুরুষ রয়েছেন।

তৃতীয় খৃস্টীয় শতকে বোরফেরী এই বিষয়টি সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেন, কিন্তু এর কোনো সঠিক সমাধান কেউ দিতে পারেন নি।[40]

---

[40] এখানে আরো লক্ষণীয় যে, মথি লিখেছেন: "দায়ূদ অবধি বাবিলে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।" বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে এ কথাটি মারাত্মক ভুল। ১ বংশাবলির ১ম অধ্যায় থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, এই পর্যায়ে ১৮ পুরুষ ছিল, ১৪ পুরুষ নয়। মথির বিবরণ অনুসারে শলোমন থেকে যিকনিয় পর্যন্ত বংশধারা নিম্নরূপ: ১. শলোমন, ২. রহবিয়াম, ৩. অবিয়, ৪. আসা, ৫. যিহোশাফট, ৬. যোরাম, ৭. উষিয়, ৮. যোথাম, ৯. আহস, ১০. হিষ্কিয়, ১১. মনঃশি, ১২. আমোন, ১৩. যোশিয় ও ১৪. যিকনিয়। অপরদিকে ১ বংশাবলির বিবরণ অনুসারে শলোমন থেকে যিকনিয় পর্যন্ত বংশধারা নিম্নরূপ: ১. শলোমন, ২. রহবিয়াম, ৩. অবিয়, ৪. আসা, ৫. যিহোশাফট, ৬. যোরাম, ৭. অহসিয়, ৮. যোয়াশ, ৯. অমৎসিয়, ১০. অসরিয় (৭. উষিয়,) ১১. (৮) যোথাম, ১২. (৯) আহস, ১৩. (১০) হিষ্কিয়, ১৪. (১১) মনঃশি, ১৫. (১২) আমোন, ১৬. (১৩) যোশিয়, ১৭. যিহোয়াকীম ও ১৮. (১৪) যিকনিয়। এখানে বাইবেলের দুই স্থানেই স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী ব্যক্তি পরবর্তী ব্যক্তিকে জন্ম দিয়েছেন বা পরবর্তী ব্যক্তি পূর্ববর্তী ব্যক্তির পুত্র। মথি যোরাম ও উষিয় (অসরিয়) এর মধ্যে তিন পুরুষ ফেলে দিয়েছেন এবং যোশিয় ও যিকনিয়র মাঝে এক পুরুষ ফেলে দিয়েছেন। তিনি শুধু ফেলে দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, উপরন্তু এখানে যে আর কেউ ছিল না নিশ্চিত করতে এই পর্যায়ে সর্বমোট ১৪

৯- দায়ূদ কর্তৃক মহাযাজকের রুটি খাওয়ার বর্ণনায় ভুল

মথিলিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ের ৩-৪ শ্লোক নিম্নরূপ: “(৩) তিনি (যীশু) তাহাদিগকে (ইয়াহূদী ফরীশীগণকে) কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা ক্ষধিত হইলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা পাঠ কর নাই? (৪) তিনি ত ঈশ্বরে গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার দর্শন-রুটী ভোজন করিলেন, যাহা তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের ভোজন করা বিধেয় ছিল না, কেবল যাজকবর্গেরই বিধেয় ছিল।”

মার্কলিখিত সুসমাচারের ২ অধ্যায়ের ২৫-২৬ শ্লোক নিম্নরূপ: “(২৫) তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, দায়ূদ ও তাঁহার সঙ্গীরা খাদ্যের অভাবে ক্ষুধিত হইলে তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা কখনো পাঠ কর নাই? (২৬) তিনি ত অবিয়াথর মহাযাজকের সময়ে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে দর্শন-রুটী যাজকবর্গ ব্যতিরেকে আর কাহারও ভোজন করা বিধেয় নয়, তাহাই ভোজন করিয়াছিলেন, এবং সঙ্গিগণকেও দিয়াছিলেন।”

পুরুষ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ কার্ডিনাল জন হেনরী নিউম্যান (১৮০১-১৮৯০) আফসোস করে বলেন, খৃস্টান ধর্মে একথা বিশ্বাস করা জরুরী যে, তিনে এক হয় বা তিন ও এক একই সংখ্যা। কিন্তু এখন একথাও বিশ্বাস করা জরুরী হয়ে গেল যে, ১৪ এবং ১৮ একই সংখ্যা; কারণ পবিত্র গ্রন্থে কোনো ভুল থাকার সম্ভাবনা নেই।

এখানে ‘ও তাঁহার সঙ্গীরা’, ‘তাঁহার সঙ্গীদের’ এবং “সঙ্গীদেরকেও দিয়াছিলেন” কথাগুলি সবই ভুল। কারণ ‘দর্শন-রুটী’ ভোজন করার সময় দায়ূদ ‘একা’ ছিলেন, তাঁর সাথে অন্য কেউ ছিল না।

এছাড়া ‘তিনি ত অবিয়াথর মহাযাজকের সময়ে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিয়া’ কথাগুলিও ভুল। কারণ এ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট মহাযাজকের নাম ছিল ‘অহীমেলক’। ‘অবিয়াথর’ এ সময়ে যাজক ছিলেন না। অবিয়াথর ছিলেন অহীমেলকের পুত্র। এ কথাগুলি যে ভুল তা ১ শমূয়েল-এর ২১ অধ্যায়ের ১-৯ শ্লোক ও ২২ অধ্যায়ের ৯-২৩ শ্লোকে মূল ঘটনা পাঠ করলেই জানা যায়। মি. জুয়েল তার গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ কথাগুলি ভুল। অন্যান্য অনেক পণ্ডিত তা স্বীকার করেছেন। তাদের মতে এ কথাগুলি পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে, যা ইচ্ছাকৃত বিকৃতির প্রমাণ।

১০- ক্রুশের ঘটনার বর্ণনায় ভুল

মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ের ৫০-৫৩ শ্লোক নিম্নরূপ: “(৫০) পরে যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া নিজ আত্মা সমর্পন করিলেন। (৫১) আর দেখ, মন্দিরের তিরস্করিণী (veil) উপর হইতে নীচ পর্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল, ভূমিকম্প হইল, ও শৈল সকল বিদীর্ণ হইল, (৫২) এবং কবর সকল খুলিয়া গেল, আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থাপিত হইল; (৫৩) এবং তাঁহার

পুনরুত্থানের পর তাঁহারা কবর হইতে বাহির হইয়া পবিত্র নগরে প্রবেশ করিলেন, আর অনেক লোককে দেখা দিলেন।”

মন্দিরের তিরস্করিণী (পর্দা) বিদীর্ণ হওয়ার কথা মার্কের ১৫/৩৮ ও লূকের ২৩/৪৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাকি বিষয়গুলি, অর্থাৎ পাথরগুলি ফেটে যাওয়া, কবরগুলি খুলে যাওয়া, মৃত লাশগুলির বেরিয়ে আসা, যেরুশালেমে প্রবেশ করা, তথাকার অধিবাসীদের সাথে মৃতলাশগুলির দেখা-সাক্ষাত হওয়া ইত্যাদি বিষয় তারা উল্লেখ করেন নি।

এগুলি অত্যন্ত বড় বিষয়। মথির দাবি অনুসারে এ বিষয়গুলি প্রকাশ্যে সকলেই অবলোকন করেছিলেন। অথচ একমাত্র মথি ছাড়া সে সময়ের অন্য কোনো ঐতিহাসিক এই ঘটনাগুলি লিখলেন না! এমনকি এর পরের যুগের কোনো ঐতিহাসিকও এ বিষয়ে কিছু লিখেন নি। তারা ভুলে গিয়েছিলেন বলে দবি করার কোনো সুযোগ নেই; কারণ মানুষ সব কিছু ভুললেও এরূপ অস্বাভাবিক অত্যাশ্চর্য ঘটনা কখনো ভুলতে পারে না। বিশেষত লূক ছিলেন আশ্চর্য ও অলৌকিক ঘটনাবলির সংকলনে অত্যন্ত আগ্রহী। এ কথা কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, সুসমাচার লেখকগণ সকলেই অথবা অধিকাংশই সাধারণ লৌকিক ঘটনা ও অবস্থাদি লিখবেন, অথচ মথি ছাড়া কেউই এই অসাধারণ অলৌকিক ঘটনাগুলি লিখবেন না?

এ কাহিনীটি মিথ্যা। পণ্ডিত নর্টন পবিত্র বাইবেলের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য সদা সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনিও তার পুস্তকে এ কাহিনীটি মিথ্যা বলে বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেছেন। এরপর তিনি বলেন, এই কাহিনীটি মিথ্যা। সম্ভবত যিরূশালেমের ধ্বংসের পর থেকে এই ধরনের কিছু গল্প-কাহিনী ইয়াহূদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সম্ভবত কেউ একজন মথিলিখিত সুসমাচারের হিব্রু পাণ্ডুলিপির টীকায় তা লিখেছিলেন এবং অনুলিপি লেখক (**copier**) লেখার সময় তা মূল পাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এরপর সেই কপিটিই অনুবাদকের হাতে পড়ে এবং সেভাবেই তিনি অনুবাদ করেন।

পণ্ডিত নর্টনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, মথির সুসমাচারের (মূল হিব্রু থেকে প্রথম গ্রীক) অনুবাদক ছিলেন ‘রাতের আঁধারে কাঠ-সংগ্রহকারীর মত’ বিবেচনা ও বিচার শক্তিবিহীন। শুখনো ও ভিজের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা তার ছিল না। এ গ্রন্থের মধ্যে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ যা কিছু পেয়েছেন সবই অনুবাদ করেছেন। এইরূপ একজনের অনুবাদ ও সম্পাদনার উপরে কি নির্ভর করা যায়? কখনোই না।

১১- শেলহের পিতার নাম বর্ণনায় ভুল:

লূক তার সুসমাচারের ৩য় অধ্যায়ে লিখেছেন: “ইনি শেলহের পুত্র, ইনি কৈননের পুত্র, ইনি অর্ফকষদের পুত্র”[41]

এ কথাটি ভুল। কারণ, শেলহ নিজেই অর্ফকষদের পুত্র ছিলেন, তিনি অর্ফকষদের পৌত্র ছিলেন না। আদিপুস্তক ১০/২৪ নিম্নরূপ: “আর অর্ফক্ষদ শেলহের জন্ম দিলেন।” আদিপুস্তক ১/১২-১৩ নিম্নরূপ: “অর্ফক্ষদ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শেলহের জন্ম দিলেন। শেলহের জন্ম দিলে পর অর্ফক্ষদ চারি শত তিন বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্রকন্যার জন্ম দিলেন।” হিব্রু তাওরাত ও শমরীয় তাওরাত উভয়ই সুস্পষ্টভাবে এ সকল স্থানে উল্লেখ করেছে যে, অর্ফক্ষদ শেলহের পিতা এবং শেলহ অর্ফক্ষদের ঔরষজাত সন্তান। ১ বংশাবলি ১/১৮-তেও এ কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও অর্ফকষদ ও শেলহের মধ্যে কৈননের নাম উল্লেখ করা হয় নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, লূকের সুসমাচারের উপর্যু&ক্ত কথাটি ভুল। এখানে উল্লেখ্য যে তাওরাতের গ্রীক অনুবাদের **(the Septuagint: LXX)** শেলহের পিতা হিসেবে “কৈননের” নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বাহ্যত খৃস্টানগণ নিজেদের সুসমাচারের বর্ণনাকে সঠিক বলে প্রমাণ করার জন্য অনুবাদের মধ্যে বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন।

---

[41] লূক ৩/৩৬।

১. ৩. ৩. বাইবেলের বিকৃতির আলোচনা

এ অনুচ্ছেদে আমরা শব্দ বা বাক্যের পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে বাইবেলে মধ্যে যে সকল বিকৃতি সাধন করা হয়েছে তার সামান্য কিছু নমুনা আলোচনা করতে চাই।

১- প্লাবন পূর্ব মহাপুরুষদের বয়স বর্ণনায় বিকৃতি:

আদিপুস্তকের ৫ম অধ্যায়ের ১-৩২ শ্লোকে আদমের আলাইহিস সালাম সৃষ্টি থেকে নূহ আলাইহিস সালাম-এর প্লাবন পর্যন্ত সময়কাল বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নূহ আলাইহিস সালাম পর্যন্ত মহাপুরুষদের বয়সকালও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাইবেলের তিন সংস্করণে[42] এ সময়কার তিন প্রকার লেখা হয়েছে।

---

[42] ইহূদী-খৃস্টানগণের নিকট সংরক্ষিত পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলির তিনটি মূল সংস্করণ ও পাণ্ডুলিপি রয়েছে। (১) হিব্রু সংস্করণ বা হিব্রু পাণ্ডুলিপি (২) গ্রীক সংস্করণ বা গ্রীক পাণ্ডুলিপি ও (৩) শমরীয় (**Samaritan**) সংস্করণ বা শমরীয় পাণ্ডুলিপি।

ইহূদীগণের ধর্মীয় ও ব্যবহারিক ভাষা হিব্রু ভাষা। এ ভাষাতেই তাদের সকল ধর্মগ্রন্থ লিখিত হয়। স্বভাবতই পুরাতন নিয়মের সকল গ্রন্থই হিব্রু ভাষায় লিখিত ছিল। খৃস্টপূর্ব ৩৩২ সালে আলেকজান্ডার প্যালেস্টাইন দখল করেন এবং তা গ্রীক সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ইহূদীগণ গ্রীক রাজ্যের নাগরিকে পরিণত হয় এবং তাদের মধ্যে গ্রীক ভাষার কিছু প্রচলন ক্রমান্বয়ে শুরু হয়। প্রায় এক শতাব্দী পরে, খৃস্টপূর্ব ২৮৫-২৪৫ সালের দিকে বাইবেলের পুরাতন নিয়ম নামে

শমরীয় সংস্করণ অনুসারে আদম থেকে প্লাবন পর্যন্ত সময়কাল এক হাজার তিনশত সাত (১৩০৭) বৎসর। হিব্রু সংস্করণে এ সময় এক হাজার ছয়শত ছাপ্পান্ন (১৬৫৬) বছর। গ্রীক সংস্করণ অনুসারে এ সময় দুই হাজার দুই শত বাষট্টি (২২৬২) বছর। এভাবে আমরা দেখছি যে, তিনটি সংস্করণের মধ্যে সময়ের বিবরণে বিরাট পার্থক্য ও বিশ্রী বৈপরীত্য রয়েছে। এ বৈপরীত্য ও পার্থক্য সমন্বয় করা

পরিচিত ইহূদী ধর্মগ্রন্থগুলি গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়। কথিত আছে যে, মিসরের শাসক ২য় টলেমি: টলেমি ফিলাডেলফাস (**Ptolemy Philadelphus**)- এর রাজত্বকালে (খৃ. পূ. ২৮৫-২৪৬) তাঁর নিদের্শে নির্দেশে ৭০/৭২ জন পন্ডিত তা 'আলেকজেন্ড্রীয় গ্রীক ভাষায়' অনুবাদ করেন। এই গ্রীক অনুবাদটিই **the Septuagint (LXX)** বা 'সত্তরের' অনুবাদ বলে প্রসিদ্ধ। যীশুখৃস্টের সময়ে এ অনুবাদটি প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয়। ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত খৃস্টানগণ গ্রীক অনুবাদকেই পুরাতন নিয়মের বিশুদ্ধ সংস্করণ বলে দাবি করতেন। গ্রীক অনুবাদ থেকে তারা ল্যাটিন অনুবাদ করেন। তারা দাবি করেন যে, গ্রীক অনুবাদের অশুদ্ধতা প্রমাণ করার জন্য ১৩০ খৃস্টাব্দের দিকে ইহূদীগণ হিব্রু বাইবেলের মধ্যে ইচ্ছাপূর্বক বিকৃতি সাধন করে। প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, মূল হিব্রু বাইবেলেই বিশুদ্ধ এবং গ্রীক অনুবাদ অসংখ্য ভুলে ভরা।

সুলাইমান (আ)-এর পরেই ইহূদীগণ বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের এক সম্প্রদায়কে শমরীয় (**Samaritans**) বলা হয়, যারা প্রাচীন ফিলিস্তিনের শামেরা বা শামারিয়া (**Samaria**) রাজ্যে বসবাস করত। এদের নিকট সংরক্ষিত তাওরাতের প্রাচীন সংস্করণকে শমরীয় তাওরাত বলা হয়।

সম্ভব নয়। (নিঃসন্দেহে দুটি বা সবগুলি সংস্করণে পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে।)

তিনটি সংস্করণই একমত যে, আদম আলাইহিস সালামের মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৯৩০ বৎসর (আদিপুস্তক ৫/৫) এবং তিন সংস্করণই একমত যে, প্লাবনের সময় নূহ আলাইহিস সালাম-এর বয়স ছিল ৬০০ বৎসর (আদিপুস্তক ৭/৬)।

এতে শমরীয় সংস্করণের বর্ণনা অনুসারে প্লাবনের মাত্র ৩৭৭ বৎসর পূর্বে (১৩০৭-৯৩০) আদমের মৃত্যু হয়। আর যেহেতু প্লাবনের ৬০০ বৎসর পূর্বে নূহ আলাইহিস সালামের জন্ম, সেহেতু আদমের মৃত্যুর সময় নোহের বয়স ছিল ২২৩ বৎসর (৬০০-৩৭৭)। ঐতিহাসিকগণ একমত যে বিষয়টি বাতিল। হিব্রু ও গ্রীক বাইবেল তা মিথ্যা প্রমাণ করে। আদমের বয়স ও প্লাবনের সময় নূহের বয়সের সমষ্টি (৯৩০+৬০০=) ১৫৩০ বৎসর। হিব্রু বাইবেলের তথ্য অনুযায়ী (১৬৫৬-১৫৩০) আদমের মৃত্যুর ১২৬ বৎসর পরে নোহের জন্ম। আর গ্রীক বাইবেলের তথ্য অনুসারে (২২৬২-১৫৩০) আদমের মৃত্যুর ৭৩২ বৎসর পরে নোহের জন্ম।

প্রথম খৃস্টীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধতম ইয়াহূদী ঐতিহাসিক জোসেফাস **(Flavius Josephus)** খৃস্টানদের নিকটও নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য। এই বিশ্রী বৈপরীত্য ও পার্থক্যের কারণে তিনি 'পুরাতন নিয়মের' এই তিন সংস্করণের কোনোটির বিবরণই গ্রহণ করেন নি। তিনি

লিখেছেন যে, আদমের সৃষ্টি থেকে নোহের প্লাবন পর্যন্ত সময়কাল ছিল দুই হাজার দুইশত ছাপ্পান্ন (২২৫৬) বৎসর।

২- প্লাবন পরবর্তী মহাপুরুষদের বয়স বর্ণনায় বিকৃতি:

আদিপুস্তকের ১১ অধ্যায়ের ১০-২৬ শ্লোকে নূহ আলাইহিস সালাম-এর প্লাবন থেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত সময়কাল বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে নূহ আলাইহিস সালাম থেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত মহাপুরুষদের বয়সকালও উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেলের তিন সংস্করণে এ সময়কার তিন প্রকার লেখা হয়েছে।

নূহের প্লাবন থেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর জন্ম পর্যন্ত সময়কাল হিব্রু সংস্করণ অনুসারে দুইশত বিরানববই (২৯২) বৎসর, শমরীয় সংস্করণ অনুসারে নয়শত বিয়াল্লিশ (৯৪২) বৎসর এবং গ্রীক সংস্করণ অনুসারে একহাজার বাহাত্তর (১০৭২) বৎসর। এখানেও তিন সংস্করণের মধ্যে বিশ্রী রকমের বৈপরীত্য রয়েছে, যার মধ্যে সমন্বয় সম্ভব নয়। যা সবগুলি বা দুটি সংস্করণে পরিবর্তন ও বিকৃতি প্রমাণ করে।

তিন সংস্করণই একমত যে, প্লাবনের পরে নূহ আলাইহিস সালাম ৩৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন (আদিপুস্তক ৯/২৮)। ৩৫০ থেকে ২৯২ বৎসর বাদ দিলে ৫৮ বৎসর থাকে। এতে হিব্রু বাইবেল অনুসারে প্রমাণিত হয় যে, নোহের মৃত্যুর সময় অবরাহামের বয়স ছিল ৫৮

বৎসর। ঐতিহাসিকগণ একমত যে কথাটি বাতিল। গ্রীক ও শমরীয় সংস্করণও তা মিথ্যা প্রমাণ করে। শমরীয় সংস্করণের ভাষ্য অনুযায়ী ইবরাহীমের আলাইহিস সালাম জন্ম নূহের আলাইহিস সালাম মৃত্যুর পাঁচশত বিরানববই (৫৯২) বৎসর পরে (৯৪২-৩৫০=৫৯২)। আর গ্রীক সংস্করণের ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর জন্ম নূহের আলাইহিস সালাম মৃত্যুর সাতশত বাইশ (৭২২) বৎসর পরে (১০৭২-৩৫০=৭২২)।

বাইবেলের তিন সংস্করণের মধ্যকার এই বিরাট ও বিশ্রী বৈপরীত্যের কারণে খৃস্টানগণ নিজেদের মধ্যে মতভেদ করেছেন। ঐতিহাসিকগণ এই তিন বিবরণই বাতিল করে দিয়ে বলেছেন, নূহ আলাইহিস সালাম থেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর জন্ম পর্যন্ত সময় হলো তিনশত বাহান্ন (৩৫২) বৎসর।

১ম খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ ইয়াহূদী ঐতিহাসিক জোসেফাস (**Flavius Josephus**) এ সকল বিবরণের কোনোটিই গ্রহণ করেন নি; বরং তিনি বলেছেন: এই সময়কাল ছিল নয়শত তিরানববই (৯৯৩) বৎসর। হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে জোসেফাসের মতটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে তারা চতুর্থ শতকের শ্রেষ্ঠ খৃস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরু (যাজক) সেন্ট অগাস্টিন (**St. Augustine, Bishop of Hippo: 354–430**)-এর মতামত উল্লেখ করেছেন যে, প্লাবনের আগের ও পরের যুগের মানুষদের বর্ণনার ক্ষেত্রে ইয়াহূদীরা

হিব্রু সংস্করণ বিকৃত করেছে। গ্রীক সংস্করণ যাতে অনির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয় সেজন্য এবং খৃস্টধর্মের বিরোধিতার জন্য তারা এই বিকৃতি করেছে। ১৩০ খৃস্টাব্দে ইয়াহূদীরা এই বিকৃতি সাধন করে। হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন, গবেষক হেলস শক্তিশালী প্রমাণাদির দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ইয়াহূদীরা তাদের ধর্মগ্রন্থ বিকৃত করেছিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কেনিকটও প্রমাণ করেছেন যে, ইয়াহূদীরা ইচ্ছাকৃতভাবে পুরাতন নিয়মের হিব্রু সংস্করণ বিকৃত করে।

বিবেকবান পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করছেন যে, এ সকল খৃস্টান গবেষক পণ্ডিত ও ব্যাখ্যাকারগণের শেষ গতি বিকৃতির কথা স্বীকার করা। তারা স্বীকার করছেন যে, ধর্মীয় বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কমবেশি করে তাদের ঐতিহাসিক বিবরণগুলি বিকৃত করেছেন।

৩-প্রস্তর স্থাপনের জন্য নির্ধারিত পর্বতের নামে বিকৃতি:

দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ২৭ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "আর আমি অদ্য যে প্রস্তরগুলির বিষয়ে তোমাদিগকে আদেশ করিলাম, তোমরা যর্দন পার হইলে পর এবল পর্বতে সেই সকল প্রস্তর স্থাপন করিবে, ও তাহা চুন দিয়া লেপন করিবে।"

এ শ্লোকটি শমরীয় সংস্করণে নিম্নরূপ: "আর আমি অদ্য যে প্রস্তরগুলির বিষয়ে তোমাদিগকে আদেশ করিলাম.... গরিষীম পর্বতে সেই সকল প্রস্তর স্থাপন করিবে, ও তাহা চুন দিয়া লেপন করিবে।"

দ্বিতীয় বিবরণের ২৭/১২-১৩ এবং এ পুস্তকের ১১/২৯ শ্লোক থেকে জানা যায় যে, এবল ও গরিষীম(**Mount Ebal & Mount Ger'izim**) ফিলিস্তিনের নাবলুস শহরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত দুটি পাশাপাশি পাহাড়। দ্বিতীয় বিবরণ ১১/২৯ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "আর তুমি যে দেশ অধিকার করিতে যাইতেছ, সেই দেশে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তোমাকে প্রবেশ করাইবেন, তখন তুমি গরিষীম পর্বতে ঐ আশীর্বাদ, এবং এবল পর্বতে ঐ অভিশাপ স্থাপন করিবে।"

হিব্রু সংস্করণ থেকে জানা যায় যে, মোশি এবল পাহাড়ে ধর্মধাম বা মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন। আর শমরীয় সংস্করণ থেকে জানা যায় যে, মোশি গরিষীম পাহাড়ে ধর্মধাম নির্মাণের নির্দেশ দেন। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত ইয়াহূদী ও শমরীয়দের মধ্যে এ বিষয়ে বির্তক খুবই প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক সম্প্রদায় দাবি করেন যে, অন্য সম্প্রদায় এস্থলে তোরাহের বক্তব্য বিকৃত করেছে। প্রটেস্টান্ট পণ্ডিতগণের মধ্যেও এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ হিব্রু সংস্করণের বিশুদ্ধতা দাবি করেছেন এবং কেউ শমরীয় সংস্করণের বিশুদ্ধতা দাবি করেছেন। প্রসিদ্ধ বাইবেল ব্যাখ্যাকার আদম ক্লার্ক, প্রসিদ্ধ গবেষক কেনিকট (**Benjamin Kennicott**) ও অন্যান্য পণ্ডিত শমরীয় সংস্করণের বিশুদ্ধতার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তারা প্রমাণ করেন যে, শমরীয়দের সাথে শত্রুতার কারণে ইয়াহূদীরা এখানে

তোরাহ-এর বক্তব্য বিকৃত করেছে। আর একথা তো সকলেই জানেন যে, গরিষীম পাহাড়টি অনেক ঝর্ণা, বাগিচা, বৃক্ষলতায় পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে এবল একটি শুষ্ক পাহাড়। তাতে এসব কিছুই নেই। এমতাবস্থায় স্বভাবতই প্রথম পাহাড়টি দোয়া ও বরকতের জন্য এবং দ্বিতীয় পাহাড়টি অভিশাপ প্রদানের জন্য শোভনীয়।

এভাবে আমরা দেখছি যে, খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এখানে হিব্রু বাইবেলের বিকৃতির কথা স্বীকার করছেন।

৪- রাজ্যের নামে বিকৃতি:

হিব্রু বাইবেলে ২ বংশাবলির ২৮ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে বলা হয়েছে: "কেননা ইস্রায়েল রাজ আহসের জন্য সদাপ্রভু যিহূদাকে নত করিলেন...।"

এখানে 'ইস্রায়েল' কথাটি নিশ্চিতরূপে বিকৃত ও ভুল; কারণ আহস কখনোই 'ইস্রায়েল' রাজ্যের রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন 'যিহূদা' রাজ্যের রাজা।[43] গ্রীক ও ল্যাটিন অনুবাদে 'যিহূদা' শব্দ রয়েছে। কাজেই বিকৃতিটি ঘটেছে হিব্রু সংস্করণের মধ্যে।

---

[43] সুলাইমান (আ)-এর মৃত্যুর পরে তার পুত্র রুহবিয়ামের রাজত্বকালে (খৃ. পূ ৯২২ অব্দে) ইহূদীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং তাদের রাজ্য দুটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তর প্যালেস্টাইনের রাজ্যকে ইস্রাইল রাজ্য **(the Kingdom of Israel)** বলা হতো। এর রাজধানী ছিল নাবলুস। আর দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের রাজ্যকে 'যিহূদা রাজ্য' **(the Kingdom of Judea, also**

৫- না বনাম হ্যাঁ:

গীতসংহিতার ১০৫ নং গীতের ২৮ শ্লোকে হিব্রু সংস্করণে বলা হয়েছে: "তাঁহারা তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না।" এখানে গ্রীক সংস্করণে বলা হয়েছে: "তাঁহারা তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন।"

হিব্রু বাইবেলে বাক্যটি না-বাচক কিন্তু গ্রীক বাইবেলে বাক্যটি হাঁ-বাচক। দুটি বাক্যের একটি নিঃসন্দেহে বিকৃত ও ভুল।

এখানেও খৃস্টান পণ্ডিতগণ দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছেন। হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলা হয়েছে, এ দুই সংস্করণের মধ্যে বিরাজমান এ পার্থক্যের কারণে অনেক দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে। বাহ্যত কোনো একটি সংস্করণে 'না' কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে, অথবা বাড়ানো হয়েছে। এভাবে তারা এখানে বিকৃতির কথা স্বীকার করলেন, কিন্তু তারা কোন সংস্করণে বিকৃতিটি ঘটেছে তা নির্ধারণ করতে পারলেন না।

৬. প্রচলিত তাওরাত মূসা আলাইহিস সালাম-এর পরে লেখা হয়েছে:

Judaea or Judah) বলা হতো। এর রাজধানী ছিল যিরূশালেম। উত্তরের ইস্রায়েল রাজ্যকে অনেক সময় শামেরা (**Samaria**) বা ইফ্রমিয় (**Ephraimites**) বলা হতো। বাইবেলের একটি বড় অংশ এ দুই রাজ্যের মধ্যকার হানাহানি, গণহত্যা, যুদ্ধবিগ্রহ, মুর্তিপূজা, অনাচার ইত্যাদির বর্ণনা।

আদিপুস্তক ৩৬/৩১ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "ইস্রায়েল-সন্তানদের উপরে কোন রাজা রাজত্ব করিবার পূর্বে ইঁহারা ইদোম দেশের রাজা ছিলেন।" এরপর পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ইস্রায়েল-সন্তানদের প্রথম রাজা তালূত (শৌল)-এর রাজত্ব লাভের পূর্ব পর্যন্ত ইদোমের রাজাদের নাম-পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে।[44] তালূতের পরে ইস্রায়েলীয়দের রাজা হন দায়ূদ আলাইহিস সালাম। তাঁদের পূর্বে ইস্রায়েলীয়গণ বিচারকগণ কর্তৃক শাসিত ও পরিচালিত হতেন।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, আদিপুস্তকের ৩৬ অধ্যায়ের ৩১-৩৯ শ্লোকগুলি অবিকল ১ বংশাবলির ১ম অধ্যায়ের ৪৩-৫০ শ্লোক। রাজাবলির মধ্যে এ বিষয়গুলি আলোচিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক; এ শ্লোকগুলি নিশ্চিত প্রমাণ করে যে, এগুলির লেখক মূসা আলাইহিস

---

[44] মোশির মৃত্যুর পরে দীর্ঘ প্রায় তিন শতাব্দী যাবৎ ইস্রায়েল সন্তানগণের মধ্যে কোনো রাজা বা রাজত্ব ছিল না। নবী (ভাববাদী) বা বিচারকর্তৃগণ তাদেরকে পরিচালনা করতেন। সর্বশেষ বিচারকর্তা শমূয়েল ভাববাদীর সময়ে ইস্রায়েলীয়গণ তাঁর নিকট একজন রাজা নিয়োগের জন্য আবেদন করেন। তখন কীশের পুত্র শৌল (তালুত) নামক এক ব্যক্তি রাজা মনোনিত হন। আনুমানিক খৃ. পূ. ১০১৫/১০০০ অব্দে অমালিকা সম্প্রদায়ের রাজা জালূত (**Golieth**)-কে পরাজিত করে তালুত প্রথম ইস্রায়েলীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন ও প্রথম ইস্রায়েলীয় রাজা বলে গণ্য হন। তাহলে মূসার (আ) লিখিত বলে কথিত "তাওরাতের" পাঁচ পুস্তকের প্রথম পুস্তকে মূসার (আ) মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পরের ঘটনাবলি লেখা হচ্ছে।

সালাম-এর মৃত্যুর ৩৫৬ বৎসর পরে তালূত (শৌল)-এর রাজ্যভার গ্রহণের মাধ্যমে ফিলিস্তিনে বণী ইস্রায়েল বা ইস্রায়েল-সন্তানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরের যুগের মানুষ। আর বংশাবলি তালূদের যুগের অনেক পরে লেখা সে বিষয়ে মতভেদ নেই।

তবে 'আদিপুস্তক'-এ কথাগুলির থাকার কোনোরূপ কোনো ব্যাখ্যা নেই। যে পুস্তক তালুতের যুগের সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে মূসা আলাইহিস সালাম-এর লেখা তাওরাতের প্রথম পুস্তক তার মধ্যে এ কথা কিভাবে লেখা হলো?

আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন, আমার দৃঢ় ধারণা হলো এ শ্লোকগুলি কখনোই মোশি লিখেন নি। বরং এগুলি সম্ভবত আদিপুস্তকের কোনো পাণ্ডুলিপির টীকায় লেখা ছিল। অনুলিপিকার একে মূল পাঠের অংশ মনে করে মূল পাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন।

এভাবে এ ব্যাখ্যাকার বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি ও সংযোজনের কথা স্বীকার করলেন। তাঁর স্বীকারোক্তি থেকে বুঝা যায় যে, তাঁদের ধর্মগ্রন্থগুলি বিকৃতি যোগ্য ও বিকৃতির উর্ধ্বে নয়। কারণ এ নয়টি শ্লোক তোরাহ-এর অংশ না হওয়া সত্ত্বেও তা তোরাহের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং এরপর সকল পাণ্ডুলিপিতে তা প্রচারিত হয়েছে।

৭- "অদ্য পর্যন্ত" সংযোজনের বিকৃতি:

দ্বিতীয় বিবরণের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "মনঃশির সন্তান যায়ীর গশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের সীমা পর্যন্ত অর্গোবের

সমস্ত অঞ্চল লইয়া আপন নামানুসারে বাশন দেশের সেই সকল স্থানের নাম হবেবাৎ-যায়ীর রাখিল; অদ্য পর্যন্ত (সেই নাম চলিত আছে)।"

মূসা আলাইহিস সালাম-এর লিখিত বলে প্রচারিত তাওরাতের ৫ম পুস্তক 'দ্বিতীয় বিবরণের'-এর এ কথাটি কখনোই মোশির কথা হতে পারে না (যদিও তা মোশির বক্তব্যের মধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে)। উপরের শ্লোকটিতে 'অদ্য পর্যন্ত' কথাটি থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এ কথাটি যিনি বলেছেন বা লিখেছেন তিনি অবশ্যই মনঃশির সন্তান যায়ীরের যুগের অনেক পরের মানুষ। ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ বিস্তারিত গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, অনেক পরের মানুষেরা ছাড়া কেউ এই প্রকারের শব্দাবলি ব্যবহার করে না।

৬ নং বিকৃতি ও ৭ নং বিকৃতির বিষয়ে প্রসিদ্ধ গবেষক পণ্ডিত হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন: এ দুইটি বক্তব্য বা অনুচ্ছেদ কোনো প্রকারেই মোশির কথা হতে পারে না। কারণ প্রথম বক্তব্য প্রমাণ করে যে, এ পুস্তকের লেখক ইস্রায়েল-সন্তানগণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরের যুগের মানুষ ছিলেন। আর দ্বিতীয় বক্তব্য প্রমাণ করে যে, এ পুস্তকের লেখক ইয়াহূদীদের প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপনের পরের যুগের মানুষ ছিলেন। এ দুটি অনুচ্ছেদ শুধু অর্থহীনই নয়; বরং মুল পাঠের মধ্যে বিরক্তিকর সংযোজন বলে গণ্য। বিশেষত দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি। কারণ এটি মোশিই লিখুন আর অন্য যেই লিখুন তিনি

‘অদ্য পর্যন্ত’ কথাটি বলবেন না। এজন্য যতদূর মনে হয়, এ কথাটি ছিল নিম্নরূপ: “মনঃশির সন্তান যায়ীর গশূরীয়দের ও মাখাথীয়দের সীমা পর্যন্ত অর্গোবের সমস্ত অঞ্চল লইয়া আপন নামানুসারে বাশন দেশের সেই সকল স্থানের নাম হবেবাৎ-যায়ীর রাখিল।” এরপর অনেক শতাব্দী পরে ‘অদ্য পর্যন্ত’ কথাটি পাদটীকায় লেখা হয়, যেন জানা যায় যে যায়ীর যে নাম রেখেছিলেন তা অদ্যাবধি চালু রয়েছে। এরপর এই কথাটি পরবর্তী কপিগুলিতে পাদটীকা থেকে মূল বক্তব্যের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। যদি কারো এ বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে গ্রীক কপিগুলি দেখতে পারেন। তিনি দেখবেন যে, কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে কিছু কথা মূল পাঠের মধ্যে সংযোজিত রয়েছে; আর কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে তা পাদটীকায় রয়েছে।

তাঁর এ কথা প্রমাণ করে যে, এ পবিত্র ও ঐশ্বরিক পুস্তকগুলি লিখিত হওয়ার শত শত বৎসর পরেও এগুলিতে সংযোজন, বিয়োজন বা বিকৃতির সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল। কারণ তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, পুস্তকটি লিখিত হওয়ার অনেক শতাব্দী পরে এ কথাটিকে সংযোজন করা হয়েছে। এত পরে সংযোজিত কথাটিও পবিত্র পুস্তকের অংশে পরিণত হয়েছে এবং পরবর্তী সকল কপি ও সংস্করণে প্রচারিত হয়েছে!

উপরের শ্লোকটির মতই আরেকটি শ্লোক গণনাপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোক (কোনো কোনো মুদ্রণে ৪০ শ্লোক) নিম্নরূপ:

“আর মনঃশির সন্তান যায়ীর গিয়া তথাকার গ্রাম সকল হস্তগত করিল, এবং তাহাদের নাম হবেবাৎ-যায়ীর (যায়ীরের গ্রামসমূহ) রাখিল।”

এখানে আরো একটি ভুল রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, ‘মনঃশির সন্তান যায়ীর’। কথাটি ভুল। যায়ীরের পিতার নাম ‘সগূব’। ১ বংশাবলির ২য় অধ্যায়ের ২২ শ্লোক নিম্নরূপ: “সগুবের পুত্র যায়ীর, গিলিয়দ দেশে তাঁহার তেইশটি নগর ছিল।”[45]

এভাবে আমরা দেখছি যে, দ্বিতীয় বিবরণ ও গণনা পুস্তকের মধ্যে পরবর্তী যুগের সংযোজন প্রমাণিত হয়েছে এবং ভুল তথ্য

---

[45] ১ বংশাবলির ২য় ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে প্রদত্ত তথ্য থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, যায়ীর নামক এ ব্যক্তি মোশির পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক মানুষ ছিলেন না বরং তিনি মোশির পরের প্রজন্মের মানুষ ছিলেন। যাকোবের পুত্র লেবি, তার পুত্র কহাৎ, তাঁর পুত্র অম্রান, তাঁর পুত্র মোশি। আর যাকোবের অন্য পুত্র যিহূদা, তাঁর পুত্র পেরস, তাঁর পুত্র হিষ্রোণ, তাঁর পুত্র সগূব, তাঁর পুত্র যায়ীর। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, সগূব ছিলেন মোশির সমসাময়িক এবং তাঁর পুত্র যায়ীর মোশির পরের প্রজন্মের মানুষ। কাজেই একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এই বক্তব্যটির পুরোটিই অনেক পরের সংযোজন। সংযোজনকারী যায়ীরের নাম ও তাঁর মালিকানাধীন গ্রামগুলির নামের বিষয়ে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে কথাটি লিখেছেন। এজন্য তিনি যায়ীরের পিতার নামও ঠিকমত লিখতে পারেন নি। দেখুন ১ বংশাবলি ২/১-২৩ ও ৬/১-৩।

সংযোজনও প্রমাণিত হয়েছে। আর বংশাবলির মধ্যেও পিতার নাম ভুল লেখা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

‘বাইবেল ডিক্সনারী’ গ্রন্থটি আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও ভারতে মুদ্রিত হয়েছে। এ গ্রন্থের লেখকগণ বলেন: মোশির পুস্তকে এমন কিছু কথা পাওয়া যায় যা স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, তা মোশির কথা নয়। অনুরূপভাবে কিছু কিছু বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, সেগুলি মোশির বাচনভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কোন্ ব্যক্তি এই সকল বাক্য ও অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছেন তা আমরা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি না।

হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ বলেন: ‘অদ্যাপি’, ‘অদ্য পর্যন্ত’ **(unto this day)** জাতীয় বাক্যাংশ পুরাতন নিয়মের অধিকাংশ স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। যতদূর বুঝা যায়, এগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত। তাঁদের স্বীকৃতি অনুসারে শুধু ‘যিহোশূয়ের পুস্তকের’ মধ্যেই আরো ৮টি স্থানে পরবর্তী যুগে এইরূপ বাক্যাদি সংযোজনের মাধ্যমে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। যদি পুরাতন নিয়মের অন্যান্য স্থানে এইরূপ সংযোজন ও বিকৃতির কথা উল্লেখ করি তাহলে তালিকা অত্যন্ত লম্বা হয়ে যাবে।

৮- বিভিন্ন পুস্তকে ভূমিকা ও অধ্যায় সংযোজন:

দ্বিতীয় বিবরণের প্রথম অধ্যায়ের ১-৫ শ্লোক পাঠ করলে পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, এগুলি কখনোই মূসা আলাইহিস সালাম-এর কথা

নয়। এখানে লেখক মূসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে নাম পুরুষ **(3rd person)** ব্যবহার করে বলেছেন: "**(১)** যর্দনের পুর্বপারস্থিত প্রান্তরে .... মোশি সমস্ত ইস্রায়েলকে এই সকল কথা কহিলেন। ... (৩) সদাপ্রভু যে যে কথা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বলিতে মোশিকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, তদনুসারে মোশি চল্লিশ বৎসরের একাদশ মাসে, মাসের প্রথম দিনে তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন। .... (৫) যর্দনের পূর্বপারে মোয়াব দেশে মোশি এই ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন...।"

বাইবেল ভাষ্যকার আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে দ্বিতীয় বিবরণের প্রথম অধ্যায়ের ব্যাখ্যার শুরুতে বলেন: এ অধ্যায়ের শুরুতে প্রথম ৫টি শ্লোক এ পুস্তকের ভূমিকাস্বরূপ। এই শ্লোকগুলি মোশির কথা নয়। তিনি আরো বলেন যে, এ পুস্তকের (দ্বিতীয় বিবরণের) ৩৪ অধ্যায়টিও মোশির কথা নয়। মোশির বক্তব্য পূর্ববর্তী (৩৩) অধ্যায়ের সমাপ্তির সাথে সাথে শেষ হয়েছে। এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, মোশি ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা লাভ করে এই অধ্যায়টিও লিখেছেন। কারণ এ সম্ভাবনা সত্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা থেকে অনেক দূরে।[46] আদম ক্লার্ক দাবি করেছেন যে, এ অধ্যায়টি যিহোশূয়ের পুস্তকের প্রথম অধ্যায়

---

[46] এই অধ্যায়ে মোশির মৃত্যু, মৃত্যুর পরে ত্রিশ দিন যাবৎ ইহূদীদের শোকপালন, যুগের আবর্তনের মোশির কবর হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

ছিল। পক্ষান্তরে অনেক ব্যাখ্যাকার দাবি করেছেন যে, মোশির মৃত্যুর অনেক পরে '৭০ গোত্রপতি'[47] এই ৩৪ অধ্যায়টি রচনা করেন।

[47] মোশি ৭০ গোত্রপতির একটি 'কাউন্সিল' গঠন করেন বিচারকর্তৃগণকে সাহায্য করার জন্য। পরবর্তী কালে সকল যুগে ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে এইরূপ 'কাউন্সিল' ছিল।

তখন এ অধ্যায়টি যিহোশূয়ের পুস্তকের প্রথম অধ্যায় ছিল।[48] কিন্তু তা স্থানান্তরিত হয়ে এ স্থানে চলে এসেছে।[49]

এভাবে তারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করছেন যে, মূসার তাওরাতের এ সকল কথা মূসার কথা নয়। এরপর দাবি করলেন যে, ৭০ গোত্রপতি তা রচনা করেছেন। তাদের এ দাবি একেবারেই প্রমাণবিহীন আন্দায দাবি। এর বড় প্রমাণ হলো, এ বিষয়ে তাদের

---

[48] আদম ক্লার্ক, জনৈক ইহূদী পন্ডিত ও অন্যান্যদের এই দাবি একেবারেই ভিত্তিহীন। দ্বিতীয় বিবরণের ৩৪ অধ্যায়ের ৫-৬ শ্লোক প্রমাণ করে যে, এই অধ্যায়টি যিহোশূয়ের অনেক শতাব্দী পরে লেখা হয়েছে। এই শ্লোকদ্বয়ে বলা হয়েছে: "তখন সদাপ্রভুর দাস মোশি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিলেন। আর তিনি মোয়াব দেশে বৈৎপিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যকাতে তাঁহাকে কবর দিলেন। কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না। (**but no man knoweth of his sepulchre unto this day.**)" মোশির মৃত্যুর মাত্র ১৫/১৬ বৎসর পরে যিহোশূয় মৃত্যুবরণ করেন। গণনা পুস্তকের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ৭ লক্ষাধিক ইস্রায়েল সন্তান মোশির সাথে মিশর থেকে আগমন করেন। একথা কি কল্পনা করা সম্ভব যে, ১৫/১৬ বৎসরের মধ্যে এই ৭ লক্ষ ইস্রায়েল সন্তান তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেতা, ভাববাদী ও মুক্তিদাতার কবরের স্থানটি ভুলে গেলেন? এমনকি মোশির নিকটতম পরিচারক যিহোশূয়ও কবরটির স্থান পর্যন্ত ভুলে গেলেন?! শুধু তাই নয়, উপরন্তু তিনি তাঁর পুস্তকে নির্বিকার চিত্তে কথাটি লিপিবদ্ধ করলেন!!!

[49] কত সহজ বিষয়! একটি ধর্মগ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় ইচ্ছামত এক পুস্তক থেকে অন্য পুস্তকে ঢুকে পড়ে!!

নানামুনির নানা মত। হেনরী ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ বলেন, মোশির কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই শেষ হয়েছে। এ অধ্যায়টি পরবর্তীকালে সংযোজিত। সংযোজনকারী সম্ভবত যিহোশূয় অথবা শমূয়েল অথবা ইয্রা অথবা তাঁদের পরের যুগের অন্য কোনো ভাববাদী (নবী)।[50] এ বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছুই জানা যায় না। শেষ শ্লোকগুলি সম্ভবত ইস্রায়েল-সন্তানদের ব্যাবিলনের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে সংযোজন করা হয়েছে।"

পাঠক এখানে এ সকল পণ্ডিতের কথাগুলি একটু চিন্তা করুন! তাঁরা বললেন: "সংযোজনকারী সম্ভবত যিহোশূয়, অথবা ... অথবা ...

[50] ... অথবা কোনো লিপিকার, অথবা কোনো ধর্মত্যাগী মুর্তিপূজক রাজা, অথবা কোনো শয়তান ....। এ কথাগুলি থেকে মনে পড়ে মোল্লা দোপেয়াজীর ও বাদশাহ আকবরের মধ্যকার সংলাপ। বাদশাহ বললেন, এদেশে মোট কাকের সংখ্যা কত? মোল্লা দোপেয়াজী একটি কাল্পনিক সংখ্যা বললেন: এত লক্ষ... এত হাজার এত... । আপনার সন্দেহ হলে গুণে দেখুন। যদি বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে বাইরের কোনো কাক এদেশে বেড়াতে এসেছে। আর যদি কম হয় তাহলে বুঝতে হবে এদেশের কোনো কাক বাইরে বেড়াতে গিয়েছে। এ সকল পন্ডিতদের ভিত্তিহীন কাল্পনিক সম্ভাবনাগুলির সাথে মোল্লা দোপেয়াজীর কথার কি কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায়?

অথবা ... অথবা তাঁদের পরের যুগের অন্য কোনো ভাববদী। সবই ভিত্তিহীন প্রমাণবিহীন কাল্পনিক দাবি মাত্র।[51]

এখানে দ্বিতীয় বিবরণের ৩৪ অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক উল্লেখ করছি, যেন পাঠক অবস্থা ভালভাবে অনুধাবন করতে পারেন:

---

[51] সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, তাঁরা যদি কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তনের কোনোরূপ ওজর বা ব্যাখ্যা পেশ করতে না পারেন, তবে তাকে বিকৃতি বলে স্বীকার করে ভুলটি 'অনুলিপিকারের' ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। আর যেখানে এরূপ সংযোজন, বিয়োজন বা বিকৃতির মধ্যে সুস্পষ্ট কোনো ভুল ধরা পড়ে না সেখানে তাঁরা এই সংযোজনের দায়িত্ব নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট ভাববাদী বা কোনো একজন 'ঐশ্বরিক প্রেরণাপ্রাপ্ত' ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। এর উল্টো কেন হলো না তা আমরা বুঝি না। কেউ যদি দাবি করেন যে, সবগুলিই লিপিকারদের বা সবগুলিই ভাববাদিগণের কর্ম, তবে তা ভুল প্রমাণ করা হবে কিভাবে? আর ভাববাদিগণের বা 'ঐশ্বরিক প্রেরণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের' নির্ভুলতারই বা প্রমাণ কোথায়? যে ইয্রার নাম তাঁরা বারংবার বলেন তিনি আরো দুইজন ভাববাদীর সহযোগিতায় যে 'বংশাবলি' পুস্তক রচনা করেছেন তার মধ্যেও অনেক ভুল রয়েছে বলে আমরা দেখেছি। এছাড়া তোরাহ বা পবিত্র পুস্তকগুলি কি ভাববাদিগণ বা যাজকগণ ছাড়া কেউ লিখতেন বা অনুলিপি করতেন? আর কোনো অনুলিপিকার যদি ভুল করেই ফেলে তাহলে পরবর্তী ভাববাদিগণ ও যাজকগণ তা সংশোধন করলেন না কেন? ভাববাদিগণ পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপুস্তকের মধ্যে এভাবে বিভিন্ন কথা সংযোজন করতে পারলেন, কিন্তু পবিত্র পুস্তকের মধ্যে অনুলিপিকারদের এত সব বিকৃতি সংশোধন করতে পারলেন না?

"(১) পরে মোশি মোয়াবের তলভূমি হইতে নবো পর্বতে.. উঠিলেন। আর সদাপ্রভু তাঁহাকে সমস্ত দেশ, দান পর্যন্ত গিলিয়দ... দেখাইলেন (৪) আর সদাপ্রভু তাঁহাকে কাহিলেন.... (৫) তখন সদাপ্রভুর দাস মোসি সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সেই স্থানে মোয়াব দেশে মরিলেন। (৬) আর তিনি মোয়াব দেশে বৈৎপিয়োরের সম্মুখস্থ উপত্যাকাতে তাঁহাকে কবর দিলেন; কিন্তু তাঁহার কবরস্থান অদ্যাপি কেহ জানে না। (৭) মরণকালে মোশির বয়স এক শত বিংশতি বৎসর হইয়াছিল....। (৮) পরে ইস্রায়েল সন্তানগণ মোশির নিমিত্ত মোয়াবের তলভূমিতে ত্রিশ দিন রোদন করিল। ... (১০) মোশির তুল্য কোন ভাববাদী ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই।"

মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ণ কিতাবে কি মূসার মৃত্যু, শেষকৃত্য, কবর, অনুসারীদের কান্নাকাটি, তার কবর নিশ্চিহ্ন হওয়া, তাঁর পরে তাঁর মত আর কোনো নবীর আবির্ভাব না হওয়া ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত থাকবে?

আমরা মুসলিমগণ নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি যে, মূসার তাওরাত বলে কাথিত ৫ পুস্তকের সর্বশেষ অধ্যায়, দ্বিতীয় বিবরণের ৩৪ অধ্যায়টি মূসা আলাইহিস সালাম-এর রচিত নয়। শুধু তাই নয়, আমরা আরো বিশ্বাস করি যে, মূসা আলাইহিস সালাম-এর নামে প্রচলিত এ পাঁচটি পুস্তক কখনোই তাঁর লেখা নয়। এগুলিকে তার লেখা বা তার প্রদত্ত তাওরাত বলে দাবি করা বৈধ নয়। এগুলির

মধ্যে বিদ্যমান অগণিত বিকৃতি, সংযোজন, ভুলভ্রান্তি আমাদের এ বিশ্বাসের অকাট্য প্রমাণ। কোনো নবীর উপরে ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ কোনো আসমানী গ্রন্থে এরূপ কোনো ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে না। এরূপ ভুলভ্রান্তিময় একটি গ্রন্থকে কোনো নবীর নামে চালানোর অর্থ উক্ত নবীকে অপবাদ দেওয়া। অনেক ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতও অবিকল মুসলিমদের মতই এ সকল প্রমাণাদির ভিত্তিতে দাবি করেছেন যে, এ সকল পুস্তকের কোনোটিই মোশির লেখা বা মোশির দেওয়া তাওরাত নয়।

৯- ত্রিত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ইঞ্জিলের বিকৃতি:

যোহনের প্রথম পত্রের ৫ম অধ্যায়ের ৭-৮ শ্লোক নিম্নরূপ: "(৭) কারণ স্বর্গে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য সংরক্ষণ করেন: পিতা, বাক্য ও পবিত্র আত্মা; এবং তাঁহারা তিন একই। ৮. এবং পৃথিবীতে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহার সাক্ষ্য প্রদান করেন: আত্মা, জল ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই। **(For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost; and the three are one. 8. And there are three that bear witness in earth, the spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.)**[52]"

---

[52] বাংলা বাইবেলে ও ইঞ্জিল শরীফে এই বাক্যগুলি নেই। ইংরেজি ও আরবী বাইবেলের অনুসরণে অনুবাদ করা হয়েছে।

খৃস্টান পণ্ডিতগণ উল্লেখ করেছেন যে, উপরের শ্লোকদ্বয়ের এতসব কথার মধ্যে মূল বাক্যগুলি ছিল নিম্নরূপ: “বস্তুত তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন, আত্মা, ও জল, ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই।”[53]

এরপর ত্রিত্বে বিশ্বাসিগণ মূল পাঠের মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজন করেন: “স্বর্গে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য সংরক্ষণ করেন: পিতা, বাক্য ও পবিত্র আত্মা; এবং তাঁহারা তিন একই। ৮. এবং পৃথিবীতে তিন জন রহিয়াছেন...।” ত্রিত্ববাদী খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদ প্রমাণের জন্য একথাগুলিই মূল দলিল। আর এগুলি যে জাল ও অতিরিক্ত সংযোজন সে বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। ত্রিত্ববাদী গোঁড়া খৃস্টান পণ্ডিতগণও স্বীকার করেছেন যে, এ বাক্যগুলি অতিরিক্ত সংযোজন এবং এগুলিকে মুছে দেওয়া আবশ্যক। হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ হর্নের এই কথাকে সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। আদম ক্লার্কও এই বাক্যগুলিকে সংযোজিত বলে গণ্য করার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন। ক্রীসবাখ ও শোলয্, হর্ন, আদম ক্লাক, হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলকগণ ও আরো অনেকেই এ বাক্যগুলিকে জাল বলে এগুলি বাইবেল থেকে বাদ দেওয়ার দাবি করেছেন।

[53] বাংলা বাইবেলে এতটুকই উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থ-পঞ্চম খৃস্টীয় শতাব্দীর ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণের মধ্যে সবেচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন সেন্ট অগাস্টাইন **(St. Augustine)**। এখন পর্যন্ত ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ তাঁর মতের উপরেই নির্ভর করেন। তিনি যোহনের এ পত্রটির আলোচনায় দশটি পত্র লিখেছেন। এ দশটি পত্রের একটি পত্রেও তিনি এ বাক্যগুলির কথা উল্লেখ করেন নি। তিনি ছিলেন ত্রিত্বে বিশ্বাসী। আলেকজেন্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু আরিয়াসের **(Arius)** অনুসারিগণ যাঁরা ত্রিত্বে বিশ্বাস করতেন না বা একেশ্বরবাদী ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে অগাস্টাইন বিতর্ক করতেন। তাঁর সময়ে যদি উপরের এই শ্লোকদ্বয় এভাবে যোহনের পত্রের মধ্যে থাকত তবে নিশ্চয় ত্রিত্ববাদ **(trinity)** প্রমাণ করার জন্য তিনি সেগুলির উদ্ধৃতি দিতেন ও সেগুলিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করতেন।

শুধু তাই নয়, অগাস্টাইন ত্রিত্ববাদ প্রমাণ করার জন্য উপরে উল্লিখিত ৮ম শ্লোকটি: "বস্তুতঃ তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন, আত্মা, ও জল, ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই" এই কথাটির অদ্ভুত একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: এখানে জল দ্বারা পিতাকে বুঝানো হয়েছে, রক্ত দ্বারা পুত্রকে বুঝানো হয়েছে এবং আত্মা দ্বারা পবিত্র-আত্মাকে বুঝানো হয়েছে। এই ব্যাখ্যাটি খুবই দুর্বল ও অবাস্তব ব্যাখ্যা। একথা স্পষ্ট যে, উপরে উল্লিখিত ৭ম শ্লোকটি যদি যোহনের পত্রে সত্যিই থাকত তাহলে তিনি এইরূপ অবাস্তব ও দুর্বল ব্যাখ্যার

স্মরণাপন্ন হতেন না। আমার মনে হয়, যখন ত্রিত্ববাদীরা দেখলেন যে, এই ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত দুর্বল- যা দিয়ে ত্রিত্ববাদ প্রমাণ করা কঠিন- তখন তারা উপরের বাক্যগুলি তৈরি করে সেগুলিকে এই পত্রের মধ্যে সংযোজন করে দেন, যাতে সেগুলি দিয়ে তাঁদের ত্রিত্ব প্রমাণ করা সহজ হয়।

১২৭০ হিজরী সালে (১৮৫৪ খৃস্টাব্দে) ইযহারুল হক্কের প্রণেতা আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহর সাথে ড. ফান্ডার (**Carl Gottaleb Pfander**) ও তার সহযোগী পাদ্রী মি. ফ্রেঞ্চ (**T. V. French**)-এর যে প্রকাশ্য বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়, সে বিতর্কের সময় উপস্থিত সকল মানুষের সামনে পাদ্রীদ্বয় স্বীকার করেন যে, এই বাক্যগুলি বিকৃত। তাঁরা আরো স্বীকার করেন যে, বাইবেলের মধ্যে ৭/৮ স্থানে বিকৃতি ঘটেছে।

এই বাক্যটির আলোচনায় পণ্ডিত হর্ন ১২ পৃষ্ঠা লিখেছেন। হেনরি ও স্কটের ব্যাখ্যাগ্রন্থের সংকলক হর্নের সার-সংক্ষেপকে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। আমি এখানে তাঁদের সার-সংক্ষেপের সার-সংক্ষেপ উদ্ধৃত করছি। হেনরি ও স্কটের পুস্তকের সংকলকগণ বলেন:

“হর্ন উভয় পক্ষের দলিল প্রমাণাদি আলোচনা করেছেন। এরপর তিনি পুনরায় তার আলোচনার সার-সংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন। তার আলোচনার সার-সংক্ষেপ থেকে জানা যায় যে, যারা এই

বাক্যগুলিকে মিথ্যা ও জাল বলে প্রমাণ করেন তাঁরা নিম্নের বিষয়গুলির উপর নির্ভর করেন:

(১) ১৬শ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত কোনো গ্রীক পাণ্ডুলিপিতে এই বাক্যগুলির অস্তিত্ব নেই।

(২) প্রথম যুগে পরিপূর্ণ যত্ন ও গবেষণা সহকারে যে সকল বাইবেল মুদ্রণ করা হয়েছে সেগুলিতেও এই বাক্যগুলির অস্তিত্ব নেই।

(৩) একমাত্র ল্যাটিন অনুবাদ ছাড়া অন্য কোনো প্রাচীন অনুবাদে এই বাক্যগুলির অস্তিত্ব নেই।

(৪) অধিকাংশ প্রাচীন ল্যাটিন পাণ্ডুলিপিতেও এই কথাগুলি নেই।

(৫) কোনো প্রাচীন খৃস্টান পণ্ডিত বা চার্চের ঐতিহাসিক এই কথাগুলিকে প্রমাণ হিসেবে উদ্ধৃত করেন নি।

(৭) প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের নেতাগণ ও ধর্মের সংস্কারকগণ এই কথাগুলিকে ফেলে দিয়েছেন অথবা তার উপরে সন্দেহের চিহ্ন দিয়ে রেখেছেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, খৃস্টানগণ যখনই প্রয়োজন মনে করতেন তখনই তাদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সংযোজন-বিয়োজন করে বিকৃতি সাধন করতেন। মুদ্রণ-যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে বাইবেলের মধ্যে বিকৃতির দরজা ছিল উন্মুক্ত। লিপিকারগণ ও বিভিন্ন দল-উপদলের খৃস্টানগণ অতি সহজেই সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন

করতে পারতেন। মজার কথা হলো মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পরেও এ বিকৃতির ধারা থামে নি।

প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের প্রথম গুরু ও খৃস্টধর্ম সংস্কারের মূল নেতা মি. লুথার যখন এ ধর্মের সংস্কারের জন্য প্রচেষ্টা শুরু করলেন, তখন তিনি জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন যেন তাঁর অনুসারিগণ তা থেকে উপকৃত হতে পারেন। তিনি তাঁর অনূদিত বাইবেলের মধ্যে যোহনের পত্রের এ বাক্যগুলি উল্লেখ করেন নি। তাঁর জীবদ্দশাতেই কয়েকবার তাঁর অনুবাদ মুদ্রিত হয়। যখন তিনি বৃদ্ধ হলেন এবং বুঝতে পারলেন যে তাঁর আয়ূ শেষ হয়ে আসছে, তখন তিনি ১৫৪৬ সালে পুনরায় অনুবাদটির মুদ্রণ শুরু করেন। ধর্মগ্রন্থের বিকৃতির বিষয়ে ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের অভ্যাস, বিশেষত খৃস্টানগণের অভ্যাসের সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন। এজন্য তিনি এই অনুবাদের ভূমিকায় তাঁর অন্তিম নির্দেশনা প্রদান করেন: "কেউ যেন আমার এই অনুবাদটি বিকৃত না করেন।"

কিন্তু এ অন্তিম নির্দেশনাটি ছিল খৃস্টান সম্প্রদায়ের চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীত, এজন্য তাঁরা তা রক্ষা করেন নি; বরং লুথারের মৃত্যুর পরে ত্রিশ বৎসর পার না হতেই তাঁরা এই জাল ও বানোয়াট বাক্যটিকে তাঁর অনুবাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। লূথারের অনুবাদের এই বিকৃতি সর্বপ্রথম সাধিত হয় ফ্রাঙ্কফুর্টবাসীদের দ্বারা। ১৫৭৪ সালে যখন তাঁরা এই অনুবাদটি মুদ্রণ করেন তখন তাঁরা এই জাল

বাক্যটিকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু এরপর তাঁরা আবার মানুষের নিন্দার ভয়ে পরবর্তী মুদ্রণগুলিতে এ বাক্যগুলি ফেলে দেন।

ত্রিত্ববাদীরের জন্য এই বাক্যগুলি বাদ দেওয়া খুবই কঠিন ছিল। এজন্য ওটিনবুর্গের বাসিন্দারা **১৫৯৬** ও **১৫৯৯** সালে মুদ্রিত লুথারের এই অনুবাদের মধ্যে এই বাক্যগুলি ঢুকিয়ে দেন। অনুরূপভাবে হামবুর্গবাসিগণ **১৫৯৬** সালে একই কাজ করেন। এরপর ওটিনবুর্গবাসিগণ ফ্রাঙ্কফুর্টবাসিগণের মত মানুষের নিন্দার ভয় পান। ফলে পরবর্তী মুদ্রণের সময় বাক্যগুলি ফেলে দেন।

লূথারের অনুসারী ত্রিত্ববাদী প্রটেস্টান্ট খৃস্টানগণের জন্য এই বাক্যটিকে বাদ দেওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তখন লূথারের নিজের অন্তিম নির্দেশনা লঙ্ঘন করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর অনুবাদের মধ্যে এ বাক্যটি উল্লেখ করা হয়।

এ যদি হয় আধুনিক যুগের অবস্থা, তাহলে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে, যখন বাইবেলের কপি ও পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল খুবই কম[54], তখন তাঁরা কি করেছেন তা সহজেই অনুমেয়।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক আইজ্যাক নিউটন ৫০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা লিখেছেন। এই পুস্তিকাতে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, যোহনের পত্রের উপরের বাক্যগুলি বিকৃত ও সংযোজিত।

---

[54] বাইবেলের পঠন ও পাঠন সাধারণ খৃস্টানদের জন্য মূলত নিষিদ্ধ ছিল। এর পাণ্ডুলিপির সংখ্যাও ছিল খুবই কম।

এখানে উল্লেখ্য যে, আধুনিক অনেক সংস্করণে উপর্যুক্ত জাল বাক্যগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। বাংলা বাইবেলগুলিতেও এ বাক্যগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। বা টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

১০- যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বানানোর জন্য বিকৃতি:

প্রেরিতগণের কার্যবিবরণের ৮ম অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "ফিলিপ কহিলেন, সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত যদি বিশ্বাস করেন, তবে হইতে পারেন। তাহাতে তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, যীশু খৃস্ট যে ঈশ্বরের পুত্র ইহা আমি বিশ্বাস করিতেছি (**I believe that Jesus Christ is the Son of God**)।"[55]

এ বাক্যগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত। কোনো একজন ত্রিত্ববাদী 'যীশু খৃস্ট যে ঈশ্বরের পুত্র ইহা আমি বিশ্বাস করিতেছি' এ কথার দ্বারা খৃস্টের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করার জন্য এই বাক্যটি বাইবেলের মধ্যে সংযোজন করেছেন। ক্রীসবাখ ও শোলয একমত যে, বাক্যটি পরবর্তী সংযোজন। লক্ষণীয় যে, ইংরেজি রিভাইষড স্টান্ডার্ড ভার্সন (**Revised Standard Version: RVS**)-এ এ শ্লোকটি মূল পাঠ থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং টীকায় মন্তব্য করা হয়েছে।

---

[55] ইংরেজি ও আরবী বাইবেলে এই শ্লোকটি মূল পাঠের মধ্যে রয়েছে। বাংলা 'ইঞ্জিল শরীফে' এ কথাগুলি একেবারে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর বাংলা বাইবেলে কথাগুলি পাদটীকায় লেখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে: "কোনো কোনো প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এখানে এই কথাগুলি পাওয়া যায়।"

উইলিয়াম কেরি অনূদিত বাংলা বাইবেলেও এভাবে ৩৭ শ্লোকটি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং টীকায় বলা হয়েছে: "কোনো কোনো প্রাচীন অনুলিপিতে এখানে এই কথাগুলি পাওয়া যায়" ... এ কথা বলে উপরের জাল শ্লোকটি উল্লেখ করা হয়েছে।

১১-যাকোবের পুত্র রুবেনের ব্যভিচারের কাহিনীতে বিকৃতি:

আদিপুস্তকের ৩৫ অধ্যায়ের ২২ শ্লোকটি হিব্রু সংস্করণে নিম্নরূপ: "সেই দেশে ইস্রায়েলের (যাকোবের) অবস্থিতি কালে রূবেন (যাকোবের প্রথম পুত্র) গিয়া আপন পিতার বিল্হা নাম্মী উপপত্নীর সহিত শয়ন করিল, এবং ইস্রায়েল (যাকোব) তাহা শুনিতে পাইলেন।"

এখানে কিছু কথা বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃতি সাধান করা হয়েছে। হেনরি ও স্কটের ভাষ্যগ্রন্থের সংকলকগণ বলেন: ইয়াহূদীগণ স্বীকার করেন যে, এ শ্লোক থেকে কিছু কথা বাদ পড়ে গিয়েছে। গ্রীক অনুবাদে এ অপূর্ণতা নিম্নরূপে পুরণ করা হয়েছে: "এবং তাঁহার দৃষ্টিতে তা অন্যায় হইল।"

তাহলে ইয়াহূদীরাও স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, কিছু কথা বাদ পড়েছে। হিব্রু তোরাহ থেকে একটি পুর্ণ বাক্য বাদ পড়ে যাওয়া বা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াও ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের নিকট কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। তাহলে দুই একটি শব্দের বিষয়ে আর কি কথা থাকতে পারে। আর যেহেতু "ঈশ্বরের গ্রন্থের মধ্যে" এরূপ রদবদল তাদের

কাছে খুবই স্বাভাবিক কাজেই কেন তারা এখানে এরূপ বিয়োজন করলেন তা প্রশ্ন করে আর কী লাভ?

১২- ইউসূফ-ভাতৃগণের চুরির ঘটনা বর্ণনায় বিয়োজন:

ইউসূফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইয়ের ছালার মধ্যে তাঁর বাটি রাখা ও পরে তা বের করা ঘটনার বর্ণনায় আদিপুস্তকের ৪৪ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক নিম্নরূপ: "আমার প্রভু যাহাতে পান করেন ও যদ্দারা গণনা করেন, এ কি সেই বাটি নয়? এ কর্ম করায় তোমরা দোষ করিয়াছ।"

এখানে কিছু কথা বিয়োজন করা হয়েছে বা বাদ পড়ে গিয়েছে। বাইবেল ব্যাখ্যাকার হার্সলি বলেন: "এ শ্লোকের শুরুতে নিম্নের বাক্যটি সংযোজিত করতে হবে: "তোমরা কেন আমার বাটি চুরি করিলে?" গ্রীক অনুবাদ থেকে এই বাক্যটি নিয়ে হিব্রু পাঠে যোগ করতে হবে।"

১৩- মূসা আলাইহিস সালাম-এর মাতা ও ভগ্নির নাম-পরিচয় বিকৃতি:

যাত্রাপুস্তকের ৬ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে রয়েছে: "অম্রম **(Amram)** আপন পিসি যোকেবদকে বিবাহ করিলেন, আর ইনি তাঁহার জন্য হারোণকে ও মোশিকে প্রসব করিলেন।"

নিঃসন্দেহে এখানে বিয়োজন-জনিত বিকৃতি ঘটেছে। এ ক্ষেত্রে পুরাতন নিয়মের নিয়ম সকল সন্তানের নাম উল্লেখ করা। এ শ্লোক

থেকে বুঝা যায় যে, অম্রমের মাত্র দুটি পুত্রসন্তানই ছিল; অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের একজন কন্যাসন্তানও ছিল। শমরীয় সংস্করণ থেকে এ বিকৃতি বুঝা যায়। শমরীয় সংস্করণে এবং গ্রীক অনুবাদে রয়েছে: "আর ইনি তাঁহার জন্য হারোণকে, মোশিকে ও তাঁহাদের ভগিনী মরিয়মকে প্রসব করিলেন।"

তাহলে "ও তাঁহাদের ভগিনী মরিয়মকে" কথাগুলি হিব্রু তোরাহ থেকে বাদ পড়ে গিয়েছে। আদম ক্লার্ক শমরীয় ও গ্রীক সংস্করণ থেকে উপর্যুক্ত কথাগুলি উদ্ধৃত করার পরে বলেন: "কোনো কোনো শীর্ষস্থানীয় গবেষক পণ্ডিত মনে করেন যে, হিব্রু পাঠেও এই কথাগুলি ছিল।"

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, ইয়াহূদীগণ একান্তই ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে তাদের তাওরাত থেকে কয়েকটি শব্দ বাদ দিয়েছেন। শমরীয়দের তাওরাতের বিকৃতি প্রমাণ করতে অথবা খৃস্টানদের গ্রীক অনুবাদের বিকৃতি প্রমাণ করতে তারা এরূপ করেছেন।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। এ শ্লোক থেকে নিশ্চিত জানা যায় যে, মূসা আলাইহিস সালামের পিতা আপন ফুফুকে বিবাহ করেছিলেন। মূসার পিতা অম্রম (ইমরান)। অম্রমের পিতা কহাৎ। কহাতের পিতা লেবী। আর মূসার পিতা অম্রম বিবাহ করেন তার পিতা কহাতের ভগ্নি যোকাবেদ বিনত লেবীকে। উপরের শ্লোকে তা

সুস্পষ্টত বলা হয়েছে।[56] এ শ্লোকের ইংরেজি, আরবী, ফারসী, উর্দু, বাংলা বিভিন্ন ভাষার অনুবাদেও স্পষ্টত তা উল্লেখ করা হয়েছে।

মূসা আলাইহিস সালাম-এর শরীয়ত বা ব্যবস্থা মতে ফুফুকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। লেবীয় পুস্তকের ১৮/১২ ও ২০/১৯ শ্লোকে তা বলা হয়েছে। এজন্য খৃস্টানগণ এ পরিচয় গোপন করতে বিকৃতির আশ্রয় নেন। ভ্যাটিকানের পোপ অষ্টম উর্বান (**Urban**)[57]-এর সময়ে অত্যন্ত যত্ন সহকারে বাইবেলের যে আরবী সংস্করণটির অনুবাদ ও সম্পাদনা করা হয় এবং ১৬২৫ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় সে সংস্করণে এ শ্লোকটি নিম্নরূপ লেখা হয়েছে: "অম্রম আপন পিসির কন্যা যোকেবদকে বিবাহ করিলেন।"

[56] এছাড়া গণনাপুস্তকের ২৬ অধ্যায়ের ৫৯ শ্লোকে বলা হয়েছে: "ঐ কহাতের পুত্র অম্রাম। অম্রামের স্ত্রীর নাম যোকাবেদ, তিনি লেবির কন্যা, মিসরে লেবির ঔরসে তাহার জন্ম।" এখানেও অতি স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে, যোকেবদ লেবীর ঔরসজাত কন্যা। আর কহাৎ লেবির পুত্র। কাজেই তিনি অম্রামের আপন ফুফু।

[57] ১৫৬৮ সালে ইটালিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬২৩ সালে পোপের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং ১৬৪৩/১৬৪৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সময়ে ইউরোপব্যাপী ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের মধ্যে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয়। ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, সুইডেন প্রভৃতি দেশের রাজাগণ প্রটেস্টান্টদের সাহায্যে বড় বড় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। দেখুন, মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ১৭২-১৭৫।

এখানে “পিসি” বা “ফুফু” শব্দটিকে বিকৃত করে “পিসির কন্যা” (ফুফাতো বোন) বানানো হয়েছে। পরবর্তী বিভিন্ন আরবী সংস্করণে এরূপ পিসির বদলে পিসির কন্যা লেখা হয়েছে। এভাবে তারা নিজেদের মনমর্জি মত কিছু রদবদল বা পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো কোনো সংস্করণ বিকৃত করেছেন।

১৪- গীতসংহিতায় বিয়োজন বা সংযোজন করে বিকৃতি:

গীতসংহিতার ১৪ গীতের ৩য় শ্লোকের পরে- ৩ ও ৪ শ্লোকের মাঝখানে- ল্যাটিন, ইথিওপিয়, আরবী অনুবাদে এবং গ্রীক অনুবাদের ভ্যাটিকানের পাণ্ডুলিপিতে নিম্নের বাক্যগুলি রয়েছে: “তাহাদের কণ্ঠ অনাবৃত কবরস্বরূপ; তাহারা জিহবাতে ছলনা করিতেছে; তাহাদের ওষ্ঠাধরের নিম্নে কালসর্পেব বিষ থাকে; তাহাদের মুখ অভিশাপ ও কটুকাটব্যে পূর্ণ; তাহাদের চরণ রক্তপাতের জন্য ত্বরান্বিত। তাহাদের পথে পথে ধ্বংস ও বিনাশ; এবং শান্তির পথ তাহারা জানে নাই; ঈশ্বর-ভয় তাহাদের চক্ষুর অগোচর।”

এ বাক্যগুলি হিব্রু বাইবেলে নেই। কিন্তু এ কথাগুলি রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ৩/১৩-১৮ শ্লোকে রয়েছে। পৌল পুরাতন নিয়মের বক্তব্য হিসেবে এ কথাগুলিকে উদ্ধৃত করেছেন। এখানে দুটি বিষয়ের একটি অবশ্যই ঘটেছে। হয়তবা ইয়াহূদীরা মূল হিব্রু বাইবেল থেকে এ শ্লোকগুলি ফেলে দিয়েছেন। নতুবা খৃস্টানগণ তাঁদের মহাপুরুষ পৌলের বক্তব্যকে প্রমাণিত করার জন্য তাঁদের

অনুবাদের মধ্যে এই কথাগুলি সংযোজন করেছেন। প্রথম সম্ভাবনা স্বীকার করলে বাইবেলে বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃতি প্রমাণিত হয়। আর দ্বিতীয় সম্ভাবনা স্বীকার করলে বাইবেলে সংযোজন ও বৃদ্ধির মাধ্যমে জালিয়াতি প্রমাণিত হয়। সর্বাবস্থায় এখানে দু প্রকারের জালিয়াতির এক প্রকার মানতেই হবে।

১৫- লূকলিখিত সুসমাচারে বিয়োজন-জনিত বিকৃতি

যীশু খৃস্ট তার শিষ্যদেরকে কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের আগমন সম্পর্কে ও সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পর্কে কিছু উপদেশ প্রদান করেন বলে মথি, মার্ক ও লূক উল্লেখ করেছেন। লূকের বর্ণনায় কিছু কথা বাদ দেওয়া হয়েছে। লূকলিখিত সুসমাচারের ২১/৩২-৩৪ শ্লোক নিম্নরূপ: "(৩২) আমি তোমাদেরকে সত্য বলিতেছি, যে পর্যন্ত সমস্ত সিদ্ধ না হইবে সেই পর্যন্ত এই কালের লোকদের লোপ হইবে না। (৩৩) আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না। (৩৪) কিন্তু আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাকিও, পাছে ভোগপীড়ায় ও মত্ততায় এবং জীবিকার চিন্তায় তোমাদের হৃদয় ভারগ্রস্ত হয়, আর সেই দিন হঠাৎ ফাঁদের ন্যায় তোমাদের উপর আসিয় পড়ে।"

হর্ন তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন: "লূকলিখিত সুসমচারের ২১ অধ্যায়ের ৩৩ ও ৩৪ শ্লোকের মাঝখানে একটি পূর্ণ শ্লোক পড়ে গিয়েছে। মথিলিখিত সুসমাচারের ২৪ অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোক অথবা মার্ক লিখিত

সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোক থেকে কথাটি নিয়ে লূকের সুসমাচরের উপর্যুক্ত শ্লোকদ্বয়ের মাঝে সংযোজন করতে হবে।"

এরপর টীকায় বলেন: "এখানে যে বড় রকমের বিয়োজন ও বিকৃতি ঘটেছে সে বিষয়টি সকল গবেষক ও ব্যাখ্যাকার এড়িয়ে গিয়েছেন। সর্বপ্রথম হেলস-ই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।"

এ ঘটনা বর্ণনায় মথির বিবরণ (মথি ২৪/৩৪-৩৬) নিম্নরূপ: "(৩৪) আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই কালের লোকদের লোপ হইবে না, যে পর্যন্ত না এ সমস্ত সিদ্ধ হয়। (৩৫) আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইব না। (৩৬) কিন্তু সেই দিনের ও সেই দন্ডের কথা কেহই জানে না, স্বর্গের দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।"

একই ঘটনা বর্ণনায় মার্ক বলেন (মার্ক ১৩/৩০-৩২): "(৩০) আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত এ সমস্ত সিদ্ধ না হইবে, সে পর্যন্ত এ কালের লোকদের লোপ হইবে না। (৩১) আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না। (৩২) কিন্তু সেই দিনের বা সেই দন্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।"

তাহলে হর্ন-এর স্বীকৃতি অনুযায়ী লূকের সুসমাচার থেকে একটি পূর্ণ শ্লোক বাদ পড়ে গিয়েছে, যে শ্লোকটি পুনঃসংযোজন

অত্যাবশ্যক। আর সে শ্লোকটি হলো: “কিন্তু সেই দিনের বা সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।”[58]

১৬- ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণের বিদ্বেষপ্রসূত বিকৃতি:

মথিলিখিত সুসমাচারের ২য় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকটি নিম্নরূপ: “এবং নাসরৎ নামক নগরে গিয়া বসতি করিলেন; যেন ভাববদিগণের দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয় যে, তিনি নসরতীয় বলিয়া আখ্যাত হইবেন।”

“যেন ভাববাদিগণের দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয় যে, তিনি নসরতীয় বলিয়া আখ্যাত হইবেন”- এই কথাগুলি মথির সুসমাচারের অন্যতম ভুল। কারণ ভাববাদিগণের নামে প্রচলিত ও পরিচিত পুরাতন নিয়মের কোনো পুস্তকেই এ কথাটি নেই। এখানে দুটি

---

[58] বাহ্যত ইচ্ছাকৃতভাবেই এ শ্লোকটি লূকের সুসমাচার থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ এ শ্লোকটি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, যীশুখৃস্ট ঈশ্বর ছিলেন না বা ঈশ্বরের সত্ত্বার অংশ ছিলেন না। আর এজন্যই একইরূপ জালিয়াতি করা হয়েছে মথির বর্ণনার ক্ষেত্রে। “পুত্রও জানেন না” কথাটুকু ফেলে দেওয়া হয়েছে; যেন যীশুর ঈশ্বরত্ব দাবি করার কোনো বাধা না থাকে। কিং জেমস ভার্সন বা অথরাইজড ভার্সন (**KJV/AV**)-এ এ শ্লোকটি নিম্নরূপ: (**But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only**)। এখানে “পুত্রও না (**neither the Son**)” কথাটি ফেলে দেওয়া হয়েছে। রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্সনে কথাটি সংযোজন করা হয়েচে।

বিষয়ের একটি স্বীকার করতেই হবে। হয় খৃস্টানগণ ইয়াহূদীদের প্রতি বিরোধিতা ও বিদ্বেষের কারণে এ বাক্যগুলি তাদের সুসমাচারের মধ্যে সংযোজন করেছেন ইয়াহূদীদের বিকৃতি প্রমাণ করতে। তাহলে তা সংযোজনজনিত বিকৃতি বলে গণ্য হবে। অথবা ইয়াহূদীগণ তাদের ভাববাদিগণের পুস্তক থেকে এ কথাগুলি মুছে দিয়েছেন খৃস্টানদেরকে বিভ্রান্ত প্রমাণ করতে। এক্ষেত্রে তা বিয়োজন জনিত বিকৃতি বলে গণ্য হবে।

এখানে প্রাচীন খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিত "ক্রীযস্টম (**John Chrysostom: 347–407**) ও অন্যান্য খৃস্টান পণ্ডিতগণ দাবি করেছেন যে, মথির উদ্ধৃত এ কথাটি যে সকল পুস্তকে বিদ্যমান ছিল সে সকল পুস্তক সব বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভাববাদিগণের অনেক পুস্তক হারিয়ে ও বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। কারণ, ইয়াহূদীগণ তাঁদের অবহেলার কারণে- বরং তাঁদের ধর্মহীনতা ও অসততার কারণে- অনেক পুস্তক হারিয়ে ফেলেছে। কিছু পুস্তক তাঁরা ছিড়ে ফেলেছে এবং কিছু পুস্তক তাঁরা পুড়িয়ে ফেলেছে। তাঁরা যখন দেখলেন যে, যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণ এ সকল পুস্তকের কথা দিয়ে খৃস্টধর্মের বিভিন্ন বিষয় প্রমাণ করছেন, তখন তাঁরা যীশুর পক্ষের প্রমাণ বিনষ্ট করতে এ কাজ করেন। এ থেকে জানা যায় যে, মথি যে সকল পুস্তক থেকে এ কথাটি উদ্ধৃত করেছেন ইয়াহূদীরা সে পুস্তকগুলি বিনষ্ট করে ফেলেছে।

“এজন্য ট্রিফোনের (**Tryphon**) সাথে বিতর্কের সময় জাস্টিন (**Justin**)[59] বলেন: ‘ইয়াহূদীরা পুরাতন নিয়ম থেকে অনেক পুস্তক বাদ দিয়েছে, যেন প্রকাশ পায় যে, নতুন নিয়মের কথাবার্তা পুরাতন নিয়মের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।’

খৃস্টান গবেষকগণের এ সকল বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, এরূপ বিকৃতি সেযুগে খুবই সহজ ছিল। শুধু ধর্মীয় শত্রুতা ও মতপার্থক্যের কারণে কিভাবে ইয়াহূদীরা এ সকল ধর্মগ্রন্থ ছিড়ে, পুড়িয়ে বা নষ্ট করে ফেলল এবং পুস্তকগুলিকে বিনষ্ট করার ফলে কিভাবে সেগুলি পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে গেল! বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃতির এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে? একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় তাঁদের প্রবৃত্তির তাড়নায় অথবা অন্য একটি ধর্মের বিরোধিতার জন্য ঈশ্বরের বাণী ও ঐশ্বরিক প্রেরণা-লব্ধ কিছু পুস্তক একেবারে গুম করে দিলেন! এত বড় বিকৃতি কি আর হতে পারে?

ইয়াহূদীরা যদি খৃস্টধর্মের অসারতা প্রমাণের জন্য নিজেদের ধর্মগ্রন্থ বিকৃতি করতে বা গুম করে দিতে পারে এবং খৃস্টানরা যদি ইয়াহূদীদের বিরোধিতার জন্য নিজেদের ধর্মগ্রন্থে বিকৃতি করতে

---

[59] দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু ও দার্শনিক। ইহূদী ট্রিফোন খৃস্টান ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন। জাস্টিন তাকে পত্র লিখেন। দেখুন: **Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, p 135, 150-155.**

পারে তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নুবুওয়াত বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বিনষ্ট বা বিকৃত করা কি তাদের জন্য অসম্ভব বিষয়? বরং ইসলাম, মুসলিম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরোধিতায় তাদের যে উগ্রতা তাতে আমরা জোর দিয়েই দাবি করতে পারি যে, মুসলিমদের পক্ষে যে সকল পুস্তক বা কথাবার্তা ছিল সেগুলিও তাঁরা এভাবে বিনষ্ট বা বিকৃত করেছেন। কোনো যুক্তি, বিবেক বা লিখিত প্রমাণ কি এ দাবির বিরোধিতায় পেশ করা যাবে??

১. ৩. ৪. বিকৃতি বিষয়ে পাদরিগণের বিভ্রান্তিকর প্রচারণা

খৃস্টান প্রচারকগণ বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান বৈপরীত্য, ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতির কথা এড়িয়ে বিভিন্ন কথা বলে সাধারণ মুসলিমদেরকে বুঝাতে চান যে, বাইবেলের মধ্যে কোনোরূপ বিকৃতি নেই। তাদের এ জাতীয় কয়েকটি বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার আমরা এখানে আলোচনা করতে চাই।

১. ৩. ৪. ১. শুধু মুসলিমরাই বিকৃতির কথা বলে

প্রটেস্টান্ট পণ্ডিতগণের লেখনি বা আলোচনা থেকে অনেক সময় প্রকাশ পায় যে, একমাত্র মুসলিমরাই বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি ঘটেছে বলে দাবি করেন। তাদের আগে কেউ এরূপ দাবি করেন নি। সাধারণ মুসলিম, বিশেষত খৃস্টান পণ্ডিতদের বইপুস্তক যারা

পাঠ করেন নি তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁরা এ সব কথা বলেন। প্রকৃত সত্য কথা হলো, অ-খৃস্টান পণ্ডিতগণ, ভিন্নমতাবলম্বী খৃস্টানগণ এবং ধার্মিক খৃস্টানগণ সকলেই প্রাচীন যুগ থেকে বাইবেলের বিকৃতির কথা বলে আসছেন। নিম্নে আমরা তাদের কিছু মতামত উল্লেখ করছি:

১. ৩. ৪. ২. বিকৃতি বিষয়ে অমুসলিমগণের সাক্ষ্য

প্রথমত: অ-খৃস্টানগণের মতামত

(১) ২য় শতাব্দীর রোমান পণ্ডিত সেলসাসের মত

দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের একজন পৌত্তলিক পণ্ডিত ছিলেন সেলসাস (**Celsus Epicurean**)। তিনি খৃস্টধর্মের প্রতিবাদে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রসিদ্ধ জার্মান খৃস্টান-পণ্ডিত একহর্ন এ পৌত্তলিক পণ্ডিতের পুস্তক থেকে তাঁর নিম্নের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন: "খৃস্টানগণ তাদের সুসমাচারগুলি তিনবার বা চারবার বা তারও বেশিবার কঠিনভাবে পরিবর্তন করেছে, এমনকি সেগুলির বিষয়বস্তুও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।"

সম্মানিত পাঠক, তাহলে লক্ষ্য করুন, এই পৌত্তলিক পণ্ডিত জানাচ্ছেন যে, তাঁর যুগেই খৃস্টানগণ চার বারেরও বেশি বিকৃত করেছেন তাঁদের সুসমাচারগুলিকে।

(২) আধুনিক পণ্ডিত পার্কারের মত:

ঊনবিংশ শতকের প্রসিদ্ধ আমেরিকান সংস্কারক ও পাদরী থিয়োডোর পার্কার (**Theodore Parker: ১৮৬০**)। চার্চ নিয়ন্ত্রিত খৃস্টানদের দৃষ্টিতে তিনি ধর্মদ্রোহী (**Heretic**)। তিনি বলেন: "বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান ভুল ও বিকৃতি- যাকে খৃস্টান পণ্ডিতগণ ভুল, পাঠের বিভিন্নতা (**erratum, Various readings/Variety of reading**) ইত্যাদি বলে অভিহিত করেন- এরূপ ভুলের সংখ্যা মিলের হিসাব অনুযায়ী ত্রিশ হাজার।

(৩) প্রায় একশত জাল ইঞ্জিল

একজন চার্চবিরোধী খৃস্টান পণ্ডিত বাইবেলের নতুন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত পুস্তক ও পত্রাবলি ছাড়াও প্রাচীন খৃস্টান ধর্মগুরুগণ যীশুখৃস্ট, তাঁর মাতা মেরি বা তাঁর প্রেরিত শিষ্যগণ বা তাদের অনুসারিগণের নামে প্রচারিত পুস্তক ও পত্রের নাম উল্লেখ করে তালিকা তৈরি করেন। তাতে তিনি এরূপ ৭৪টি জাল ইঞ্জিল বা পত্রের নাম উল্লেখ করেছেন।

এরপর তিনি বলেন, এভাবে আমরা 'সুসমাচার', 'প্রকাশিত বাক্য' ও পত্রাবলির এক সুবিশাল ভান্ডার দেখতে পাচ্ছি। এখন পর্যন্ত অধিকাংশ খৃস্টান মনে করেন যে, এ সকল পুস্তকের অধিকাংশই সত্যিকারেই উল্লিখিত লেখকদের রচনা। তাহলে প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায় যে পুস্তক বা পত্রগুলিকে মেনে নিয়েছেন সেগুলিই যে সত্যিকারের ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ পুস্তক তা আমরা

কিভাবে জানব? এছাড়া আমার জানি যে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার আগে এ সকল 'স্বীকৃত' পুস্তকও বিকৃতি, পরিবর্তন ও সংযোজনের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এতে সমস্যা আরো ঘনীভুত হয়।

দ্বিতীয়ত: অ-গোঁড়া (**heretic**) খৃস্টানগণের মতামত

(১). প্রথম শতাব্দী থেকে এবোনাইট খৃস্টানগণের মত

প্রথম যুগের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ খৃস্টান সম্প্রদায় এবোনাইট সম্প্রদায় (**Ebionites**)। তাঁর পৌলের সমসাময়িক ছিলেন এবং পৌলের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা বলতেন যে, পৌল ধর্মত্যাগী।[60] এই সম্প্রদায়ের খৃস্টানগণ মথির সুসমাচারটি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাঁদের নিকট সংরক্ষিত মথিলিখিত সুসমাচারটির সাথে বর্তমানে পৌলের অনুসারী খৃস্টানগণের নিকট প্রচলিত 'মথিলিখিত সুসমাচারের' অনেক স্থানেই মিল নেই। প্রচলিত 'মথি'-র প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়দ্বয় তাঁদের 'মথি'র মধ্যে ছিল না। এবোনাইটদের মতে এ দু অধ্যায় ও অন্যান্য অনেক স্থানে অনেক কথা জাল ও

---

[60] এবোনাইট খৃস্টানগণ যীশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করতেন। তাঁরা যীশুকে অন্য দশজন মানুষের মতই একজন মানুষ ও ভাববাদী বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের মতে যীশুর নির্দেশ অনুসারে খৃস্টানদের জন্যও 'মোশির ব্যবস্থা' বা মূসার শরীয়ত পালন করা আবশ্যকীয়। পৌলই সর্বপ্রথম মোশির ব্যবস্থা রহিত করে দেন। তিনি দাবি করেন যে, শুধু বিশ্বাসেই মুক্তি; কাজেই ব্যবস্থা বা শরীয়ত পালন করা উচিত নয়। যে শরীয়ত বা ব্যবস্থা পালন করবে সে যীশুর প্রেম বা দয়া লাভ করতে পারবে না... ইত্যাদি। এজন্য এবোনাইট খৃস্টানগণ পৌলকে ধর্মত্যাগী বলে গণ্য করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে কর্মহীন ভক্তির মূল্য বেশী। এজন্য শেষ পর্যন্ত পৌলীয় ধর্মই প্রসার লাভ করে।

বানোয়াট। তারা যীশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করত না; বরং তাঁকে মানুষ ও রাসূল বলে বিশ্বাস করত।

(২). দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে মারসিওনীয় খৃস্টানগণের মত

দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ আধ্যাত্মবাদী (**Gnostic**) খৃস্টান সম্প্রদায় 'মারসিওনীয় সম্প্রদায়[61]'। তাঁরা পুরাতন নিয়মের কোনো পুস্তকই মানতেন না। তাঁরা বলতেন যে, এগুলি কোনোটিই ঐশ্বরিক প্রেরণা-লব্ধ পুস্তক নয়। অনুরূপভাবে তাঁরা নতুন নিয়মের সকল পুস্তক অস্বীকার করতেন। কেবল লূকলিখিত সুসমাচার এবং পৌলের পত্রাবলি থেকে ১০টি পত্র তাঁরা ঐশ্বরিক বলে মানতেন। আর তাঁদের স্বীকৃত এ সুসমাচার ও পত্রাবলিও বর্তমানে প্রচলিত সুসমাচার ও পত্রাবলি থেকে ভিন্ন। লূকের সুসমাচারের প্রথম দুটি অধ্যায়কে তারা জাল বলে গণ্য করত। এছাড়াও এ সুসমাচারের আরো অনেক বিষয় তারা অস্বীকার করত। লার্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে এরূপ ১৪টি স্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। বেল উল্লেখ করেছেন যে, এ খৃস্টান সম্প্রদায় দুটি ঈশ্বরে বিশ্বাস করত: একজন মঙ্গলের ঈশ্বর ও অন্যজন অমঙ্গলের ঈশ্বর। তারা বিশ্বাস করত যে, তাওরাত ও পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তক অমঙ্গলের ঈশ্বরের প্রদত্ত; কারণ তা নতুন নিয়মের বিপরীত।

---

[61] আধ্যাত্মবাদি গুরু মারসিওনের (**Marcion**) অনুসারী।

(৩) তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী থেকে মানিকীয় সম্প্রদায়ের মত

তৃতীয় খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ ধর্ম প্রচারক মানী **(Manes/Mani)** ও তাঁর অনুসারী মানিকীয় সম্প্রদায় **(Manichees/ Manichaen/ Manichean)** নিজেদেরকে খৃস্টের অনুসারী ও খৃস্টান বলে দাবি করতেন। এ সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ অস্ট্রীয় পণ্ডিত ফাস্টিস। তিনি চতুর্থ শতাব্দীর মানুষ। তিনি ইঞ্জিলগুলির বিকৃতির বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন। লার্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধতম খৃস্টান পণ্ডিত সেন্ট অগাস্টাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, ফাস্টিস বলেন: আপনাদের পিতা ও পিতামহগণ ষড়যন্ত্র করে নতুন নিয়মের পুস্তকাবলির মধ্যে যে সকল বিষয় সংযোজন করেছেন আমি সেগুলির নিন্দা করি ও প্রত্যাখ্যান করি। এরূপ জালিয়াতির মাধ্যমে তাঁরা নতুন নিয়মের সুন্দর অবস্থাকে দুষিত ও ত্রুটিময় করেছেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট করেছেন। আর এ কথা তো সুনিশ্চিত যে, খৃস্ট বা তাঁর প্রেরিত শিষ্যগণের কেউই নতুন নিয়ম রচনা করেন নি বরং একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি তা রচনা করে প্রেরিতগণ ও প্রেরিতগণের সঙ্গীদের নামে চালিয়েছে। কারণ এই অজ্ঞাতনামা লেখক ভয় পেয়েছিল যে, সাধারণ মানুষেরা তাঁর লেখা পুস্তক গ্রহণ করবেন না। তারা ভাববেন যে, এ লেখক যীশুর যে সকল বিবরণ লিখেছেন সেগুলি প্রত্যক্ষ করে বা ভালভাবে জেনে লিখে নি। এ ভয়ে সে

বইগুলি লিখে প্রেরিতগণ বা তাঁদের শিষ্যগণের নামে চালিয়েছে। এ অপকর্মের মাধ্যমে লোকটি যীশুর অনুসারী ও প্রেমিকগণকে অত্যন্ত কঠিন কষ্ট দিয়েছে। কারণ সে অগণিত ভুল ও বৈপরীত্যে ভরা কিছু বই লিখেছে।

এ হলো নতুন নিয়ম সম্পর্কে এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস। তাঁদের এই পণ্ডিত যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন সেগুলির অন্যতম:

(১) ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ নতুন নিয়মের মধ্যে অনেক কিছু সংযোজন ও জালিয়াতি করেছেন।

(২) এ পুস্তকগুলি প্রেরিতগণ বা তাদের সঙ্গীদের রচিত নয় বরং একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি সেগুলি রচনা করেছেন।

(৩) এগুলি অগণিত ভুল ও বৈপরীত্যে পূর্ণ।

লার্ডনার তার বাইবেল-ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন যে, ঐতিহাসিকগণ একমত যে, মানিকীয সম্প্রদায় পুরাতন নিয়মের কোনো পুস্তককেই স্বীকার করত না; উপরন্তু তারা বিশ্বাস করত যে, শয়তান মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে কথা বলেছিল এবং ইয়াহূদী নবীগণকে প্রবঞ্চনা করেছিল। তারা ইয়াহূদী নবীগণকে চোর ও দস্যু বলে আখ্যায়িত করত।[62]

---

[62] যোহনলিখিতি সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে যীশু বলেন: "যাহারা আমার পূর্বে আসিয়াছিল, তাহারা সকলে চোর ও দস্যু, কিন্তু মেষেরা তাহাদের রব শুনে নাই।" খৃস্টের এই কথার ভিত্তিতেই তাঁরা এভাবে পূর্ববর্তী

উপরের দুইটি অনুচ্ছেদ থেকে একথা প্রমাণিত হলো যে, অ-খৃস্টানগণ এবং এবং খৃস্টানগণের মধ্যে অনেক সম্প্রদায়, যাদেরকে গোঁড়া খৃস্টানগণ অ-ধার্মিক বা বিভ্রান্ত বলে মনে করেন তাঁরা সেই প্রথম শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত উচ্চরবে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি ও জালিয়াতি ঘটেছে।

তৃতীয়ত: প্রসিদ্ধ গোঁড়া খৃস্টানগণের মতামত

তৃতীয় পর্যায়ে আমরা বাইবেলের বিকৃতির বিষয়ে মূলধারার গোঁড়া খৃস্টান সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ বাইবেল ব্যাখ্যাকার ও ঐতিহাসিকদের বক্তব্য উদ্ধৃত করব। বস্তুত বাইবেলের বিকৃতির বিষয়ে প্রায় সকল খৃস্টান গবেষকই একমত। কিন্তু খৃস্টধর্ম প্রচারকগণ এগুলি গোপন করার চেষ্টা করেন। এখানে সামান্য কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করা হচ্ছে:

(ক) আদম ক্লার্ক তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৩৬৯ পৃষ্ঠায় বলেন: "প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত রীতি হলো, অনেকেই মহান ব্যক্তিদের ইতিহাস রচনা করেন। প্রভু যীশুর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা ছিল (অনেকেই তাঁর ইতিহাস রচনা করেছেন।) কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ বর্ণনা ছিল অসত্য। অনেক বিষয় যা কখনোই ঘটেনি সেগুলি নিশ্চিত ঘটেছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেছেন। অন্য অনেক

ভাববাদিগণকে 'চোর ও দস্যু' বা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত বলে বিশ্বাস করত।

ঘটনা ও অবস্থার বর্ণনায় তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করেছেন। এ কথা সুপ্রমাণিত ও সুনিশ্চিত যে, প্রথম খৃস্টীয় শতাব্দীতে অনেক মিথ্যা সুসমাচার প্রচলিত ছিল। সত্তরেরও বেশি এরূপ মিথ্যা সুসমাচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সকল সুসমাচারের অনেক অংশ এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। ফ্যাবারিসিয়াস এসকল মিথ্যা সুসমাচার একত্রে সংকলন করে তিন খণ্ডে মুদ্রণ করেছেন।

(খ) পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি পুস্তক মোশির রচিত বলে বর্তমানে প্রসিদ্ধ। এছাড়াও আরো ছয়টি পুস্তক তাঁর রচিত বলে প্রচারিত ও পরিচিত ছিল। পুস্তকগুলির নাম নিম্নরূপ:

1. মোশির নিকট প্রকাশিত বাক্য।
2. ক্ষুদ্র আদিপুস্তক (**Genesis Apocryphon**)।
3. উর্ধ্বারোহণ পুস্তক (**The Assumption of Moses**)।
4. রহস্য পুস্তক।
5. প্রতিজ্ঞা বা নিয়ম পুস্তক (**Testament**)।
6. স্বীকৃতি পুস্তক।

হর্ন বলেন: "ধারণা করা হয় যে, খৃস্টধর্মের শুরুর দিকে, অর্থাৎ খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এ সকল জাল পুস্তকগুলি রচনা করা হয়েছে।"

(গ) ঐতিহাসিক মোশিম বলেন: প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে একটি কথা প্রসিদ্ধ ছিল। কথাটি হলো: 'সত্যের বৃদ্ধির জন্য ও

ঈশ্বরের উপাসনার জন্য মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনা শুধু বৈধ-ই নয় উপরন্তু তা প্রশংসনীয় বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।' খৃস্টের আগমনের পূর্বেই এই কথাটি তাঁদের থেকে প্রথমে মিসরের ইয়াহূদীরা শিক্ষালাভ করে। অনেক প্রাচীন পুস্তক থেকে এ কথা নিশ্চিতরূপে জানা যায়। এরপর এ ঘৃণিত মহামারী খৃস্টানগণের মধ্যে প্রভাব ফেলে। মহান ধর্মগুরুদের নামে জালিয়াতি করে প্রচারিত বিপুল সংখ্যক পুস্তক থেকে এ কথা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।"

তাহলে আমরা জানতে পারছি যে, খৃস্টের পূর্বেই ইয়াহূদীদের নিকট মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা ধর্মীয়ভাবে প্রসংশনীয় কর্মে পরিণত হয়। এরপর দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীতে খৃস্টানদের নিকটেও এভাবে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা প্রশংসনীয় ধর্মীয় কাজে পরিণত হয়। অতএব জালিয়াতি, বিকৃতি ও মিথ্যার কোনো সীমারেখা কোথাও ছিল না। তাঁরা যা করার সবই করেছেন।[63]

---

[63] এখানে উল্লেখ্য যে, প্রচলিত ত্রিত্ববাদী খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পল **(Paul)** এ মতের একনিষ্ঠ অনুসারী ও প্রচারক ছিলেন। তিনি সগৌরবে স্বীকার করেছেন যে, তিনি ঈশ্বরের গৌরবার্থে ও সত্যের বৃদ্ধির জন্য মিথ্যা বলেন এবং এরূপ মিথ্যা বলাতে কোনো পাপ হয় না। বাইবেলের নতুন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পত্রে তিনি লিখেছেন: **"For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner?** কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত

(ঘ) লার্ডনার তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন: "(৬ষ্ঠ শতাব্দীতে) রোমান সম্রাট আনাসতেসিয়াস (**Anastasius I:491-518**)-এর যুগে, অজ্ঞাতপরিচয় লেখকের রচিত হওয়ার কারণে পবিত্র সুসমাচারগুলিকে অশুদ্ধ বলে সম্রাটের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়। তখন এগুলিকে পুনরায় সংশোধন করা হয়।"

সুসমাচারগুলি যদি প্রকৃতই ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ হতো এবং উক্ত সম্রাটের যুগে বিদ্যমান প্রাচীন খৃস্টান পণ্ডিতগণের নিকট বিশুদ্ধ সুত্রে প্রমাণিত হতো যে পুস্তকগুলি অমুক, অমুক প্রেরিত বা তাঁদের অমুক অনুগামীর রচিত, তবে 'অজ্ঞাত পরিচয় লেখকের রচনা' বলে সেগুলিকে অশুদ্ধ ঘোষণা করার কোনো অর্থ থাকতো না। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, সে যুগের খৃস্টানগণের নিকট সেগুলির লেখকের বিষয়ে কোনো প্রমাণিত তথ্য ছিল না। এ ছাড়া তাঁরা পুস্তকগুলিকে ঐশ্বরিক প্রেরণালব্ধ বলেও মনে করতেন না। এজন্য তাঁরা যথাসাধ্য সেগুলির সংশোধন করেছেন এবং ভুলভ্রান্তি ও বৈপরীত্য দূর করেছেন। এভাবে বিকৃতির ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে। এখানে বাইবেলের বিকৃতি যেমন প্রমাণিত হলো, তেমনি প্রমাণিত হলো যে,

---

হইতেছি কেন?" (রোমান ৩/৭)। এ নীতির ভিত্তিতেই 'সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য' বা 'ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশের জন্য' পল নিজে মিথ্যাচারের মাধ্যমে খৃস্টধর্মকে বিকৃত করেছেন। এ নীতির অনুসরণেই বাইবেল বিকৃত করাকে ভাল কাজ বলে গণ্য করতেন পূর্ববর্তী খৃস্টান পন্ডিতগণ।

সেগুলির গ্রহণযোগ্যতার কোনো প্রমাণ বা সূত্র পরম্পরা নেই। সকল প্রশংসাই আল্লাহর নিমিত্ত।

(ঙ) চতুর্থ শতকের শ্রেষ্ঠ খৃস্টান পণ্ডিত ও ধর্মগুরু অগাস্টাইন **(St. Augustine)** এবং অন্যান্য প্রাচীন খৃস্টান ধর্মজ্ঞ পণ্ডিত বলেছেন যে, গ্রীক অনুবাদকে অগ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে ইয়াহূদীরা হিব্রু বাইবেলকে বিকৃত করে। ১৩০ খৃস্টাব্দে ইয়াহূদীরা এ বিকৃতি সাধন করে। হেলয, কেনিকট ও অন্যান্য আধুনিক গবেষক প্রাচীণ ধর্মগুরুগণের সাথে একমত পোষণ করেছেন। কেনিকট অকাট্য প্রমাণাদি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, ইয়াহূদীগণ শমরীয়দের সাথে শত্রুতার কারণে তাদের নিজেদের তাওরাতে বিকৃতি সাধন করে; যাতে শমরীয়দের নিকট সংরক্ষিত তাওরাত ভুল বলে প্রমাণিত হয়।

(চ) হার্সলি তাঁর বাইবেল-ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, 'বাইবেলের পাঠ বিকৃত হয়েছে' এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিভিন্ন সংস্করণ ও পাণ্ডুলিপির বৈপরীত্য থেকেও এ কথা স্পষ্টত জানা যায়। বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে যে সকল অত্যন্ত আপত্তিকর ও খারাপ কথা বিদ্যমান সেগুলি থেকে বিকৃতির এ বিষয়টি সুদৃঢ় বিশ্বাসের কাছাকাছি চলে যায়। একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, নেবুকাদনেজারের ঘটনার পরে, বরং তার সামান্য কিছু আগে থেকেই মানুষদের নিকট হিব্রু বাইবেলের যে উদ্ধৃতি ও অংশগুলি ছিল তা ছিল বিকৃতির চূড়ান্ত পর্যায়ে।

(ছ) ওয়াটসন বলেন, অনেক যুগ আগেই ওরিগন এ সকল বৈপরীত্যের বিষয়ে অভিযোগ- আপত্তি প্রকাশ করতেন। তাঁর মতে এ সকল বৈপরীত্যের বিভিন্ন কারণ ছিল। যেমন লেখকদের অবহেল ও অমনোযোগ, তাঁদের অসততা ও অসদেচ্ছা, তাদের বেপরোয়া ভাব ইত্যাদি। জিরোম (**Jerome**) বলেন, আমি যখন নতুন নিয়মের অনুবাদ করার ইচ্ছা করলাম, তখন আমি আমার নিকট সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিটি মিলিয়ে দেখলাম। এতে আমি ভয়ানক বৈপরীত্য দেখতে পেলাম। আদম ক্লার্ক বলেন, "জিরোমের (**Jerome**) যুগের (৫ম শতকের) পূর্ব থেকেই বাইবেলের অনেক ল্যাটিন অনুবাদ প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন অনুবাদক এগুলি লিখেছিলেন। কোনো কোনো অনুবাদ ছিল বিকৃতির চূড়ান্ত পর্যায়ে। এগুলির একস্থানের বক্তব্য অন্য স্থানের বিপরীত ছিল। জিরোম এ সকল বিষয় উল্লেখ করেছেন।"

(জ) খৃস্টান সন্যাসী (**monk**) ফিলিপস কোয়াডনলস 'খায়ালাত' (খেয়ালগুলি) নামে একটি বই লিখেন। ১৬৪৯ খৃস্টাব্দে বইটি (রোমে) মুদ্রিত হয়েছে। এই পুস্তকে তিনি বলেন: "পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলির বিকৃতির সংখ্যা খুবই বেশি। ইয়াহূদীদের বিকৃতি প্রমাণ করার জন্যই আমরা খৃস্টানগণ এ সকল পুস্তকের সংরক্ষণ করেছি, আমরা তাঁদের জালিয়াতির স্বীকৃতি প্রদান করি না।"

(ঝ) প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস (**James**)[64]-এর নিকট এ মর্মে দরখাস্ত পেশ করা হয় যে, "আমাদের প্রার্থনা গ্রন্থের মধ্যে যাবূরের যে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করা রয়েছে সেগুলির সাথে হিব্রু যাবুরের অনেক পার্থক্য। সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে কমবেশি ২০০ স্থানে এই পার্থক্য করা হয়েছে।"

(ঞ) ইংরেজ ঐতিহাসিক মি. টমাস কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১) বলেন: "ইংরেজি অনুবাদকগণ বাইবেলের মূল বক্তব্য নষ্ট করেছেন, সত্য গোপন করেছেন, অজ্ঞদেরকে ধোঁকা দিয়েছেন এবং নতুন নিয়মের পুস্তকাবলির সহজ সরল অর্থকে বক্র করেছেন। তাঁদের কাছে আলোর চেয়ে অন্ধকার এবং সত্যের চেয়ে মিথ্যাই বেশি প্রিয়।"

---

[64] ইংল্যান্ডের প্রটেস্ট্যন্ট রাজা। তাঁর মাতা মেরি ছিলেন স্কটল্যান্ডের রাণী। তাঁর মাতা সিংহাসন ত্যাগ করলে তিনি স্কটল্যান্ডের রাজা হন। এরপর তিনি ইংল্যান্ডের রাজা হন। তাঁর মাতা ক্যাথলিক ছিলেন। এজন্য তিনি তাঁর মাতাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন। তাঁরই সময়ে প্রটেস্টান্ট ধর্মমতের ভিত্তিতে বাইবেলের 'সংশোধিত' ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়, যা **Authorised Version ((AV)** বা **King James Version (KJV)** নামে পরিচিত। জেমস ১৬০৩ থেকে ১৬২৫ সালে মৃত্যু পর্যন্ত ইংল্যান্ডের রাজা ছিলেন।

(ট) নতুন অনুবাদ কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মি. প্রোটন বলেন: ইংল্যন্ডে বর্তমানে প্রচলিত অনুবাদটি ভুলভ্রান্তিতে ভরা। তিনি পাদরীদেরকে বলেন: "আপনাদের প্রসিদ্ধ ইংরেজি অনুবাদটিতে পুরাতন নিয়মের বক্তব্য ৮৪৮ স্থানে বিকৃত করা হয়েছে। এ বিকৃতিগুলিই ছিল অনেক মানুষের বাইবেল অস্বীকারের কারণ।

বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান বৈপরীত্য, ভুল, ও বিকৃতির আলোচনায় আমরা আরো অনেক প্রসিদ্ধ গোঁড়া খৃস্টান পণ্ডিতের এ বিষয়ক আরো অনেক মতামত দেখেছি। বস্তুত বাইবেলের বিকৃতির বিষয়টি সকল গবেষকই স্বীকার করেন। অনেকে গোঁড়ামি করে সাধারণ মূলনীতি হিসেবে বিকৃতির কথা অস্বীকার করলেও বাস্তবে যখন বাইবেলের এ সকল বৈপরীত্য ও ভুল তথ্যের সম্মুখিন হন তখন বিকৃতির বিষয়টি মেনে নেন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, মুসলমানগণ ছাড়াও খৃস্টান ও অখৃস্টান সকলেই বাইবেলের বিকৃতির কথা বলেছেন। এখন আমরা খৃস্টান পণ্ডিতগণ বিকৃতির যে সকল কারণ উল্লেখ করেছেন তা পর্যালোচনা করব।

১. ৩. ৪. ৩. বাইবেলে বিকৃতির কারণাদি

হর্ন তাঁর বাইবেল ব্যাখ্যাগ্রন্থে **Various readings** বা বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান পাঠের বিভিন্নতার চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন:

প্রথম কারণ: "লিপিকারের[65] অসতর্কতা ও ভুল"

বিভিন্ন ভাবে তা ঘটতে পারে।

প্রথমত, লিপিকারকে যিনি বলেছিলেন তিনি এভাবেই বলেছিলেন, অথবা লিপিকার তাঁর কথা ঠিকমত বুঝতে পারেন নি, ফলে ভুল লিখেছেন।

দ্বিতীয়ত, হিব্রু ও গ্রীক বর্ণগুলি অনেকটা একইরূপ ছিল। এজন্য লিপিকার একটির স্থানে আরেকটি লিখেছেন।

তৃতীয়ত, লিপিকার হয়ত ভেবেছেন যে, বিভক্তি-চিহ্ন বা স্বরচিহ্ন জ্ঞাপক আংশিক বর্ণ ব্যবহারে ভুল হয়েছে, অথবা তিনি মূল বক্তব্য বুঝতে পারেন নি, ফলে তিনি সংশোধন করার উদ্দেশ্যে ভুলের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন।

চতুর্থত, লেখক লিখতে যেয়ে ভুলে একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলে গিয়েছেন। যখন বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন তখন আর লিখিত কথাগুলি মুছতে রাজি হন নি বরং যা লেখা হয়ে গিয়েছিল তা ঠিক সেভাবেই রেখে দিয়ে যে স্থান থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল সেই স্থান থেকে লিখতে শুরু করেছেন।

---

[65] যে কোনো ব্যক্তির জন্য বাইবেল বা পবিত্র পুস্তক লেখার কোনো সুযোগ ছিল না। শুধুম বিশেষভাবে ধর্মশিক্ষাপ্রাপ্ত ধর্মগুরু পন্ডিতগণই এগুলি লিখতেন। তাঁদেরকে 'লিপিকারগণ' বা **'scribes'** হিব্রুতে 'সোফেরিম **(soferim)** বলা হতো।

পঞ্চমত, লেখক লিখতে লিখতে কিছু কথা বাদ দিয়ে ফেলেন। এরপর অন্য কিছু লেখার পরে পূর্ববর্তী স্থানে বাদ দেওয়ার বিষয়টি তাঁর কাছে ধরা পড়ে। তখন তিনি পরবর্তী যে কথাগুলি লেখা হয়েছে তার পরে বাদ পড়া কথাগুলি লিখেন। এতে এক স্থানের কথা অন্য স্থানে চলে যায়।

ষষ্ঠত, লেখকের দৃষ্টি এক লাইন থেকে অন্য লাইনে সরে যায়, ফলে কিছু কথা বাদ পড়ে যায়।

সপ্তমত, লেখক সংক্ষেপিত শব্দগুলির অর্থ বুঝতে ভুল করেন, ফলে তিনি তাঁর নিজের বুঝ অনুসারে তা পুরোপুরি লিখেন। এভাবে ভুলের মধ্যে নিপতিত হন।

অষ্টমত, লেখক বা লিপিকারের অজ্ঞতা ও অবহেলা ছিল পাঠের বিভিন্নতা (**Various readings**) সৃষ্টির অন্যতম বড় কারণ। তাঁরা টীকার বক্তব্য বা ব্যাখ্যাকে মূল পুস্তকের অংশ মনে করে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন।

দ্বিতীয় কারণ: "মূল কপির অসম্পূর্ণতা"

যে কপি থেকে লিপিকার অনুলিপি করেছেন সেই কপির অসম্পূর্ণতার ফলে বিভিন্নভাবে 'পাঠের বিভিন্নতা' ঘটতে পারে বলে বুঝা যায়:

প্রথমত, অক্ষরের বিভক্তি-চিহ্ন বা স্বরচিহ্ন মুছে যাওয়া।

দ্বিতীয়ত, এক পৃষ্ঠার বিভক্তি-চিহ্ন বা স্বরচিহ্ন পৃষ্ঠার উল্টো পিঠে ফুটে উঠেছে এবং উল্টো পৃষ্ঠার অক্ষরের সাথে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছে। ফলে এই চিহ্নগুলিকে এ পৃষ্ঠার অংশ মনে করা হয়েছে। লিপিকার একে এ পৃষ্ঠার চিহ্ন মনে করে তার বুঝ মত তা লিখেছেন।

তৃতীয়ত, পরিত্যক্ত অনুচ্ছেদটি কোনোরূপ চিহ্ন ছাড়াই টীকায় লেখা ছিল। লেখক বুঝতে পারেন নি যে, অনুচ্ছেদটি কোথায় লিখতে হবে। এতে তিনি ভুল করেছেন।

তৃতীয় কারণ: "কাল্পনিক সংশোধন ও পরিমার্জন"

বিভিন্নভাবে এরূপ আন্দাজ-অনুমান ভিত্তিক সংশোধন ঘটেছে:

প্রথমত, একটি বিশুদ্ধ ও সঠিক বক্তব্যকে লিপিকার অসম্পূর্ণ বলে মনে করেছেন অথবা তার অর্থ হৃদয়ঙ্গমে ভুল করেছেন। অথবা তিনি মনে করেছেন যে, বাক্যটি ভুল, অথচ বাক্যটি মূলত ভুল নয়। এজন্য এই লিপিকারের সংশোধনই মূলত ভুলের সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো গবেষক পাণ্ডুলিপি সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করেন নি। তারা ভুল সংশোধনকেই যথেষ্ঠ মনে করেন নি। বরং তাঁরা মূল পাণ্ডুলিপির দুর্বল বাক্য মুছে ফেলে দিয়ে সেখানে সবল ও বিশুদ্ধ বাক্য লিখেছেন। অতিরিক্ত কথাগুলি ফেলে দিয়েছেন। একাধিক সমার্থক শব্দের মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝতে না পারলে অতিরিক্ত শব্দগুলি ফেলে দিয়েছেন।

তৃতীয়ত, পরস্পর সম্পর্কিত বক্তব্যসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন। এক স্থানের বক্তব্যের সাথে অন্য স্থানের বক্তব্যের যেন অমিল না থাকে এজন্য তাঁরা বক্তব্যের কাটছাট করে উভয়ের মধ্যে অর্থগত সমন্বয় সাধন করতেন। পাঠের বিভিন্নতা ঘটার এটিই সবচেয়ে বড় কারণ। নতুন নিয়মের পুস্তকাবলিতে এইরূপ কার্য বেশি সাধিত হয়েছে। এজন্য পৌলের পত্রাবলির মধ্যে পরবর্তী সংযোজন বেশি ঘটেছে। গ্রীক অনুবাদের সাথে পৌলের বক্তব্যের অর্থগত সমন্বয় সৃষ্টির জন্য তাঁরা এইরূপ করেছেন।

চতুর্থত, কোনো কোনো গবেষক পণ্ডিত নতুন নিয়মকে ল্যাটিন অনুবাদের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন।

চতুর্থ কারণ: "ইচ্ছাকৃত বিকৃতি"

পণ্ডিত হর্ন বলেন, নিজের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কেউ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বাইবেলের বিকৃতি করেছেন, ফলে পাঠের বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এ সকল ইচ্ছাকৃত বিকৃতিকারীদের অনেকেই ছিলেন বিভ্রান্ত (**heretic**) সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং কেউ ছিলেন মূলধারার ধর্মপ্রাণ গোঁড়া খৃস্টান। তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলি নিরসন করতে মূলধারার অনেক গোঁড়া ধর্মপ্রাণ ও সৎ খৃস্টান বাইবেলের মধ্যে কিছু স্থানে ইচ্ছাকৃত বিকৃতি সাধন করেছেন। পরবর্তীকালে অনেকেই এ সকল ধার্মিক খৃস্টানদের ইচ্ছাকৃত বিকৃতিগুলিকে সমর্থন করতেন ও অগ্রাধিকার প্রদান

করতেন। কারণ এগুলি দিয়ে কোনো সঠিক বিষয়কে সমর্থন করা হতো অথবা সে বিষয়ক কোনো আপত্তিকে খণ্ডন করা হতো। পণ্ডিত হর্ন ধার্মিক গোঁড়া খৃস্টানদের বিকৃতির অনেক উদাহরণ উল্লেখ করেছেন।

হর্নের সংক্ষেপিত বক্তব্য এখানেই শেষ।

তাঁর কথা থেকে প্রমাণিত হলো যে, লিপিকারদের অজ্ঞতা ও অবহেলার কারণে টীকার বক্তব্য মূল পাঠে প্রবেশ করেছে, প্রমাণিত হলো যে, সংশোধনকারিগণ তাঁদের ধারণামত যে সকল কথা ভুল মনে করেছেন সেগুলি সংশোধন করেছেন, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ভুল হোক বা নাই হোক, প্রমাণিত হলো যে, তাঁরা দুর্বল বাক্যগুলি বাদ দিয়ে তদস্থলে বিশুদ্ধ বাক্য লিখেছেন এবং সমার্থক ও অতিরিক্ত কথা ফেলে দিয়েছেন, প্রমাণিত হলো যে, বিশেষত নতুন নিয়মের মধ্যে তাঁরা বিভিন্ন স্থানের বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য পরিবর্তন করেছেন, আর এজন্যই পৌলের পত্রাবলিতে সংযোজন বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রমাণিত হলো যে, কোনো কোনো গবেষক পণ্ডিত নতুন নিয়মকে ল্যাটিন অনুবাদের সাথে মেলানোর জন্য পরিবর্তন করেছেন, প্রমাণিত হলো যে, বিভ্রান্ত সম্প্রদায়গণ ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃতি সাধন করেছেন, প্রমাণিত হলো যে, ধার্মিক ও সৎ খৃস্টানগণ বিভিন্ন মত সমর্থন বা আপত্তি খণ্ডনের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃতি সাধন করতেন এবং পরবর্তী যুগে তাঁদের এ সকল বিকৃতিকে

সমর্থন করা হতো.... এ সব কিছু প্রমাণিত হওয়ার পরে বিকৃতির আর কোনো সুক্ষ্ম পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া কি বাকি থাকল?

এখন একথা দাবি করা কি অন্যায় ও অযৌক্তিক হবে যে, ক্রুশের পূজারী খৃস্টানগণ যারা ক্রুশের উপাসনা এবং এর মাধ্যমে অর্জিত মর্যাদা ও ক্ষমতা পরিত্যাগ করতে মোটেও রাজি ছিলেন না, তাঁরা ইসলামের আবির্ভাবের পরে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের স্বপক্ষে যেতে পারে এরূপ আরো কিছু কথা বিকৃত করেছেন? এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগে তাঁদের এ সকল বিকৃতি সমর্থন করা হয়েছে এবং অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে, যেমনভাবে বিভিন্ন খৃস্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের বিকৃতিকে সমর্থন করা হয়েছে বরং বিভিন্ন খৃস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিরোধের জন্য বিকৃতির চেয়ে ইসলামের প্রতিরোধের জন্য বিকৃতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ছিল অনেক বেশি। কাজেই এই বিকৃতির সমর্থনও অনেক বেশি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

১. ৩. ৪. ৪. যীশু খৃস্টের সাক্ষ্য

বিকৃতি অপ্রমাণিত করতে ও বাইবেলের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করতে পাদরিগণের দ্বিতীয় বিভ্রান্তিকর প্রচারণা এই যে, স্বয়ং যীশু খৃস্ট পুরাতন নিয়মের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন।[66] সেগুলি যদি বিকৃত

---

[66] যীশু বলেন: "কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে

হতো তবে নিশ্চয় তিনি তা বলতেন বরং সেক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ব ছিল ইয়াহূদীদের সামনে বিকৃতি প্রমাণ করে তাদেরকে তা স্বীকারে বাধ্য করা।

নিম্নের বিষয়গুলি এই বিভ্রান্তির অপনোদন করবে:

১. ৩. ৪. ৫. যীশুর বক্তব্য বনাম বাইবেলের প্রামাণ্যতা

(ক) যীশুর সাক্ষ্য মোটেও প্রমাণিত নয়

প্রথম পর্যায়ে আমরা বলব যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মের কোনো পুস্তকের লেখকের যুগ থেকে সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রচলিত হওয়ার কথা প্রমাণিত নয়। এগুলির মধ্যে এমন কোনো পুস্তক নেই যে পুস্তকটি লেখকের যুগ থেকে বহুল প্রচার লাভ করেছে, যাতে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, সত্যিই উক্ত লেখকই এই প্রচলিত বইটি পুরোপুরি লিখেছেন। অনুরূপভাবে কোনো একটি বইয়েরও লেখক পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা সংরক্ষিত নেই। নতুন ও পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তকে সকল প্রকারের বিকৃতি

না, সমস্তই সফল হইবে।" (মথি ৫/১৮) এতে বুঝা যায় যে, পুরাতন নিয়ম মহাপ্রলয় পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। এছাড়া যীশু বারংবার পুরাতন নিয়মের ঘটনাবলির উল্লেখ করেছেন, বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়েছেন, পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির বক্তব্য দ্বারা তাঁর নিজের মতামত সমর্থন করেছেন। প্রেরিতগণও এভাবে বারংবার পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির উদ্ধৃতি দিয়ে নিজেদের স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছেন।

ঘটেছে বলে একটু আগে আমরা জেনেছি। আমরা আরো জেনেছি যে, ধার্মিক, গোঁড়া ও সৎ খৃস্টানগণ বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়কে প্রমাণিত করার জন্য বা সে বিষয়ক আপত্তি দূরীকরণের জন্য বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন এ সকল কারণে বাইবেলের পুস্তকগুলির গ্রহণযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতার বিষয়ে আমাদের সন্দেহ রয়েছে। এ সকল পুস্তকের কোনো কথা আমাদের নিকট কোনো সুদৃঢ় প্রমাণ নয়। এগুলিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করতে আমরা দ্বিধান্বিত। কারণ, এমনও তো হতে পারে যে, যীশু খৃস্ট পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলির বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়েছেন মর্মে যে শ্লোকটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হচ্ছে, সেই শ্লোকটি পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে। ধার্মিক ও সৎ খৃস্টানগণ দ্বিতীয় শতকের শেষে বা তৃতীয় শতকে এবোনাইট (**Ebionites**) সম্প্রদায় বা মারসিওনীয় (**Marcion**) সম্প্রদায় বা মানিকীয (**Manichees/ Manichaen/ Manichean**) সম্প্রদায়ের বিরোধিতার মানসে শ্লোকটিকে বাইবেলের মধ্যে সংযোজন করেছিলেন। খৃস্টধর্মের একটি গ্রহণযোগ্য ও সঠিক বিষয়কে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে তাঁদের এ বিকৃতি পরবর্তী যুগে সমর্থন করা হয়েছে ও মেনে নেওয়া হয়েছে। এবোনাইট, মারসিওনীয় ও মানিকীয সম্প্রদায় পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তক বা অধিকাংশ পুস্তক অস্বীকার করত। এজন্য হয়ত তাদেরকে ঘায়েল করতে এ সকল শ্লোক বা বক্তব্য যীশুর নামে জালিয়াতি করে লেখা হয়েছে।

যেরূপভাবে তাঁরা আরিয়ান সম্প্রদায় (**Arians**)[67] ও ইউটিকিয়ান (**Eutychian**) সম্প্রদায়ের[68] বিরোধিতার জন্য বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি সাধন করেন এবং তাঁদের বিকৃতি পরবর্তীকালে সমর্থন করা হয়।

(খ) যীশুর সাক্ষ্য প্রচলিত পুস্তকগুলির জন্য প্রমাণিত নয়

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা বলব যে, যীশু পুরাতন নিয়মের বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়েছেন মর্মে যে সকল কথা উল্লেখ করা হয়, সেগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত হোক বা প্রকৃত পক্ষে যীশুর কথাই হোক, কোনো অবস্থাতেই তাঁর এই বক্তব্য দ্বারা পুরাতন নিয়মের প্রচলিত সকল পুস্তকের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় না। কারণ এসকল কথার মধ্যে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলির নাম বা সংখ্যা উল্লেখ করা নেই। তাহলে আমরা কিভাবে বুঝতে পারব যে, যীশু যে পুরাতন নিয়মের বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়েছেন সে পুরাতন নিয়মের মধ্যে ৩৯টি পুস্তক

---

[67] ৩য়-৪র্থ শতকের প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু আরিয়ূসে (**Arius**) অনুসারিগণ, যারা যীশু খৃস্টকে ইশ্বরের সত্তার অংশ নয়, বরং তার সৃষ্ট 'পুত্র' বলে বিশ্বাস করতেন। সাধারণভাবে এরা একেশ্বরবাদী খৃস্টান বলে পরিচিত।

[68] ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর খৃস্টান সাধু ইউটিশাস (**Eutyches 375-454**)-এর অনুসারিগণ। এরা 'একসত্তাবাদী' (**Monophysites**)। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, খৃস্টের মধ্যে একটিমাত্র ঐশ্বরিক সত্তা বিরাজমান ছিল। তাঁর মধ্যে কোনো মানবীয় সত্তার অস্তিত্ব ছিল না। বিস্তারিত দেখুন **Encyclopaedia Britannica, artciles: Eutychian; Eutyches; Monophysite.**

ছিল? (প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের মানুষেরা এ পুস্তকগুলি মানেন), না সেই পুরাতন নিয়মের মধ্যে ৪৬টি পুস্তক ছিল? (ক্যাথলিকগণ এ পুস্তকগুলিকে মানেন।)

ঐতিহাসিক জোসেফাস (**Flavius Josephus**) অত্যন্ত গোঁড়া ইয়াহূদী ছিলেন এবং খৃস্টানগণও তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলে মান্য করেন। তিনি তাঁর ইতিহাসে শুধু নিম্নের কথাটুকু স্বীকার করেছেন: "আমাদের নিকট পরস্পর বিরোধী হাজার হাজার পুস্তক নেই বরং আমাদের নিকট মাত্র ২২টি পুস্তক রয়েছে। এগুলির মধ্যে পাঁচটি পুস্তক মোশির।"

জোসেফাস তোরাহ ছাড়া পুরাতন নিয়মের মধ্যে আরও ১৭টি পুস্তক আছে বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ বর্তমানে প্রচলিত 'বাইবেলের' মধ্যে প্রটেস্টান্টদের মতে তোরাহ ছাড়াও ৩৪টি পুস্তক ও ক্যাথলিকদের মতে ৪১টি পুস্তক রয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, জোসেফাস পুস্তকগুলির সংখ্যা বলেছেন, কিন্তু নাম উল্লেখ করেন নি।[69] কাজেই

---

[69] এখানে উল্লেখ্য যে, তৃতীয় খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধতম খৃস্টান ধর্মগুরু অরিগন (**Origen**)-ও পুরাতন নিয়মের মধ্যে ২২টি পুস্তক বিদ্যমান বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি পুস্তকগুলির নামও উল্লেখ করেছেন। নামের বর্ণনায় তিনি প্রচলিত কিছু পুস্তককে একত্রিত করে উল্লেখ করেছেন: তাঁর বর্ণনামতে মোশির পাঁচটি পুস্তক ছাড়া অবশিষ্ট ১৭টি পুস্তক নিম্নরূপ: (১) যিহোশূয়ের পুস্তক, (২) বিচারকর্তৃগণের বিবরণ ও রূতের বিবরণ একত্রে, (৩) শমুয়েলের প্রথম ও

দ্বিতীয় পুস্তক একত্রে, (৪) রাজাবলির প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড একত্রে, (৫) বংশাবলির প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড একত্রে, (৬) ইয্রার প্রথম ও দ্বিতীয় (নহিমিয়ের) পুস্তক একত্রে, (৭) গীতসংহিতা, (৮) হিতোপদেশ, (৯) উপদেশক, (১০) পরমগীত, (১১) যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তক, (১২) যিরমিয় ভাববাদীর পুস্তক, যিরমিয়ের বিলাপ ও যিরমিয়ের পত্র একত্রে, (১৩) দানিয়েলের পুস্তক, (১৪) যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তক, (১৫) ইয়োবের বিবরণ, (১৬) ইস্টেরের বিবরণ ও (১৭) মাকাবিজের পুস্তক। ১ম খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধতম ইহূদী ধর্মগুরু ও ৩য় শতকের প্রসিদ্ধত খৃস্টান ধর্মগুরু উভয়ের বিবরণ অনুসারে নিম্নের পুস্তকগুলি জাল, বানোয়াট ও অতিরিক্ত সংযোজিত এবং কোনো অবস্থাতেই পুরাতন নিয়মের অংশ নয়।: (১)হোশেয় ভাববাদীর পুস্তক (**Hosea**), (২) যোয়েল ভাববাদীর পুস্তক (**Joel**), (৩) আমোষ ভাববাদীর পুস্তক (**Amos**), (৪) ওবদিয় ভাববাদীর পুস্তক (**Obadiah**), (৫) যোনা ভাববাদীর পুস্তক (**Jonah**), (৬) মীখা ভাববাদীর পুস্তক (**Micah**), (৭) নহূম ভাববাদীর পুস্তক (**Nahum**), (৮) হবক্কূক ভাববাদীর পুস্তক (**Habakkuk**), (৯) সফনিয় ভাববাদীর পুস্তক (**Zephaniah**), (১০) হগয় ভাববাদীর পুস্তক (**Haggai**), (১১) সখরিয় ভাববাদীর পুস্তক (**Zechariah**), (১২) মালাখি ভাববাদীর পুস্তক (**Malachi**)। এই ১২টি পুস্তককে প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক উভয় সম্প্রদায়ই পুরাতন নিয়মের পুস্তক বলে বিশ্বাস করেন। এছাড়া ক্যাথলিকদের অতিরিক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে ম্যাকাবিজ ছাড়া বাকি ৫টি পুস্তকও জাল বলে জানা যায়। এখানে আরো লক্ষ্যণীয় যে, যিরমিয়ের পত্র (**Epistle of Jeremiah**) নামে একটি পুস্তকের কথা ওরিগন উল্লেখ করেছেন, যা বর্তমান প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে নেই। দেখুন, **Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, page 97, 244-245.**

প্রচলিত ৩৪ বা ৪১টি পুস্তকের মধ্যে কোন্ কোন্ পুস্তক ১৭টি পুস্তকের পরে অতিরিক্ত সংযুক্ত তাও জানার উপায় নেই। একথা বলার কোনো উপায় নেই যে, অমুক ১৭টি পুস্তক জোসেফাস উল্লিখিত বিশুদ্ধ পুস্তক।

ইতোপূর্বে পাঠক দেখেছেন যে, পণ্ডিত ক্রীযস্টম (**John Chrysostom: 347-407**) ও অন্যান্য ক্যাথলিক পণ্ডিত স্বীকার করেছেন যে, ইয়াহূদীগণ তাঁদের অবহেলার কারণে- বরং তাঁদের ধর্মহীনতা ও অসততার কারণে- অনেক ঐশ্বরিক পুস্তক বা ধর্মগ্রন্থ হারিয়ে ফেলেছে। কিছু পুস্তক তাঁরা ছিড়ে ফেলেছে এবং কিছু পুস্তক তারা পুড়িয়ে ফেলেছে। হয়ত জোসেফাস উল্লিখিত এই ১৭টি পুস্তকের মধ্য থেকে কিছু পুস্তকও এই হারানো, ছেড়া ও পুড়িয়ে ফেলা পুস্তকের মধ্যে চলে গিয়েছে। খৃস্টান পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন যে, বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকের মধ্যে ২০টিরও অধিক ধর্মগ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলির কোনো অস্তিত্ব এখন নেই। প্রসিদ্ধ ক্যাথলিক পণ্ডিত টমাস এঙ্গেলস বলেন: "পণ্ডিতগণ একমত যে, বাইবেলের মধ্য থেকে বিনষ্টকৃত বা হারিয়ে যাওয়া পবিত্র পুস্তকাদির সংখ্যা ২০ এর কম নয়।"

জোসেফাসের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, মোশির পুস্তকের সংখ্যা পাঁচটি। কিন্তু তিনি এ পাঁচটি পুস্তকের নাম উল্লেখ করেন নি। আমরা জানি না যে, এ পাঁচটি পুস্তক বলতে বর্তমানে প্রচলিত ৫টি

পুস্তক বুঝিয়েছেন, না অন্য কোনো পুস্তক বুঝিয়েছেন। বাহ্যত বুঝা যায় যে, তিনি এই পাঁচটি পুস্তকের কথা বলেন নি। কারণ তিনি বর্তমানে মোশির নামে প্রচলিত তোরাহ-এর পাঁচটি পুস্তকে প্রদত্ত তথ্যের বিপরীত অনেক কথা বলেছেন। ইতোপূর্বে বৈপরীত্য ও ভুলভ্রান্তির আলোচনায় পাঠক তা দেখেছেন।

(গ) যীশু অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন, বিশুদ্ধতার নয়

তৃতীয় পর্যায়ে আমরা বলব যে, আমরা যদি অনুমানের উপর ধরে নিই যে, বর্তমানে প্রচলিত পুস্তকগুলিই যীশুখৃস্টের যুগে প্রচলিত ছিল এবং তিনি ও তাঁর প্রেরিতগণ এ পুস্তকগুলিই মেনে নিয়েছেন এবং এগুলির পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন, তবুও তাঁদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রচলিত পুস্তকগুলির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় না, শুধু অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

এক্ষেত্রে খৃস্ট ও তাঁর প্রেরিতগণের সাক্ষ্য দ্বারা শুধু প্রমাণিত হয় যে, এ পুস্তকগুলি তাঁদের যুগে ইয়াহূদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল বলে তাঁরা স্বীকার করেছেন। এই পুস্তকগুলি যাদের নামে প্রচলিত সত্যই সেগুলি তাঁদের রচনা কি না, এগুলির মধ্যে উল্লিখিত সকল বিষয়ই সত্য, না সকল বিষয়ই মিথ্যা, না কিছু সত্য ও কিছু মিথ্যা সেগুলি কিছুই তাঁরা নিশ্চিত করেন নি।

খৃস্ট ও প্রেরিতগণ কর্তৃক এ সকল পুস্তকের অস্তিত্ব স্বীকার করার অর্থ এই নয় যে, তাঁরা সাক্ষ্য দিয়েছেন, এগুলি সত্যই কথিত

ভাববাদিগণের রচিত অথবা এগুলির মধ্যে উল্লিখিত সকল বিবরণ সন্দেহাতীভাবে সত্য। উপরন্তু, খৃস্ট বা প্রেরিতগণ যদি এ সকল পুস্তক থেকে কিছু উদ্ধৃত করেন, তবে তাঁদের উদ্ধৃতি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, যে পুস্তক থেকে তিনি উদ্ধৃতি প্রদান করছেন সে পুস্তকটি বিশুদ্ধ বা তার সকল কথা বিশুদ্ধ বলে বিনা গবেষণায় মেনে নিতে হবে।

হ্যাঁ, যদি ঈসা আলাইহিস সালাম সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, অমুক পুস্তকের সকল বিষয়, সকল বিধান বা সকল বক্তব্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত এবং তাঁর এ বক্তব্য সরাসরি তাঁর মুখ থেকে শুনে অগণিত মানুষ বর্ণনা করেন এবং সন্দেহাতীত অগণিত মানুষের বর্ণনার মাধ্যমে তা প্রমাণিত হয় তাহলেই নিশ্চিতরূপে আসমানী গ্রন্থ বলে প্রমাণিত হবে। অবশিষ্ট সকল বক্তব্য বা সকল পুস্তকই সন্দেহযুক্ত থাকবে। এগুলির বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য গবেষণা ও অনুসন্ধান করতে হবে। পুরাতন নিয়মের কোনো পুস্তকের বিষয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম থেকে এরূপ কোনো সাক্ষ্য প্রমাণিত হয় নি।

প্রটেস্টান্ট গবেষক পণ্ডিত বেলি তাঁর পুস্তকে উল্লেখ বলেন, যীশু বলেছেন যে, তোরাহ ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রদত্ত। কিন্তু তার কথার অর্থ এ নয় যে, পুরাতন নিয়মের সব কিছু বা প্রতিটি শ্লোক বিশুদ্ধ, অথবা এর সকল পুস্তকই সঠিক অথবা প্রতিটি পুস্তকের লেখকের বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান প্রয়োজনীয়। প্রেরিতগণ ও যীশুর

সমসাময়িক ইয়াহূদীগণ এ সকল পুস্তকের উপর নির্ভর করতেন, এগুলি পাঠ করতেন এবং এগুলি সে যুগে প্রসিদ্ধ ও ধর্মগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত ছিল। এগুলি থেকে কিছু কথা নতুন নিয়মে উদ্ধৃত করার অর্থ এ নয় যে, কথাটিকে গবেষণা ছাড়াই সত্য বা সঠিক বলে গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) খৃস্টের পরেও বিকৃতি ঘটেছে

চতুর্থ পর্যায়ে আমরা যদি তর্কের খাতিরে মেনে নিই যে, খৃস্ট ও তাঁর প্রেরিতগণ পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তকের সকল অংশের সকল কথার বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়েছেন, তবে এতে বাইবেলের বিকৃতি প্রমাণের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। কারণ প্রায় সকল খৃস্টান পণ্ডিত স্বীকার ও দাবি করেছেন যে, খৃস্টের পরের যুগে ১৩০ খৃস্টাব্দে খৃস্টানদের সাথে বিরোধিতা ও শত্রুতার জের হিসেবে ইয়াহূদীগণ পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলিকে বিকৃত করে। কাজেই যীশু যদি সাক্ষ্য দিয়েও থাকেন তাতে তার পরের যুগে পুরাতন নিয়মগুলির বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রহিত হয় না।

১. ৩. ৪. ৬. বাইবেলের বিকৃতি কি অসম্ভব ছিল?

বাইবেলের বিকৃতি অসম্ভব প্রমাণ করতে খৃস্টান প্রচারকগণ দাবি করেন যে, বাইবেলের অগণিত কপি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। কাজেই কারো জন্যই এতে কোনো বৃিকতি সাধন সম্ভব ছিল না।

এ দাবিটি যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রপাগান্ডা তা পূর্ববর্তী আলোচনা থেকেই সুস্পষ্ট। ইয়াহূদী-খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণ সকলেই স্বীকার করছেন যে, বিকৃতি সংঘটিত হয়েছে। কাজেই বিকৃতি ঘটানো সম্ভব ছিল না বলে দাবি করা অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। তদুপরি এখানে আমরা বাইবেলে বিকৃতির ঐতিহাসিক পটভূমি পর্যালোচনা করব, যেন, পাঠক বুঝতে পারেন যে, বাইবেলের বিকৃতি কিভাবে এত সহজ হয়েছিল।

১. ৩. ৪. ৭. বাইবেলের ইতিহাস ও বিকৃতির প্রেক্ষাপট

(ক) মূসা আলাইহিস সালাম থেকে নেবুকাদনেজার পর্যন্ত পুরাতন নিয়ম

মূসা আলাইহিস সালাম-এর সময়কাল সম্পর্কে বাইবেল ব্যাখ্যাকার ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে। মোটামুটি বলা চলে যে, খৃস্টপূর্ব ১৩৫০ সালের দিকে মূসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন এবং খৃ. পূর্ব ১২৩০/৩১ সালের দিকে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকাল থেকে খৃস্টপূর্ব ৫৮৭/৫৮৬ সালে নেবুকাদনেজারের হাতে ইয়াহূদী রাষ্ট্রের ধ্বংস পর্যন্ত প্রায় সড়ে ছয় শত বৎসরে ইয়াহূদী জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই আমরা বাইবেলের বিকৃতির পেক্ষাপট অনুধাবন করতে পারব।

মূসা আলাইহিস সালাম তোরাহ লিখে সেই পাণ্ডুলিপিটি ইস্রায়েল সন্তানগণের যাজক ও গোত্রপতিগণের নিকট সমর্পণ করেছিলেন।

তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাঁরা যেন সেই পাণ্ডুলিপিটিকে সংরক্ষণ করেন এবং 'সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকের' মধ্যে তা রেখে দেন। তিনি তাঁদেরকে প্রতি সাত বৎসর পর পর সকল ইস্রায়েলের সামনে তা পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন: "সাত সাত বৎসরের পরে, মোচন বৎসরের কালে, কুটীরোৎসব পর্বে, যখন সমস্ত ইস্রায়েল তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর মনোনীত স্থানে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তৎকালে তুমি সমস্ত ইস্রায়েলের সাক্ষাতে তাহাদের কর্ণগোচরে এই ব্যবস্থা পাঠ করিবে।"[70]

ইস্রায়েল সন্তানগণের প্রথম প্রজন্ম মোশির এই নির্দেশ মেনে চলেন। এই প্রজন্মের গত হওয়ার পরে ইস্রায়েল সন্তানদের অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে পাপাচারিতা, অবাধ্যতা ও ধর্মদ্রোহিতা ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ে। কখনো তাঁরা ধর্মত্যাগ করতেন। আবার কখনো পুনরায় ধর্ম মানতে শুরু করতেন। দায়ূদ-এর রাজত্বের শুরু পর্যন্ত (প্রায় তিনশত বৎসর যাবৎ) তাঁদের অবস্থা এইরূপ ছিল।

দায়ূদের রাজত্বকালে ইস্রায়েল সন্তানগণের ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। দায়ূদের রাজত্বকালে ও শলোমনের রাজত্বের প্রথমাংশে ইস্রায়েল সন্তানগণ ধর্মদ্রোহ পরিত্যাগ করে ধর্মীয়

---

[70] দ্বিতীয় বিবরণ ৩১/১০-১১।

অনুশাসনাদি পালন করে চলেন। কিন্তু বিগত শতাব্দীগুলির ধর্মদ্রোহিতা, অস্থিরতা ও অরাজকতার মধ্যে মোশির প্রদত্ত 'সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুকে রক্ষিত' তোরাহটি হারিয়ে যায়। কখন তা হারিয়ে যায় তা সঠিকভাবে জানা যায় না। এতটুকুই জানা যায় যে, শলোমানের রাজত্বের পূর্বেই তা হারিয়ে যায়। কারণ শলোমনের রাজত্বকালে যখন তিনি 'সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক'-টি উন্মোচন করেন তখন তার মধ্যে তোরাহের কোনো অস্তিত্ব পান নি। সিন্দুকটির মধ্যে শুধু দুইটি 'তোরাহ-বহির্ভূত' প্রাচীন প্রস্তরফলকই অবশিষ্ট ছিল। ১ রাজাবলির ৮ম অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকে এ বিষয়ে বলা হয়েছে: "সিন্দুকের মধ্যে আর কিছু ছিল না, কেবল সেই দুইখানা প্রস্তরফলক ছিল, যাহা মোশি হোরেবে তাহার মধ্যে রাখিয়াছিলেন; সেই সময়ে, মিসর হইতে ইস্রায়েল-সন্তানগণের বাহির হইয়া আসিবার পর, সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানগণের সহিত নিয়ম করিয়াছিলেন।"

বাইবেলের বিবরণ অনুসারে শলোমনের রাজত্বের শেষভাগ থেকে ইস্রায়েলীয়গণের মধ্যে জঘন্য বিপর্যয় নেমে আসে। স্বয়ং শলোমন তাঁর শেষ জীবনে ধর্মত্যাগ করেন (নাঊযু বিল্লাহ!)। তিনি তাঁর স্ত্রীগণের পরামর্শে মুর্তিপূজা শুরু করেন মুর্তিপূজার নিমিত্ত মন্দিরাদি নির্মাণ করেন। এভাবে তিনি যখন ধর্মত্যাগী (মুর্তাদ) ও পৌত্তলিকে পরিণত হলেন (নাঊযু বিল্লাহ!!) তখন তোরাহ-এর প্রতি তাঁর আর কোনো আগ্রহ থাকে না।

তাঁর মৃত্যুর পরে আরো কঠিনতর বিপর্যয় শুরু হয়। খৃস্টপূর্ব ৯৩১ সালের দিকে ইস্রায়েল-সন্তানগণ অভ্যন্তরীন কোন্দল ও দলাদলির ফলে দু ভাগে বিভক্ত হয়ে যান। ইয়াহূদীগণের একটি রাজ্য দুইটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। ইস্রায়েল-সন্তানগণের ১২ গোত্রের মধ্যে ১০টি গোত্র এক পক্ষে এবং বাকি দুইটি বংশ এক পক্ষে থাকেন। নবাটের পুত্র যারবিয়ামের (**Jeroboam I**) নেতৃত্বে বিদ্রোহী ১০টি গোত্র প্যালেস্টাইনের উত্তর অংশে পৃথক রাজ্য ঘোষণা করেন। তাঁদের রাজ্যের নাম হয় 'ইস্রায়েল' (**the kingdom of Israel**)। ইস্রায়েল রাজ্যকে অনেক সময় শামেরা (**Samaria**) বা ইফ্রমিয় (**Ephraimites**) বলা হতো। এর রাজধানী ছিল নাবলুস। অবশিষ্ট দুইটি গোত্র: যিহূদা ও বিন্যামিন বংশের রাজা হন শলোমনের পুত্র রহবিয়াম (**Rehoboam**)। এই রাজ্যের নাম হয় জুডিয়া বা জুডাই রাজ্য (**the Kingdom of Judea, also Judaea or Judah**)। এর রাজধানী ছিল যিরূশালেম।

উভয় রাজ্যেই ধর্মদ্রোহিতা, মুর্তিপুজা ও অনাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরের ইস্রায়েল বা শমরীয় রাজ্যের রাজা যারবিয়াম রাজ্যভার গ্রহণ করার পরপরই মোশির ধর্ম ত্যাগ করেন। তাঁর সাথে ইস্রায়েলীয়দের ১০টি গোত্রের মানুষেরা মোশির ধর্ম ত্যাগ করেন। তাঁরা মুর্তিপুজা শুরু করেন। এদের মধ্যে যাঁরা তোরাহ-এর অনুসারী

ছিলেন তাঁরা নিজেদের রাজ্য পরিত্যাগ করে যুডাহ (যিহূদা) রাজ্যে হিজরত করেন।

এভাবে এ রাজ্য বা ইস্রায়েল সন্তানদের মূল অংশ এ সময় থেকে মূসার আলাইহিস সালাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যান এবং কুফর, মুর্তিপুজা ও অনাচারের মধ্যে অতিবাহিত করেন। পরবর্তী প্রায় ২০০ বৎসর এ রাজত্বের অস্তিত্ব ছিল। সন-তারিখের বিষয়ে বেশ মতভেদ রয়েছে। আধুনিক গবেষকগণের মতে ইস্রায়েল রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল খৃ. পু. ৯২২ সাল থেকে ৭২২/৭২১ সাল পর্যন্ত কমবেশি ২০০ বৎসর। এ সময়ে ১৯ জন রাজা এই রাজ্যে রাজত্ব করেন। এরপর আল্লাহ তাঁদেরকে ধ্বংস করেন। অশুরীয়দের **(the Neo-Assyrian Empire)** আক্রমণে তারা পরাজিত হয়। খৃস্টপূর্ব ৭২৪ সালে অ্যাসিরিয়ান (অশূরীয়) সম্রাট চতুর্থ শালমানেসার বা শল্মনেষর **(Shalmaneser iv)** ইস্রায়েল রাজ্য আক্রমন করেন। তার মৃত্যুর পর তার সেনাপতি দ্বিতীয় সার্গন **(Sargon II: ruled 722-705 bc)** উপাধি ধারণ করে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বে আসিরিয়্যানগণ ইস্রায়েলীয়দেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী অশুরীয়গণ পরাজিত ইস্রায়েলীয়গণকে বন্দি করে অশুরীয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্বাসিত করে। এ এলাকায় অল্পসংখ্যক ইস্রায়েলীয় অবশিষ্ট থাকে।

আশুরীয়গণ ইস্রায়েলীয়দেরকে এ সকল অঞ্চল থেকে নির্বাসিত করার পরে সেখানে অশুরীয় রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে পৌত্তলিকগণকে এনে বসতি স্থাপন করায়। সেখানে অবশিষ্ট অল্প সংখ্যক ইস্রায়েলীয় এ সকল পৌত্তলিকদের সাথে সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়। তাঁরা পৌত্তলিকগণের পুত্র কন্যাদেরকে বিবাহ করেন এবং তাদের সাথে একত্র পরিবার গঠন করেন। এ সকল 'ইস্রায়েলীয়' ইয়াহূদীদেরকে 'শমরীয়' **(Samaritans)** বলা হয়।[71]

এভাবে আমরা দেখছি যে, বাইবেলের বর্ণনা অনুসারেই ইয়াহূদীদের বৃহৎ অংশ বা ১২ বংশের দশ বংশ উত্তর রাজ্যের ইস্রায়েলীয় বা শমরীয় ইয়াহূদীগণ শলোমনের পর থেকেই ধর্মচ্যুত হন এবং শেষে পৌত্তলিকদের মধ্যে বিলীন হয়ে যান। মূসার আলাইহিস

---

[71] ইহূদীরা এদেরকে প্রচন্ডভাবে ঘৃণা করত। যীশুখৃস্ট যখন তাঁর দ্বাদশ শিষ্যকে তাঁর সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন তখন বিশেষ করে শমরীয়দের কাছে না যাওয়ার ও তাদেরক তাঁর ধর্মে দীক্ষা না দেওয়ার নির্দেশ দেন। মথি বলেন: **"These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not: But go rather to the lost sheep of the house of Israel:** এই বার জনকে যীশু প্রেরণ করিলেন, আর তাঁহাদিগকে এই আদেশ দিলেন- তোমরা পরজাতিগণের (অ-ইহূদী জাতিগণের) পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও। (মথি ১০/৫-৬)

সালাম ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের সাথে তাঁদের সম্পর্ক শুধু নামেই অবশিষ্ট থাকে। ফলে এদের মধ্যে মূসা আলাইহিস সালাম-এর ধর্মগ্রন্থ 'তোরাহ'-এর কোনো পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব 'আনকা' (গরুড়) পক্ষীর ন্যায় কাল্পনিক বিষয়ে পরিণত হয়।

অপরদিকে শলোমনের মৃত্যু পর থেকে পরবর্তী ৩৭২ বৎসর[72] যাবৎ শলোমনের বংশের ২০ জন রাজা যিহূদা রাজ্যে রাজত্ব করেন। এ সকল রাজার মধ্যে বিশ্বাসী ও ধর্মপরায়ণ রাজার সংখ্যা ছিল কম। অধিকাংশ রাজাই ছিলেন ধর্মত্যাগী ও মুর্তিপুজক। প্রথম রাজা রহবিয়ামের যুগ থেকেই মুর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। প্রতিটি বৃক্ষের নিচে মুর্তি স্থাপন করা হয় এবং পূজা করা হয়। রহবিয়ামের রাজত্বকালেই যুডিয়া রাজ্যের উপর গযব নেমে আসে। তার সময়েই খৃস্ট পূর্ব ৯২৫ অব্দে মিশরের ফিরাউন ১ম শেশাঙ্ক বা শীশক (**Shashanq I**) যুডাহ রাজ্য আক্রমন করে যিরূশালেম নগর ও

---

[72] আমরা ইতোপূর্বে বলেছি যে, মোশি, দায়ূদ, শলোমন প্রমুখ ভাববাদী ও রাজার সময়কালের বিষয়ে পাশ্চাত্য ধর্মবিদ ও ঐতিহাসিকদের প্রদত্ত তারিখগুলির মধ্যে বৈপরীত্য আছে। লেখক তৎকালে খৃস্টান পন্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত সন তারিখ ব্যবহার করেছেন। মোটামুটি ঐতিহাসিকগণ একমত যে, খৃ. পূ. ৫৮৭ বা ৫৮৬ সালে যিহূদা রাজ্যের পতন হয়। লেখকের প্রদত্ত তারিখ অনুসারে ৫৮৭+৩৭২=খৃ.পূ. ৯৫৯ সালে শলোমনের মৃত্যু হয়। বর্তমানে প্রসিদ্ধ মত হলো, খৃ. পূ. ৯৩১/৯৩০ সালে শলোমন মৃত্যু বরণ করেন।

ধর্মধাম লুণ্ঠন করেন। তিনি ধর্মধামের সকল আসবাবপত্র ও রাজ প্রাসাদের সকল মালামাল লুণ্ঠন করে নিয়ে যান।।[73]

কিছুদিন পরে যিহূদা রাজ্যের তৃতীয় রাজা আসার (**Asa**) রাজত্বকালে ইস্রায়েল রাজ্যের ধর্মত্যাগী ও মুর্তিপূজক রাজা বাশা (**Baasha**) যিরূশালেম আক্রমন করে ধর্মধাম ও রাজ প্রাসাদ ব্যাপকভাবে লুণ্ঠন করেন।[74]

যিহূদা বা যুডিয়া রাজ্যের ষষ্ঠ রাজা অহসিয় (**Ahaziah**)-এর সময়ে বাল-প্রতিমার পূজা ও তার উদ্দেশ্যে পশু-উৎসর্গ করার জন্য যিরূশালেমের অলিতে গলিতে ও সকল স্থানে বেদি স্থাপন করা হয়। শলোমনের মন্দির বা ধর্মধামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

যিহূদা বা যুডিয়া রাজ্যে ধর্মদ্রোহ, মুর্তিপুজা ও অনাচারের ব্যাপকতম প্রসার ও প্রতিষ্ঠা ঘটে রাজা মনঃশি (**Manasseh**)-এর শাসনামলে (খৃ. পূ ৬৯৩-৬৩৯ অব্দ)। এ সময়ে এই রাজ্যে প্রায় সকল অধিবাসীই মোশির ধর্ম পরিত্যাগ করে মুর্তিপূজা ও পৌত্তলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। শলোমনের ধর্মধাম বা সদাপ্রভুর মন্দিরের মধ্যেই মুর্তিপূজা ও প্রতিমার জন্য পশু-উৎসর্গ করার নিমিত্ত বেদি নির্মাণ করা হয়। রাজা মনঃশি যে প্রতিমার পূজা করতেন তিনি সদাপ্রভুর মন্দিরের মধ্যে সেই প্রতিমা স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র আমোন

---

[73] ১ রাজাবলি১৪/২৫-২৬; মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৬।

[74] ১ রাজাবালি ১৫/১৬-২২।

(**Amon**)-এর শাসনামলেও (খৃ. পূ. ৬৩৯-৬৩৮ অব্দ) ধর্মত্যাগ ও পৌত্তলিকতার অবস্থা একইরূপ থাকে।

আমোনের মৃত্যুর পরে খৃ.পূ. ৬৩৮ সালে তাঁর পুত্র যোশিয় (**Josiah**) আট বৎসর বয়সে যিহূদা রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। তিনি ধর্মদ্রোহিতা ও অনাচার থেকে বিশুদ্ধভাবে তাওবা করেন। তিনি ও তাঁর রাজ্যের কর্ণধারগণ ধর্মদ্রোহিতা, পৌত্তলিকতা ও অনাচারকে সমূলে বিনাশ করে মোশির ব্যবস্থা বা শরীয়ত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করেন। মহাযাজক হিল্কিয় (**Hilki'ah the high priest**) ছিলেন তার দীক্ষাগুরু। তিনি সুলাইমানের ধর্মধাম বা মসজিদ সংস্কার ও চালু করার জন্য জনগণ থেকে কর সংগ্রহ করতে ধর্মীয় লিপিকার শাফনকে (**Shaphan the scribe**)-কে দায়িত্ব দেনে। এ সকল সংস্কার কাজের জন্য "তাওরাত"-এর প্রয়োজনীয়তা তারা বিশেষ করে অনুভব করেন। তা সত্ত্বেও তাঁর রাজত্বের ১৭শ বৎসর পর্যন্ত বা খৃস্টপূর্ব ৬২১ সাল পর্যন্ত কেউ মোশির তোরাহ-এর কোনো পাণ্ডুলিপির চিহ্ন দেখেন নি বা এর কোনো কথাও কেউ শুনেন নি।

যোশিয় রাজার রাজত্বের ১৮শ বৎসরে (খৃ. পূ. ৬২০/৬২১ সালে) রাজা যোশিয়ের গুরু মহাযাজক হিল্কিয় (**Hilki'ah**) দাবি করেন যে, তিনি 'সদাপ্রভুর গৃহে', অর্থাৎ যিরূশালেমের ধর্মধাম বা শলোমনের মন্দিরের মধ্যে রৌপ্যের হিসাব করতে যেয়ে মোশির

তোরাহ বা সদাপ্রভুর ব্যবস্থাপুস্তকখানি **(the book of the law)** পেয়েছেন। তিনি পুস্তকটি শাফন লেখককে **(Shaphan the scribe)** প্রদান করেন। শাফন লেখক রাজা যোশিয়কে পুস্তকটি পাঠ করে শোনান। রাজা এই পুস্তকটির বাক্যাদি শুনে এত বেশি বিমোহিত ও উদ্বেলিত হন যে তিনি নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিড়ে ফেলেন। ইস্রায়েলীয়দের অবাধ্যতার কথা স্মরণ করে তিনি এভাবে দুঃখ প্রকাশ করেন। এ সকল বিষয় ২ রাজাবলির ২২ অধ্যায়ে এবং ২ বংশাবলির ৩৪ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।[75]

তোরাহ বা ব্যবস্থা পুস্তক' বলে কথিত এই পাণ্ডুলিপিটির নির্ভরযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতা স্বীকৃত নয়। যাজক হিল্কিয়ের দাবিও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ রাজা অহসিয়ের পূর্বেই 'সদাপ্রভুর গৃহ' বা ধর্মধামটি ইতোপূর্বে দুইবার বিজয়ী শত্রুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছে। এরপর এই গৃহটিকে প্রতিমা পূজার কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। প্রতিমাপুজারিগণ প্রতিদিন এই গৃহে প্রবেশ করতেন। এভাবে অহসিয় **(Ahaziah)** রাজার রাজত্বকাল থেকে যেশিয়ের রাজত্বকালের ১৭শ বৎসর পর্যন্ত খৃস্টপূর্ব ৮৪৩ থেকে ৬২১ সাল পর্যন্ত দু শতাব্দীরও অধিক সময় কেউ কোনোভাবে তোরাহ বা ব্যবস্থাপুস্তকের নামও শুনেন নি, চোখে দেখা তো দূরের কথা।

---

[75] ২ রাজাবলি ২২/১-১১; ২ বংশাবলি ৩৪/১-১৯।

যোশিয়ের রাজত্বের প্রথম ১৭টি বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। এ দীর্ঘ সময়ে রাজা স্বয়ং ও রাজ্যের নেতৃবর্গ ও সাধারণ প্রজাগণ সকলেই মোশির ব্যবস্থার পালন ও পুন-প্রতিষ্ঠায় প্রানান্ত প্রচেষ্টায় নিরত ছিলেন। এত কিছু সত্ত্বেও এ দীর্ঘ সময়ে কেউ ব্যবস্থাপুস্তকের নামটি পর্যন্ত শুনতে পেলেন না। এই দীর্ঘ সময়ে 'সদাপ্রভুর গৃহের রক্ষক ও যাজকগণ প্রতিদিন এই গৃহের মধ্যে যাতায়াত করতেন। বড় অবাক কথা যে, এ দীর্ঘ সময় পুস্তকটি সদাপ্রভুর গৃহে থাকবে, অথচ এত মানুষ কেউ তার দেখা পাবে না!

প্রকৃত কথা হলো, এই পুস্তকটি বা 'তোরাহ'-এর এই পাণ্ডুলিপিটি পুরোটিই হিল্কিয় মহাযাজকের উদ্ভাবনা ও রচনা ছাড়া কিছুই নয়। তিনি যখন দেখলেন যে, রাজা যোশিয় এবং তাঁর অমাত্যবর্গ সকলেই মোশির ব্যবস্থার প্রতিপালন ও পুনপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহী, তখন তিনি তাঁর যুগে লোকমুখে প্রচলিত সত্য ও মিথ্যা সকল প্রকারের মৌখিক বর্ণনা একত্রিত করে এই পুস্তকটি রচনা করেন। এগুলি সংকলন ও লিপিবদ্ধ করতেই তাঁর এই দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। যখন তা সংকলনের কাজ তিনি সমাপ্ত করেন, তখন তিনি পুস্তকটিকে সরাসরি মোশির নামেই চালিয়ে দেন। পাঠক ইতোপূর্বে জেনেছেন যে, ধার্মিকতার প্রচার প্রসার ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য এই ধরনের মিথ্যাচার ও জালিয়াতি শেষ শতাব্দীগুলির ইয়াহূদীগণ এবং প্রথম যুগগুলির খৃস্টানগণের নিকট ধর্মীয় পুণ্যকর্ম বলে গণ্য ছিল।

এ প্রকৃত সত্যটিকে পাশ কাটিয়ে প্রচলিত কাহিনীর ভিত্তিতে আমরা ধরে নিচ্ছি যে, হিল্কিয় তোরাহ-এর পাণ্ডুলিপিটি পেয়েছিলেন। রাজা যোশিয়ের রাজত্বের ১৮শ বৎসরে পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায়। পরবর্তী ১৩ বৎসর, যতদিন রাজা যোশিয় জীবিত ছিলেন, ততদিন যিহূদা বা জুডাহ রাজ্যের ইয়াহূদীগণ এ তোরাহ অনুসারে নিজেদের ধর্মকর্ম পরিচালনা করেন।

যোশিয়ের মৃত্যুর পরে (খৃ. পূ. ৬০৮/৬০৯ সালে) তদীয় পুত্র যিহোয়াহস (**Jeho'ahaz**) রাজত্ব লাভ করেন। তিনি রাজত্ব লাভ করে মোশির ধর্ম পরিত্যাগ করেন এবং রাজ্যে অবিশ্বাস, ধর্মদ্রোহিতা ও পৌত্তলিকতার প্রসার ঘটান। মিশরের সম্রাট ফরৌণ-নখো বা নেকু (**Neku**) যিহোয়াহসকে বন্দি করে নিয়ে যান এবং তার ভ্রাতা ইলিয়াকীমকে যিহোয়াকীম (**Jehoiakim/Joakim**) নাম প্রদান পূর্বক সিংহাসনে বসান। যিহোয়াকীমও তার ভাইয়ের মত ধর্মদ্রোহী ও পৌত্তলিক ছিলেন।

যিহোয়াকীমের মৃত্যুর পরে (খৃ. পূ. ৫৯৮/৫৯৭ অব্দে) তার পুত্র যিহোয়াখীন (**Jehoiachin/Joachin**) রাজত্ব লাভ করেন। তিনিও তাঁর পিতা ও চাচার মতই ধর্মত্যাগী ও পৌত্তলিক ছিলেন। এ সময়ে ব্যাবিলনের সম্রাট বখত নসর বা নেবুকাদনেজার (**Nebuchadrezzar II**) জুডাহ বা যিহূদা রাজ্য দখল করেন। তিনি যিরূশালেম শহর, রাজ প্রাসাদ, ও 'সদাপ্রভুর গৃহ' বা ধর্মধামের

সমস্ত ধন-সম্পদ ও দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। তিনি রাজা যিহোয়াখীনকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান এবং তাঁর পরিবর্তে তাঁর চাচা সিদকিয়কে (**Zedekiah**) রাজত্ব প্রদান করেন। নেবুকাদনেজার বিপুল সংখ্যক ইয়াহূদীকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান।[76]

কাফির পৌত্তলিক রাজা সিদকিয় (**Zedekiah**) প্রায় ১১ বৎসর নেবুকাদনেজারের অধীনে লাঞ্ছিত অবস্থায় যিহূদা রাজ্যের রাজত্ব করেন। এরপর তিনি বিদ্রোহ করেন। খৃ. পূ. ৫৮৭/৫৮৬ সালে নেবুকাদনেজার দ্বিতীয়বার যিরূশালেম আক্রমন ও দখল করেন। তিনি রাজা সিদকিয়কে বন্দি করে তাঁরই সামনে তাঁর পুত্রগণকে জবাই করেন। এরপর তিনি সিদকিয়ের চক্ষু উৎপাটন করেন এবং তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ব্যাবিলন প্রেরণ করেন। নেবুকাদনেজার-এর বাহিনী এবার যিরূশালেমকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। তারা যিরূশালেমের ধর্মধাম বা ‘সদাপ্রভুর গৃহ’, রাজ-প্রাসাদসমূহ, যিরূশালেমের সকল বাড়িঘর ও অট্টালিকায় অগ্নিসংযোগ করে ভস্মিভুত করে, যিরূশালেম নগরীর চারিদিকের প্রাচীর ভেঙ্গে দেয়

---

[76] বাইবেলের ভাষায়: তিনি যিরূশালেমের সমস্ত লোক, সমস্ত প্রধান লোক ও সমস্ত বলবান বীর, অর্থাৎ দশ সহস্র বন্দি এবং সমস্ত শিল্পকার ও কর্মকারকে লইয়া গেলেন; দেশের দীন দরিদ্র লোক ব্যতিরেকে আর কেহ অবশিষ্ট থাকিল না। ২ রাজাবলি ২৪/১৪

এবং যিহূদা (**Judah**) রাজ্যে অবস্থানকারী অবশিষ্ট ইস্রায়েল সন্তানকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যায়। এভাবে তিনি যিহূদা রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেন।[77]

আমরা দেখেছি যে, ইয়াহূদীদের ১২ গোত্রের দশ গোত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন উত্তরের ইস্রায়েল রাজ্য খৃস্টপূর্ব ৭২২ সালে রাজা দ্বিতীয় সার্গন (**Sargon II**) কর্তৃক চিরতরে বিনষ্ট হয়। এর মাত্র ১৩৫ বৎসর পরে খৃ. পূ. ৫৮৭ সালে ইয়াহূদীদের অবশিষ্ট দুই গোত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন দক্ষিণের যুডাই রাজ্যও নেবুকাদনেজার কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। বিশেষত যিরুশালেম ও ধর্মধাম (মসজিদে আকসা) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। স্বভাবতই এ ঘটনায় তোরাহ এবং পুরাতন নিয়মের অন্যান্য সকল পুস্তক যেগুলি এই ঘটনার পূর্বে লিখিত হয়েছিল সবই চিরতরে পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন হয়ে যায়। ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণও একথা একবাক্যে স্বীকার করেন।[78]

এভাবে আমরা দেখছি যে, রাজা যোশিয়ের (রাজত্বকাল খৃস্টপূর্ব ৬৩৮-৬০৮) পূর্বেই তাওরাত-এর ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়। তার

---

[77] ২ রাজাবলি ২৪ অধ্যায়ে এ সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

[78] তোরাহ বা ইহূদীদের ধর্মগ্রন্থ গণ পুস্তক ছিল না। একমাত্র ধর্মগুরুগণ ছাড়া কেউ তা পাঠ করত না। ধর্মধাম ছাড়া অন্যত্র তার কোনো কপিও থাকত না। কোনো ধর্মগুরু বা অন্য কেউ কখনো তা মুখস্ত করত না। ফলে বিনষ্ট হওয়ার পরে পুনরায় হুবহু তা লিখে ফেলার কোনো সুযোগ ছিল না।

সময়ের পূর্বেই তোরাহ-এর প্রচলন ও ব্যবহার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ সময়ে তোরাহ-এর কোনো প্রকারের অস্তিত্বের কথাই জানা যায় না। যোশিয়ের সময়ে যে পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া যায় তা নির্ভরযোগ্য নয়। বিশেষত একটিমাত্র পাণ্ডুলিপির দ্বারা ধারাবাহিক বহুল প্রচলন প্রমাণিত হয় না। তোরাহ-এর এ 'পূনর্জন্ম'ও ক্ষণস্থায়ী। মাত্র ১৩ বৎসরের (খৃ. পূ ৬২০-৬০৮ সাল) বেশি তা ব্যবহৃত হয় নি। এরপর আর তার কোনো খবর জানা যায় না। বাহ্যত বুঝা যায় যে, যোশিয়ের পুত্র-পৌত্রগণের মধ্যে ধর্মদ্রোহিতা ও পৌত্তলিকতার পুনরাবির্ভাবের কারণে যোশিয়ের মৃত্যুর পরে নেবুকাদনেজারের আক্রমনের পূর্বেই তা বিনষ্ট হয়ে যায়। আর যদি তাদের দ্বারা তা নষ্ট না-ও হয় তাহলে সুনিশ্চিতভাবেই তা নেবুকাদনেজারের আক্রমনের সময়ে বিনষ্ট হয়ে যায়। ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, এ আক্রমনের পূর্বে লেখা ও বিদ্যমান পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তক এ সময়ে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে বিলীন হয়ে যায়। এজন্য তারা দাবি করেন যে, ব্যাবিলন থেকে ফেরার পর ইয্রা সেগুলি নতুন করে লিখেন।

আরবী ভাষায় লিখিত বাইবেল ডিকশনারীতে তারা উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াহূদীদের ধর্মত্যাগ, অবিশ্বাস, অনাচার, মূর্তিপূজা, হানাহানি ও জুলুম-অত্যাচারের সুদীর্ঘ সময়ে, বিশেষত রাজা মনঃশি **(Manasseh)**-এর শাসনামলের ৫৫ বৎসরে (খৃ. পূ ৬৯৩-৬৩৯

অব্দ) পুরাতন নিয়মের গ্রন্থগুলি নষ্ট করা হয় বা হারিয়ে যায়। রাজা যোশিয়ের সময়ে মহাযাজক হিল্কিয় ব্যবস্থাপুস্তকের যে পাণ্ডুলিপিটি পেয়েছিলেন ধর্মধামের অবমাননার সময়ে তার মধ্যে বিকৃতি ও জালিয়াতি হওয়ার মতটিকে তারা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।

(খ) ব্যাবিলন থেকে প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত পুরাতন নিয়ম

নেবুকাদনেজারের এ ঘটনা (খৃ. পূ. ৫৮৭/৫৮৬) থেকে প্রথম খৃস্টীয় শতাব্দী পর্যন্ত পরবর্তী প্রায় ৬০০ বৎসরের ইতিহাস পূর্ববর্তী অধ্যায়ের চেয়ে মোটেও ভাল নয়। ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের ধারণা ও দাবি অনুযায়ী নেবুকাদনেজারের এ ঘটনার প্রায় এক শতাব্দী পরে ইয্রা (**Ezra**) পুনরায় পুরাতন নিয়মের এ সকল গ্রন্থ নিজের পক্ষ থেকে লিখেন। এ পুনর্জন্ম ও পুনর্লিখনের প্রায় তিন শতাব্দী পরে আবার একটি ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ও ধ্বংস গ্রাস করে হিব্রু জাতিকে। বাইবেলের 'সন্দেহজনক পুস্তক' (**Apocrypha**) মাকাবিজের প্রথম পুস্তক (**The First Book of Maccabees**) ও খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ইয়াহূদী ঐতিহাসিক জোসেফাস (**Flavius Josephus**)-এর পুস্তকে এ সকল ঘটনা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এ ঘটনার সার-সংক্ষেপ হলো, খৃ. পূ. ১৬১ সালের দিকে[79] সিরিয়ার গ্রীক শাসক চতুর্থ এন্টিয়ক (**Antiochus IV Epiphanes c. 215-164 BC**) যিরুশালেম অধিকার করেন এবং ইয়াহূদী ধর্ম চিরতরে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির কপি-পাণ্ডুলিপি যেখানে যা পান তা সবই ছিড়ে টুকরো করার পরে অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দেন। তিনি নির্দেশ প্রদান করেন যে, কোনো ব্যক্তির নিকট পুরাতন নিয়মের কোনো পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বা কপি পাওয়া গেলে, অথবা কোনো ব্যক্তি মোশির ব্যবস্থার (শরীয়তের) কোনো বিধান পালন করলে তাকে হত্যা করতে হবে। প্রতি মাসে অনুসন্ধান করা হতো। কারো নিকট পুরাতন নিয়মের কোনো পুস্তকের পাণ্ডুলিপি বা কপি পাওয়া গেলে, অথবা কেউ মোশির ব্যবস্থার কোনো বিধান পালন করলে তাকে হত্যা করা হতো। আর সেই পাণ্ডুলিপি বা কপিটি বিনষ্ট করা হতো। সাড়ে তিন বৎসর পর্যন্ত এই নিধন ও বিনাশের কর্ম অব্যাহত থাকে।

এ ঘটনায় অগণিত ইয়াহূদী নিহত হন এবং ইয্রার লেখা তোরাহ বা পুরাতন নিয়ম এবং এর সকল কপি বিনষ্ট হয়।[80]

---

[79] অনেকে ঘটনাটি খৃ. পূ. ১৬৮-১৬৪ সালে ঘটেছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

[80] তাওরাত কখনই সকলের পাঠ বই ছিল না। শুর্ধ ধর্মধামে তা রক্ষিত থাকত ও বিশেষ অনুষ্ঠানে তার কিছু অংশ পাঠ করা হতো। এজন্য সে যুগে পূর্ণ তাওরাতের বা পুরাতন নিয়মের বেশি কপি ছিল না বলেই প্রতীয়মান হয়।

ক্যাথলিক পণ্ডিত জন মিলনার লিখেন: পণ্ডিতগণ একমত যে, তোরাহ-এর মূল কপি এবং পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তকাবলির কপিগুলি নেবুকাদনেজারের সেনাবাহিনীর হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপর ইয্রার মাধ্যমে এ সকল পুস্তকের উদ্ধৃতি প্রকাশ পায়। এন্টিয়ক (**Antiochus Epiphanes**)-এর ঘটনায় (খৃস্টপূর্ব ১৬৮ অব্দের দিকে) সেগুলিও আবার নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এর পর আবার ইয়াহূদীরা গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে যুডাই রাজ্যে বসবাস করতে থাকেন। তবে তাদের অবাধ্যতা ও অনাচারের ফলে বারংবার তারা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মধ্যে পড়েন। এভাবে তারা আরো অনেক কঠিন বিপদ ও রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞের মধ্যে নিপতিত হয়েছেন, ইয্রা লিখিত তোরাহ-এর বিকৃত বা অবিকৃতি যা কিছু পাণ্ডুলিপি তাদের নিকট বিদ্যমান ছিল এ সকল ঘটনায় সেগুলি বিনষ্ট হয়ে যায়। এসকল হত্যাযজ্ঞের অন্যতম হলো রোমান যুবরাজ টিটাস (**Titus**) এর ঘটনা। রোমান সম্রা্ট ভেসপাসিয়ান (**Vespasian**) তাঁর পুত্র (পরবর্তী সম্রাট) টিটাসকে ইয়াহূদীদের দমনের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালান এবং ‘সদাপ্রভুর গৃহ’ বা ধর্মধাম সম্পূর্ণ গুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেন। এই ঘটনাটি ঘটে খৃস্টের উর্ধ্বারোহণের ৩৭ বৎসর পরে (৭০ খৃস্টাব্দে)।

সাধারণ ইহূদীরা হয়ত প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় কপি করে রাখত। পূর্ণাঙ্গ কপির সাথে এ সকল আংশিক অনুলিপিও এ সময় বিনষ্ট হয়ে যায়।

জোসেফাসের ইতিহাসে ও অন্যান্য ইতিহাসে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই ঘটনায় হত্যা, ক্রুশ, অগ্নিসংযোগ ও অনাহারে যিরূশালেম ও তার পার্শবর্তী অঞ্চলের ১১ লক্ষ ইয়াহূদী মৃত্যুবরণ করে। ৯৭ হাজার ইয়াহূদীকে বন্দি করে বিভিন্ন দেশে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রয় করে দেওয়া হয়। এছাড়া অন্যান্য এলাকাতেও অনেক ইয়াহূদী এই ঘটনার সময়ে নিহত হন বা মৃত্যু বরণ করেন। এ কথা নিশ্চিত যে, এন্টিয়কের ঘটনার পরেও যদি পুরাতন নিয়মের কোনো কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে এ সকল ঘটনায় তাও হারিয়ে ও বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। (এ গ্রন্থের ২৪-২৫ পৃষ্ঠায় 'প্রথম বিষয়' দেখুন।)

(গ) হিব্রু তাওরাত বনাম গ্রীক অনুবাদ

আমরা আগেই বলেছি যে, ইয়াহূদীদের ধর্মীয় ও জাগতিক ভাষা হিব্রু ভাষা। এ ভাষাতেই পুরাতন নিয়মের সকল পুস্তক রচিত। খৃস্টপূর্ব ৩৩২ সালে আলেকজান্ডার যুডাই রাজ্য দখল করেন এবং তা গ্রীক সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। ইয়াহূদীদের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রীক ভাষার কিছু প্রচলন ক্রমান্বয়ে শুরু হয়। প্রায় এক শতাব্দী পরে, খৃস্টপূর্ব ২৮৫-২৪৫ সালের দিকে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ক্রমান্বয়ে এ অনুবাদই মূল গ্রন্থের স্থান দখল করে।

প্রাচীন খৃস্টানগণ পুরাতন নিয়মের হিব্রু সংস্করণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না। বরং তাঁরা হিব্রু বাইবেলকে বিকৃত বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁরা গ্রীক অনুবাদটিকেই নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করতেন। বিশেষত দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কোনো খৃস্টান হিব্রু বাইবেলের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেন নি। উপরন্তু ১ম খৃস্টীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সকল ইয়াহূদী উপাসনালয়েও গ্রীক অনুবাদই ব্যবহৃত হতো। এ কারণে হিব্রু বাইবেলের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল খুবই কম। এ সামান্য সংখ্যক পাণ্ডুলিপিও শুধু ইয়াহূদীদের নিকটেই ছিল। ইয়াহূদীরা ৭ম ও ৮ম খৃস্টীয় শতকে লিখিত সকল পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে দেন। কারণ তাঁদের নিকট গ্রহণযোগ্য পাণ্ডুলিপির সাথে এগুলির অনেক অমিল ও বৈপরীত্য ছিল। এজন্য এ সময়ে লিখিত কোনো পাণ্ডুলিপি আধুনিক যুগের বাইবেল-গবেষকগণের নিকট পৌঁছায় নি। এ সকল পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট করার পরে তাঁদের পছন্দনীয় পাণ্ডুলিপিগুলিই শুধু অবশিষ্ট থাকে। এভাবে বিকৃতির বিশেষ সুযোগ তাদের সামনে উপস্থিত হয়।

(ঘ) প্রথম তিন শতাব্দীতে খৃস্টানগণ ও নতুন নিয়ম

প্রথম প্রজন্মগুলিতে খৃস্টানদের অবস্থাও ছিল শোচনীয়। ফলে তাঁদের মধ্যে বাইবেলের পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল খুবই কম এবং বিকৃতি-ইচ্ছুকদের জন্য সেগুলির মধ্যে বিকৃতি করার সুযোগ ছিল অনেক। খৃস্টধর্মের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ৩০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত

খৃস্টানগণ কঠিন বিপদাপদ ও রাষ্ট্রীয় অত্যাচার-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। তাঁরা দশটি রাষ্ট্রীয় হত্যাযজ্ঞের সম্মুখীন হন:

প্রথমবার: রোমান সম্রাট নিরো (**Nero**)-এর সময়ে ৬৪ খৃস্টাব্দে। এ সময়ে খৃস্টের প্রেরিত শিষ্য পিতর ও তাঁর স্ত্রী নিহত হন।[81] এ সময়ে রাজধানী রোমে ও অন্যান্য সকল প্রদেশে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। ৬৮ খৃস্টাব্দে নিরোর মৃত্যু পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। খৃস্টধর্মের স্বীকৃতিই খৃস্টানগণের জন্য কঠিন অপরাধ বলে গণ্য ছিল।

দ্বিতীয়বার: রোমান সম্রাট ডোমিশিয়ান (**Domitian**)-এর রাজত্বকালে ৮১ সালে এ হত্যাযজ্ঞের শুরু।[82] এ সম্রাটও নিরোর ন্যায় খৃস্টধর্মের শত্রু ছিলেন। তিনি খৃস্টানদেরকে হত্যার নির্দেশ দেন। ফলে সর্বত্র খৃস্টানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা শুরু হয়। এমনকি পৃথিবী থেকে সর্বশেষ খৃস্টানকেও নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করা হয়। এ সময়ে প্রেরিত যোহনকে নির্বাসিত করা হয় এবং ফ্লাবিয়াস ক্লিমেন্টকে হত্যা করা হয়। ৯৬ সালে এ সম্রাটের মৃত্যু পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে।

---

[81] আধুনিক খৃস্টধর্মের প্রবর্তক সাধু পৌলও এ সময়ে নিহত হন।

[82] ডোমিশিয়ান ছিলেন সম্রাট টিটোর ভাই, যিনি ৭০ খৃস্টাব্দে যিরুশালেম ও যুডিয়ায় ইহূদীদের মধ্যে গণ হত্যাযজ্ঞ চালান।

তৃতীয়বার: রোমান সম্রাট ট্রাজান (**Trajan**)-এর রাজত্বকালে। ১০১ খৃস্টাব্দে এই হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। ১০৮ সালে তা ভয়ঙ্করতম রূপ গ্রহণ করে। এমনকি দায়ূদ বংশের সর্বশেষ ব্যক্তিকে পর্যন্ত হত্যা করার নির্দেশ দেন তিনি। তার নির্দেশে সৈনিকের এরূপ সকলকে পাইকারীভাবে হত্যা করতে থাকে। প্রহার করে, ক্রুশে বিদ্ধ করে, পানিতে ডুবিয়ে ও বিভিন্নভাবে অনেক খৃস্টান পাদরী, বিশপ ও ধর্মগুরুকে হত্যা করা হয়। ১১৭ সালে এ সম্রাটের মৃত্যু পর্যন্ত এভাবে চলতে থাকে।

চতুর্থবার: রোমান সম্রাট মারকাস এন্টোনিয়াস (**Marcus Aurelius Antoninus**)-এর রাজত্বকালে। তিনি ১৬১ খৃস্টাব্দে রাজত্ব গ্রহণ করেন। এ সম্রাট দার্শনিক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং পৌত্তলিক রোমান ধর্মের গোঁড়া অনুসারী ছিলেন। ১৬১ খৃস্টাব্দে তিনি সর্বাত্মক নিপীড়ন ও হত্যাযজ্ঞ শুরু করেন। ১০ বৎসরেরও বেশি সময় তা অব্যাহত থাকে। পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র একভাবে খৃস্টানদেরকে হত্যা করা হয়। তিনি খৃস্টান পাদরি ও বিশপদেরকে মূর্তিপূজা ও মন্দিরের পুরোহিত হতে বলতেন। যারা অস্বীকার করত তাদেরকে লোহার চেয়ারে বসিয়ে নিচে আগুন জ্বালানো হতো। এরপর লোহার আংটা দিয়ে তার প্রজ্বলিত দেহের মাংস ছিন্নভিন্ন করা হতো।

পঞ্চমবার: রোমান সম্রাট সিভেরাস (**Septimius Severus**)-এর শাসনামলে (১৯৩-২১১খৃ.)। ২০২ খৃস্টাব্দ থেকে এই হত্যাযজ্ঞ শুরু

হয়। এ সময়ে মিসরে, ফ্রান্সে ও কার্থেজে হাজার হাজার খৃস্টানকে হত্যা করা হয়। এই পাইকারী হত্যাযজ্ঞের নির্মমতা ছিল এত ভয়ানক যে, তখনকার খৃস্টানগণ মনে করেন যে, খৃস্টারি (দাজ্জাল) বা পাপ পুরুষ (**Antichrist, Man of Sin**)-এর যুগ এসে গেছে বা কিয়ামত সন্নিকটে।

ষষ্ঠবার: রোমান সম্রাট ম্যাক্সিমিনের (**Maximin**) এর সময়ে। ২৩৫ খৃস্টাব্দে তিনি রাজত্ব গ্রহণ করেন। ২৩৭ খৃস্টাব্দে এ হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। তিনি ধর্মগুরু ও পণ্ডিতদের গণহারে হত্যার নির্দেশ দেন। কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে, ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণকে হত্যা করলে সাধারণ মানুষেরা অতি সহজেই তাঁর আনুগত্য করবে। এরপর তিনি নির্বিচারে সকল খৃস্টানকে হত্যার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশে গণহত্যা চলতে থাকে। অনেক সময় একটি গর্তে ৫০/৬০টি দেহ ফেলা হতো। এরপর তিনি রোমের সকল বাসিন্দাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় ২৩৮ সালে তারই এক সৈনিক তাকে হত্যা করে।

সপ্তমবার: রোমান সম্রাট ডেসিয়াস (**Decius**)-এর সময়ে। ২৫৩ খৃস্টাব্দে এই পাইকারী হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। এ সম্রাট সিদ্ধান্ত নেন যে, সকল খৃস্টানকে হত্যা করে তিনি খৃস্টধর্মকে সমূলে বিনাশ করবেন। এ জন্য তিনি তাঁর রাজ্যের সকল আঞ্চলিক প্রশাসককে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন। এ সময়ে কিছু খৃস্টান ধর্মত্যাগ করেন।

মিসর, আফ্রিকা, ইটালি, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়া মাইনর ছিল তাঁর এই পাইকারী নিধনযজ্ঞের কেন্দ্রবিন্দু।

অষ্টমবার: রোমান সম্রাট ভ্যলেরিয়ান (**Valerian/ Valerianus**)-এর সময়ে ২৫৭ খৃস্টাব্দে। এ সময়ে হাজার হাজার খৃস্টানকে হত্যা করা হয়। এরপর তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করেন যে, সকল বিশপ ও ধর্মযাজককে হত্যা করতে হবে। সকল সম্মানীয় খৃস্টানকে লাঞ্ছিত করতে হবে এবং তাঁদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে। এরপরও তাঁরা খৃস্টধর্ম পরিত্যাগ না করলে তাঁদেরকে হত্যা করতে হবে। সম্মানীয় মহিলাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে এবং তাঁদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। এরপর যারা খৃস্টান ছিল তাদের মধ্যে যারা রোমান দেবতা জুপিটারের পূজা করতে অস্বীকার করত তাদেরকে হত্যা করা হতো বা আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো বা হিংস্র পশুর খাদ্য হিসেবে ছেড়ে দেওয়া হতো। অন্যান্যদের বন্দি করে ক্রীতদাস বানিয়ে পায়ে বেড়ি পরিয়ে রাষ্ট্রের কাজে ব্যবহার করা হতো।

নবমবার: রোমান সম্রাট আরেলিয়ান (**Aurelian /Aurelianus**)-এর সময়ে। ২৭৪ খৃস্টাব্দে এই নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। সম্রাট এ মর্মে ফরমান জারি করেন। তবে এবারের নিধনযজ্ঞ বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। কারণ বৎসরখানেক পরে সম্রাট নিজেই নিহত হন।

দশমবার: রোমান সম্রাট ডিওক্লেশিয়ান (**Diocletian/ Diocleti-anus**)-এর শাসনামলে। তিনি ২৮৪ খৃস্টাব্দে রাজত্ব গ্রহণ করেন। ২৮৬ সাল থেকে তিনি খৃস্টানদের নিপীড়ন শুরু করেন। ৩০২ খৃস্টাব্দে তা মহা-নিধনযজ্ঞে পরিণত হয় এব ৩১৩ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। রোমান রাজ্যের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্র পাইকারী হারে খৃস্টানদের হত্যা করা হয়। ৩০২ সালে ফ্রিজিয়া শহরকে একবারে এমনভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয় যে, সেখানে একজন খৃস্টানও অবশিষ্ট থাকেন নি।

সম্রাট ডিওক্লেশিয়ান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, পৃথিবীর বুক থেকে বাইবেলের অস্তিত্ব মুছে দিবেন। এ জন্য তিনি অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে চেষ্টা করেন। ৩০৩ খৃস্টাব্দে তিনি সকল চার্চ-গীর্জা ভেঙ্গে ফেলার ও সকল ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি খৃস্টানদের উপাসনার জন্য একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ করে দেন। তাঁর নির্দেশানুসারে সকল গীর্জা ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে যত প্রকারের ধর্মীয় পুস্তক পাওয়া যায় তা সবই পুড়িয়ে ফেলা হয়। যে ব্যক্তি এই নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানায় বা যে ব্যক্তি কোনো ধর্মীয় পুস্তক গোপন করে রেখেছে বলে সন্দেহ করা হয় তাকে নির্মমভাবে শাস্তি প্রদান করা হয়। খৃস্টানগণ উপাসনার জন্য সমবেত হওয়া বন্ধ করে দেন। ইউসেবিয়াস (**Eusebius**) লিখেছেন যে, তিনি নিজে স্বচক্ষে গীর্জাগুলি ভেঙ্গে

ফেলতে এবং বাইবেল বা পবিত্র পুস্তকগুলিকে বাজারের মধ্যে পুড়িয়ে ফেলতে দেখেছেন।

এ সম্রাট মিসরের শাসককে নির্দেশ দেন মিসরের কপ্টিক খৃস্টানদেরকে রোমান প্রতিমা পূজা করতে বাধ্য করতে। যারা এ আদেশ মানবে না তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশে ৮,০০,০০০ (আট লক্ষ) কপ্টিক খৃস্টানকে হত্যা করা হয়। এজন্য তার যুগকে "শহীদদের যুগ" বলা হয়। তিনি প্রতিদিন ৩০ থেকে ৮০ জন খৃস্টান হত্যা করতেন। তার হত্যাযজ্ঞ ১০ বৎসর স্থায়ী হয় এবং পুরো রোমান রাজ্যের সর্বত্র হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে। এ হত্যাযজ্ঞ পূর্ববর্তী ঘটনাগুলির চেয়ে অধিক হিংস্র ও অধিক সময় স্থায়ী হয়।

খৃস্টানগণ ঘটনাগুলির যেরূপ বিবরণ দিয়েছেন তা যদি আংশিকও সত্য হয় তবে কখনোই কল্পনা করা যায় না যে, এ সময়ে খৃস্টানদের মধ্যে বাইবেলের অনেক কপি বিদ্যমান বা প্রচলিত ছিল। একথাও চিন্তা করা যায় না যে, তাঁরা তাঁদের ধর্মগ্রন্থকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে, বিশুদ্ধ রাখতে ও এ বিষয়ে গবেষণা পর্যালোচনা করতে পেরেছেন। বরং এ সময় ছিল বিকৃতিকারীদের জন্য বাইবেল বিকৃত করার সুবর্ণ সুযোগ। তারা ইচ্ছামত বিকৃতি ও জালিয়াতি করার অনেক সুযোগ পেয়েছিল। পাঠক জেনেছেন যে, খৃস্টীয় প্রথম

শতকে খৃস্টানদের মধ্যে বিভ্রান্ত দল উপদলের সংখ্যা ছিল অনেক এবং তারা সকলেই বাইবেল বিকৃত করতেন।[83]

---

[83] এখানে আরো কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

(১) প্রথম কয়েক শতাব্দীর খৃস্টানগণ, বিশেষত যীশুর যুগ ও তার পরবর্তী প্রজন্মের খৃস্টানগণ কখনোই ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষণের কথা চিন্তা করেন নি। উপরন্তু তারা ধর্মগ্রন্থ বা সুসমাচার লিখে রাখা বা সংরক্ষণ করার বিরোধিতা করতেন এবং একে পাগলামি বলে মনে করতেন। কারণ, তাঁরা সুনিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতেন যে, অচিরেই- তাদের জীবদ্দশাতেই- কিয়ামত বা মহাপ্রলয়, পুনরুত্থান ও মহাবিচার সংঘটিত হবে। জীবিতরা রূপান্তরিত হবে এবং মৃতরা উত্থিত হবে। যীশু স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন এবং খৃস্টানদেরকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন। তাদের মধ্যে প্রচলিত যীশু ও প্রেরিতদের বিভিন্ন বাণী ও বক্তব্য থেকেই তারা তা বিশ্বাস করতেন। যীশুর এ সকল বাণী ও বক্তব্য বিভিন্ন সুসমাচার ও পত্রে এখনো বিদ্যমান। এ অর্থে অনেক বক্তব্য নতুন নিয়মের পত্রাবলিতে বিদ্যমান। থিষলনীকীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের ১ম পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে: "১৫ কেননা আমরা প্রভুর বাক্য দ্বারা তোমাদিগকে ইহা বলিতেছি যে, আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকিব, আমরা কোন ক্রমেই সেই নিদ্রাগত লোকদের অগ্রগামী হইব না। ১৬ কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে তাহারা প্রথমে উঠিবে। ১৭ পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব; আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব।" করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্রের ১৫ অধ্যায়ে রয়েছে: "৫১ দেখ, আমি তোমাদিগকে এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি;

আমরা সকলে নিদ্রাগত হইব না, কিন্তু সকলে রূপান্তরীকৃত হইব; ৫২ এক মুহূর্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, শেষ তূরীধ্বনিতে হইবে; কেননা তূরী বাজিবে, তাহাতে মৃতেরা অক্ষয় হইয়া উত্থাপিত হইবে, এবং আমরা রূপান্তরীকৃত হইব।" এভাবে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, তারা মরবেন না, বরং তাদের জীবদ্দশাতেই কিয়ামত শুরু হবে এবং তারা শুধু রূপান্তরিত হয়ে স্বর্গে যাবে।

যীশু যোহনের বিষয়ে পিতরকে বলেন: "আমি যদি ইচ্ছা করি, এ আমার আগমন পর্যন্ত থাকে, তাহাতে তোমার কি?" (যোহন ২১/২২) এ কথা থেকে শিষ্যরা বুঝেন যে, যীশুর পুনরাগমণের পূর্বে যোহন মরবেন না। আর ঘটনাক্রমে যোহন দীর্ঘ আয়ু লাভ করেন। (অথবা যোহনের দীর্ঘায়ুর কারণেই এ কথাটি যীশুর নামে জালিয়াতি করে প্রচার করা হয়েছিল।) যীশুর পরেও তিনি প্রায় শতবৎসর বেঁচে ছিলেন। ফলে তাঁদের বিশ্বাস আরো জোরালো হয়। প্রতিদিনই তাঁরা কিয়ামতের অপেক্ষা করতেন।

এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাঁরা সুসমাচার বা ধর্মপুস্তক লিখতে নিষেধ করতেন। প্রকাশিত বাক্যের ২২ অধ্যায়ে যীশুর কথাগুলি নিম্নরূপ: "৭ আর দেখ, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।... ১০ তুমি এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল মুদ্রাঙ্কিত করিও না; কেননা সময় সন্নিকট।... ২০ আমি শীঘ্র আসিতেছি।"

(২) উপরের বিশ্বাসের সাথে দ্বিতীয় একটি প্রগাঢ় বিশ্বাস তাদের মধ্যে ছিল, তা হলো, যীশু মূসার শরীয়ত পূর্ণ করতে এসেছিলেন। কাজেই পুরাতন নিয়মকেই তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ বলে বিশ্বাস করতেন এবং পাঠ করতেন, যীশুর সুসমাচার বা শিক্ষা সংকলন বা সংরক্ষরণের কোনোরূপ নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টাই তাঁরা করেন নি। দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে যীশুর শিক্ষা, সুসমাচার, প্রেরিতদের পত্র ইত্যাদি নামে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক কিছু মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রচারিত হয়। কিন্তু এগুলির কোনো গুরুত্ব দেয় নি খৃস্টান চার্চ। সাধু আরিয়ানুস **(Saint**

উপরের বিষয়গুলির আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের নিকট থেকে তাঁদের ধর্মগ্রন্থগুলির অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা বা বিশুদ্ধতার প্রমাণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়মের কোনো একটি পুস্তকেরও লেখক থেকে কেনো অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা তাঁদের নিকট সংরক্ষিত নেই। ইয়াহূদীগণের নিকটেও নেই এবং খৃস্টানগণের নিকটেও নেই। ইযহারুল হক্কের প্রণেতা আল্লামা রাহমাতুল্লাহ তাঁর সাথে প্রকাশ্য বিতর্কের সময় (১৮৫৪ খৃস্টাব্দে) পাদ্রী মি. ফানডার ও মি. ফ্রেঞ্চ-এর নিকট এরূপ সূত্র দাবি করেন। তাঁরা একথা বলে ওজরখাহি পেশ করেন যে, এ সকল গ্রন্থের সূত্র আমরা হারিয়ে ফেলেছি। খৃস্টধর্মের শুরু থেকে ৩১৩ বৎসর পর্যন্ত আমাদের উপর যে জুলুম-অত্যাচার হয়েছিল তার

Irenaeus/Irenaeus) ২০০ খৃস্টাব্দের দিকে সর্বপ্রথম খৃস্টধর্মকে একটি কেতাবী ধর্ম হিসাবে রূপ প্রদানের চেষ্টা শুরু করেন। দেখুন: **Oxford Illustrated History of Christianity, New York, Oxford University Press, 1990, page 30-31.** তারিখ কানীসাতিল মাসীহ, পৃষ্ঠা ৪৫।

(৩) খৃস্টধর্মের প্রথম ২০০ বৎসরের ইতিহাসে গসপেল বা সুসমাচারের কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না। কোথাও পাওয়া যায় না যে, কোনো মন্ডলীতে বা চার্চে "গসপেল" পাঠ করা হতো, সংরক্ষণ করা হতো বা এগুলির প্রচার বা শিক্ষার কোনোরূপ চেষ্টা করা হতো। এত অত্যাচারের মধ্যেও বিভিন্ন ধর্মগুরুদের চিঠিপত্র যত্ন সহকারে বিভিন্ন চার্চে সংরক্ষণ করা হয়েছে, কিন্তু কোথাও "গসপেল" বা সুসমাচারের সংরক্ষণের সামান্যতম উল্লেখ নেই।

ফলে এ গ্রন্থগুলির সূত্র পরম্পরার বিবরণ আমাদের নিকট থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

এভাবে প্রমাণিত হয় যে, ধারণা ও অনুমান ছাড়া কোনো প্রকার সূত্র (**chain of authorities**) ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের কাছে নেই। তাদের নিকট অতিপ্রাচীন কোনো পাণ্ডুলিপি নেই। যে সকল পাণ্ডুলিপি তারা "প্রাচীন" বলে দাবি করেন সেগুলি খৃস্টীয় ৪র্থ/৫ম শতকের বা তার পরের বলে তারাই দাবি করেন। আর এসকল প্রাচীন বলে কথিত পাণ্ডুলিপিগুলি প্রকৃতপক্ষে কবে, কখন বা কোথায় লেখা হয়েছে তার কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই।

মুসলিম লেখকগণ সাধারণত তাঁদের লেখা বই-পুস্তক বা পাণ্ডুলিপির শেষে লিখেন যে, অমুক সালের অমুক তারিখে পুস্তকটির রচনা বা অনুলিপি করা শেষ হলো। অনুলিপির ক্ষেত্রে অনুলিপিকারের নামও তাঁরা লিখেন। এধরনের কোনো কথা বাইবেলীয় পাণ্ডুলিপির কোথাও লেখা নেই। কে এই অনুলিপি করেছেন, কবে, কখন বা কোথায় তা করেছেন কিছুই তাতে উল্লেখ করা হয় নি। খৃস্টান পণ্ডিতগণ কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ভিত্তিতে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে বলেন যে, সম্ভবত অমুক শতকে বা অমুক শতকে তা লেখা হয়েছিল। এই প্রকারের ধারণা ও অনুমান বিতর্কের ক্ষেত্রে বিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায় না।

খৃস্টান প্রচারকগণ বিভ্রান্তিমূলকভাবে প্রচার করেন যে, কুরআনে যেহেতু ইয়াহূদী-খৃস্টানগণকে "আহল কিতাব" বলা হয়েছে এবং তাদের নিকট কিতাব আছে, কিতাবের মধ্যে আল্লাহর বিধান আছে ইত্যাদি কথা বলা হয়েছে, সেহেতু কুরআন থেকে বুঝা যায় যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত বাইবেল বিশুদ্ধ ছিল।

তাদের এ সকল কথা জঘন্য মিথ্যাচার ছাড়া কিছুই নয়। কুরআনে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ তাদের কিতাব বিকৃত করেছে, নিজে হাতে পুস্তক রচনা করে তা "আল্লাহর কিতাব" বলে চালিয়েছে, তাদের উপর অবতীর্ণ অনেক কিতাব ও বিধান তারা ভুলে গিয়েছে বা হারিয়ে ফেলেছে। এজন্য আমরা মুসলিমগণ বিশ্বাস ও প্রমাণ করি যে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগেই বাইবেলের পুস্তকগুলি বিকৃত হয়েছে।

আমরা কখনোই দাবি করি না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ পর্যন্ত বাইবেল অবিকৃত ছিল এবং এরপর তা বিকৃত হয়েছে। বরং কুরআনের নির্দেশনার আলোকে মুসলিম উম্মাহ একমত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বেই এ সকল পুস্তক বিকৃত হয়েছে এবং এগুলির সূত্র হারিয়ে গিয়েছে। এছাড়া তাঁর যুগের পরেও এরূপ বিকৃতির ধারা অব্যাহত থেকেছে।

খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, তাদের নিকট ৪র্থ-৫ম শতকে লেখা বাইবেলের কিছু পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, বাইবেল

বিকৃত নয়। প্রকৃতপক্ষে এ সকল পাণ্ডুলিপি প্রমাণ করে যে, বাইবেল বিকৃত। কারণ এ সকল পাণ্ডুলিপির একটির সাথে আরেকটির ব্যাপক অমিল ও বৈপরীত্য রয়েছে। এগুলির মধ্যে জাল ও ভিত্তিহীন পুস্তকাদি রয়েছে বলে তারাই স্বীকার করেন। এ সকল "প্রাচীন" পান্ডলিপি প্রমাণ করে, তাদের পূর্বসূরীরা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলিকে কিভাবে বিকৃত করতেন এবং এগুলির মধ্যে জাল ও বানোয়াট পুস্তকাদি ঢুকাতেন।

উপরের আলোচনা থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাইবেলের উভয় নিয়মের পুস্তকগুলিতে ব্যাপক বৈপরীত্য, ভুলভ্রান্তি ও সর্বপ্রকারের বিকৃতি বিদ্যমান। আর এসকল পুস্তকের কোনো সূত্র বা উৎস তাদের নিকট সংরক্ষিত নেই। তাঁরা যা কিছু বলেন সবই আন্দায-অনুমান মাত্র। আর আন্দায-অনুমান দিয়ে সত্যকে পাওয়া যায় না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ:

নতুন ও পুরাতন নিয়মে রহিত বিধান

মুসলিমদের সাথে ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণের বিতর্কের অন্যতম বিষয় রহিতকরণ বিষয়। মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহ তার কোনো বিধান ইচ্ছা করলে রহিত করতে পারেন। এ পরিচ্ছেদে বিষয়টি আলোচনা করা হবে। ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ অত্যন্ত আপত্তিসহকারে এ বিশ্বাসের প্রতিবাদ করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহর কোনো বিধান কোনোভাবে রহিত হতে পারে না। এ পরিচ্ছেদে পুরাতন ও নতুন নিয়মের আলোকে আল্লাহর বিধানের রহিত হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করা হবে।

১. ৪. ১. ইসলামী পরিভাষায় রহিতকরণ

১. ৪. ১. ১. নাসখ বা রহিতকরণের অর্থ

'নাস্খ' (نسخ) শব্দের সাধারণ অর্থ রহিত করা, সরিয়ে দেওয়া, বাতিল করা, স্থগিত করা, লোপ করা, পরিবর্তন করা (**abrogate, abolish, invalidate, repeal, withdraw, annulment**)।

আরবী ভাষায় নাসখ শব্দটি মূলত দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়:

১. বাতিল করা বা অপসারিত করা। বলা হয়: সূর্য ছায়া 'নাসখ' করেছে এবং ঝড় পদচিহ্ন 'না্সখ' করেছে, অর্থাৎ অপসারিত করেছে। এ অর্থে আল্লাহ বলেন: "আমি যদি কোনো আয়াত নাসখ

(অপসারিত) করি বা ভুলিয়ে দিই তবে তা থেকে উত্তম অথবা তারই অনুরূপ আনয়ন করি।”[84]

অন্যত্র তিনি বলেন: “শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা নাসখ (বাতিল বা অপসারিত) করেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।”[85]

২. স্থানান্তর ও পরিবর্তন। এ অর্থে বলা হয়: কিতাবটি নাসখ করেছে, অর্থাৎ অনুলিপি তৈরির মাধ্যমে পুস্তকটির বিষয়বস্তু স্থানান্তর করেছে। বলা হয়: মৌমাছি মধু ‘নাসখ’ করেছে, অর্থাৎ এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করেছে। এ অর্থে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে:

“তোমরা যা কর্ম করতে আমি তা নাসখ (লিপিবদ্ধ) করতাম।”[86]

ইসলামী পরিভাষায় ‘নাসখ’ বা ‘রহিতকরণ’ **(abrogation)** অর্থ হলো ‘সকল শর্ত পূরণ করেছে এমন কোনো কর্ম বিষয়ক বিধানের পালনীয়তার সময়সীমার সমাপ্তি ঘোষণা করা।’

১. ৪. ১. ২. ইসলামী পরিভাষায় রহিতকরণের ক্ষেত্র

ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে এই প্রকারের রহিতকরণ বা ‘কার্যকারিতার সমাপ্তি ঘোষণা’ শুধু ‘কর্ম বিষয়ক বিধানের’ ক্ষেত্রেই

---

[84] সূরা (২) বাকারা: ১০৬ আয়াত।

[85] সূরা (২২) হজ্জ: ৫২ আয়াত।

[86] সূরা (৪৫) জাসিয়াহ: ২৯ আয়াত।

ঘটতে পারে, কোনো স্বতঃসিদ্ধ সত্য, জ্ঞানভিত্তিক তথ্য, গল্প-কাহিনী বা ঘটনার বর্ণনায় এই প্রকারের রহিত করণ ঘটতে পারে না। যেমন, 'এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন' এই তথ্যটির সত্যতা ও পালনীয়তা চিরন্তন।

অনুরূপভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো বিষয়কে 'রহিত' বা 'কার্যকরিতা সমাপ্ত' করা যায় না। যেমন দিনের আলো এবং রাতের অাঁধার। অনুরূপভাবে 'প্রার্থনা' বিষয়ক বাক্য রহিত হয় না এবং চিরন্তন সত্যও 'রহিত' হয় না। যেমন 'ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হও এবং ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করিও না'। এই প্রকারের চিরন্তন সত্য রহিত হয় না।

যে সকল বিধান প্রদানের সময়েই তা চিরস্থায়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে সে সকল বিধানও রহিত বা স্থগিত হয় না। যেমন নিরপরাধ নারীদেরকে মিথ্যা অপবাদ প্রদানকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: "এবং কখনোই তোমরা তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।"[87] আবার যে সকল বিধান প্রদান করার সময়েই তাকে অস্থায়ী বা সময়িক বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পূর্বে রহিত করা যায় না। অনুরূপভাবে দুআ বা প্রার্থনা রহিত হয় না।

[87] সূরা নূর: ৪ আয়াত।

ইসলামী পরিভাষায় রহিতকরণ বা স্থগিতকরণ শুধু সে সকল বিধানের বিষয়ে ঘটতে পারে, যেগুলি কর্ম বিষয়ক, চিরস্থায়ী নয় এবং সাময়িকও নয় এবং যেগুলির বাস্তবায়ন থাকা ও না থাকা উভয়েরই সম্ভাবনা বিরাজমান। এই প্রকারের বিধানগুলিকে 'উন্মুক্ত বিধান' বলা হয়।

১. ৪. ১. ৩. রহিতকরণ বনাম মত-পাল্টানো

ইয়াহূদী ধর্মে একটি বিশ্বাস আছে যাকে "আল-বাদা" বলা হয়। এর অর্থ কোনো অপ্রকাশিত বিষয় প্রকাশিত হওয়া। এর দ্বারা বুঝানো হয় যে, মহান আল্লাহ কোনো একটি বিষয়ের পরিণাম ও পরিণতি না জেনে বা না বুঝেই সে বিষয়ে আদেশ বা নিষেধ প্রদান করেন। এরপর নতুন একটি মত তার কাছে প্রকাশিত হয়। তখন তিনি পূর্বে বিধান রহিত করে নতুন বিধান প্রদান করেন। এরূপ বিশ্বাসের দ্বারা মহান আল্লাহকে অজ্ঞ বা অপরিণামদর্শী বলে দাবি করা হয়, নাউযূ বিল্লাহ! তিনি এরূপ বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস থেকে অতি পবিত্র ও অনেক ঊর্ধ্বে।

ইসলামী পরিভাষায় 'রহিতকরণ' বা 'স্থগিতকরণ' এরূপ কিছুই নয়। ইসলামী পরিভাষায় এর অর্থ হলো, মহান আল্লাহ জানতেন যে, এ বিধানটি অমুক সময় পর্যন্ত তাঁর বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত থাকবে এবং এরপর তা স্থগিত হবে। যখন তাঁর জানা সেই সময়টি এসে গেল তখন তিনি নতুন বিধান প্রেরণ করলেন। এ নতুন বিধানের

মাধ্যমে সে পূর্বতন বিধানটির আংশিক বা সামগ্রিক পরিবর্তন সাধন করতেন। প্রকৃত পক্ষে এ হলো পূর্বতন বিধানের কার্যকরিতার সময়সীমা জানিয়ে দেওয়া। তবে যেহেতু পূর্বতন বিধানটি প্রদানের সময় এর সময়সীমা উল্লেখ করা হয় নি, সেহেতু, নতুন বিধানটির আগমনকে আমরা আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে বাহ্যত 'পরিবর্তন' বলে মনে করি। এরূপ 'রহিতকরণ' যুক্তি বা বিবেকের দৃষ্টিতে অসম্ভব নয়। মহান আল্লাহর ক্ষেত্রেও তা তাঁর মহত্ব বা মর্যাদার পরিপন্থী নয়। এরূপ রহিতকরণের মধ্যে মানব জাতির জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মানুষ অনেক সময় এরূপ পরিবর্তনের কল্যাণ বুঝতে পারে, অনেক সময় তা পারে না। তবে সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর সকল নির্দেশ ও বিধানই মানুষের মঙ্গল অর্জনের জন্য অথবা অমঙ্গল বর্জন বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

মহান আল্লাহই শুধু মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ ও মঙ্গল-অমঙ্গলের গোপন বিষয় অবগত আছেন। তিনিই জানেন কখন কোন বিধানের কার্যকরিতা শেষ হওয়া মানুষের জন্য কল্যাণকর। এজন্য একমাত্র তিনিই কোনো বিধান রহিত বা স্থগিত করতে পারেন। পক্ষান্তরে "প্রকাশ পাওয়া", "মত পাল্টানো" বা নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে অসম্ভব। কারণ তিনি অনাদি, অনন্ত ও অসীম জ্ঞানের অধিকারী। কখন কি ঘটবে তা সবই তিনি জানেন। ফলাফল

দেখে মতপাল্টনো, বা নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ মানুষের ক্ষেত্রে সম্ভব, কারণ মানুষের জ্ঞান অতি সীমিত।

১. ৪. ১. ৪. কাহিনী ও ঐতিহাসিক বিবরণ রহিত হয় না

উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে পাঠক বুঝতে পারছেন যে, কোনো গল্প, কাহিনী বা ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ 'রহিত' বা 'স্থগিত' হয় না। কাজেই বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের কোনো গল্প-কাহিনী আমাদের মতে রহিত নয়। তবে সেগুলির মধ্যে অনেক মিথ্যা কাহিনী আছে। যেমন:

(১) লোট বা লূত আলাইহিস সালাম মদ খেয়ে মাতাল হন এবং তার দুই কন্যার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। তাঁর কন্যাদ্বয় এই ব্যভিচারের মাধ্যমে পিতাকর্তৃক গর্ভধারণ করেন। আদিপুস্তকের ১৯ অধ্যায়ে এই 'কাহিনী'টি উল্লেখ করা হয়েছে।[88]

(২) য্যাকোব (ইয়াকূব আ)-এর পুত্র যিহূদা তাঁর পুত্রবধু তামর-এর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। ব্যভিচারের ফলে তামর গর্ভবতী হন এবং পেরস ও সেরহ নামে যমজ পুত্রদ্বয় প্রসব করেন। আদিপুস্তকের ৩৮ অধ্যায়ে এই 'কাহিনী' উল্লেখ করা হয়েছে।[89] দায়ূদ, শলোমন ও যীশুখৃস্ট সকলেই পেরস নামের এ জারজ

---

[88] আদিপুস্তক ১৯/৩০-৩৮।

[89] আদিপুস্তক ৩৮/১২-৩০।

সন্তানের বংশধর। মথিলিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[90]

(৩) দায়ূদ আলাইহিস সালাম ঊরিয়র স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন এবং এই ব্যভিচারের ফলে স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হন। তখন দায়ূদ সেনাপতিকে পরামর্শ দেন কৌশলে যুদ্ধের মাঠে ঊরিয়াকে বধ করার জন্য। এভাবে ঊরিয়া নিহত হয় এবং দায়ূদ তার স্ত্রীকে ভোগ করেন। ২ শমূয়েলের ১১শ অধ্যায়ে 'কাহিনীটি' উল্লেখ করা হয়েছে।[91]

(৪) শলোমন (সুলাইমান আ.) শেষ বয়সে ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যান। তিনি মূর্তিপূজা শুরু করেন এবং মূর্তির জন্য উপাসনালয় তৈরি করেন। ১ রাজাবলির ১১ অধ্যায়ে এই 'কাহিনীটি' উল্লেখ করা হয়েছে।[92]

(৫) হারোণ আলাইহিস সালাম একটি গো-বৎসের মুর্তি তৈরি করেন এবং তার পূজা করেন। উপরন্তু তিনি ইস্রায়েল সন্তানগণকে তা পূজা করতে নির্দেশ দেন। যাত্রাপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে এই 'কাহিনীটি' উল্লেখ করা হয়েছে।[93]

---

[90] মথি ১/৩-১৬।

[91] ২ শমূয়েল ১১/১-২৭।

[92] ১ রাজাবলি ১১/১-১৩।

[93] যাত্রাপুস্তক ৩২/১-৩৫।

এসকল ‘কাহিনী’ এবং অনুরূপ আরো অনেক কাহিনী আমাদের মতে মিথ্যা ও বাতিল। আমরা বলি না যে, এগুলি রহিত বা স্থগিত।

১. ৪. ১. ৫. যাবূর দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জিল দ্বারা যাবূর রহিত হয় নি

চিরন্তন ও স্বতঃসিদ্ধ চিরস্থায়ী সত্য, জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় লব্ধ তথ্যাদি, সর্বজনীন বিধানাদি, চিরস্থায়ী বিধানাদি, সাময়িক বিধানাদির সময়কাল শেষ হওয়ার পূর্বে এবং সাধারণ বা উন্মুক্ত বিধানের স্থান কাল ও পাত্র একই হলে তা রহিত হতে পারে না। কারণ এইরূপ রহিতকরণ আপত্তিকর।

অনুরূপভাবে প্রার্থনার বাক্যাবলিও রহিত হয় না। এজন্য যাবূর বা ‘গীতসংহিতা’ আমাদের দৃষ্টিতে পারভিাষিকভাবে রহিত বা স্থগিত নয়। আমরা কখনোই বলি না যে, গীতসংহিতা বা যাবূরের দ্বারা তোরাহ রহিত হয়েছে এবং ইঞ্জিল বা নতুন নিয়মের আগমনে ‘যাবূর’ রহিত হয়েছে। কারণ যাবূর মূলত প্রার্থনা বা দুআর সমষ্টি, যা রহিত করে না বা রহিত হয় না।

ইসলামে যাবূরসহ পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকাবলি ব্যবহার করতে বা সেগুলির উপর নির্ভর করতে নিষেধ বা আপত্তি করার কারণ এ নয় যে, এগুলিতে বর্ণিত সকল প্রার্থনা, কাহিনী... ইত্যাদি সবকিছু রহিত হয়ে গিয়েছে। বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদি ব্যবহারে আপত্তির কারণ হলো, এগুলি সত্যই মোশি, দায়ূদ,

যীশু প্রমুখ ভাববাদীর প্রদত্ত সঠিক পুস্তক কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এ সকল পুস্তকের কোনো অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা সংরক্ষিত নেই এবং এগুলিতে সকল প্রকারের বিকৃতি ঘটেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১. ৪. ২. বাইবেলের পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিত বিধানাদি

উপর্যুক্ত বিষয়গুলি ছাড়া সাধারণ উন্মুক্ত কর্মবিষয়ক বিধানাবলি রহিত হতে পারে। আমরা স্বীকার করি যে, তোরাহ ও ইঞ্জিল বা পুরাতন ও নতুন নিয়মের কিছু কিছু উন্মুক্ত সাধারণ রহিত হওয়ার যোগ্য বিধান ইসলামী শরীয়তে বা ইসলামী ব্যবস্থায় রহিত ও স্থগিত করা হয়েছে। আমরা বলি না যে, পুরাতন ও নতুন নিয়মের সকল বিধানই রহিত হয়েছে। বরং আমরা বলি যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনেক বিধান নিশ্চিতরূপেই অপরিবর্তিত ও কার্যকর রয়েছে। যেমন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা, শিরক, মূর্তিপূজা ইত্যাদি বর্জন করা, মিথ্যা শপথ, হত্যা, ব্যভিচার, সমকামিতা, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য, প্রতিবেশির সম্পদ বা সম্মানের ক্ষতি করার বিষয়ে তোরাহ এর নিষেধাজ্ঞা এখনও অপরিবর্তিত ও কার্যকর রয়েছে। পিতামাতার সম্মান ও সেবার আবশ্যকতা, পিতা, পুত্র, মাতা, কন্যা, চাচা, ফুফু, মামা, খালাকে বিবাহ করার নিষেধাজ্ঞা, দুই বোনকে একত্রে বিবাহ

করার নিষেধাজ্ঞা ও অনুরূপ আরো অনেক বিধান অপরিবর্তিত ও কার্যকর রয়েছে।

১. ৪. ৩. বাইবেলে বিদ্যমান রহিতকরণের প্রকারভেদ

রহিতকরণ শুধু ইসলামের বিষয় নয়। পূর্ববর্তী সকল ব্যবস্থায় ও সকল ধর্মেই 'রহিতকরণের' অনেক ঘটনা ঘটেছে। রহিতকরণ দুই প্রকারের: প্রথমত, পরবর্তী ভাববাদীর ব্যবস্থায় পূর্ববর্তী ভাববাদীর কোনো ব্যবস্থা রহিত বা স্থগিত করা হবে। দ্বিতীয়ত, একই ভাববাদীর ব্যবস্থার মধ্যে একটি বিধান রহিত করে অন্য বিধান দেওয়া হবে। উভয় প্রকারের 'রহিতকরণ'ই পূর্ববর্তী ভাববাদিগণের ব্যবস্থায় ঘটেছে বলে বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। যেহেতু ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, ঈশ্বরের বিধান কখনোই রহিত হতে পারে না, সেহেতু এখানে তাদের দাবির অসারতা প্রমাণের জন্য কিছু উদাহরণ পেশ করছি।

১. ৪. ৩. ১. পরবর্তী ব্যবস্থায় পূর্ববর্তী ব্যবস্থার রহিতকরণ

প্রথমে পরবর্তী নবীর শরীয়ত বা ব্যবস্থায় পূর্ববর্তী নবীর শরীয়ত বা ব্যবস্থার নাসখ বা রহিতকরণের কিছু উদাহরণ পেশ করছি:

১. ভাই-বোনের বিবাহের বৈধতা রহিত

আদম আলাইহিস সালাম-এর শরীয়তে বা ব্যবস্থায় ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ বৈধ ছিল। তাঁর সন্তানগণ এভাবে বিবাহ-শাদি

করতেন।[94] পরে মোশির ব্যবস্থায় ভগ্নিকে বিবাহ করা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। আপন ভগ্নি, বৈমাত্রেয় ভগ্নি ও বৈপিত্রেয় ভগ্নি সকল প্রকারের ভগ্নিকে বিবাহ করাই নিষিদ্ধ। এরূপ বিবাহ ব্যভিচার বলে গণ্য এবং এরূপ বিবাহকারী অভিশপ্ত। এরূপ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রী উভয়কে হত্যা করা অত্যাবশ্যক। লেবীয় পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের ৯ শ্লোকে বলা হয়েছে: "তোমার ভগিনী, তোমার পিতৃকন্যা কিম্বা তোমার মাতৃকন্যা, গৃহজাতা হউক কিম্বা অন্যত্র জাতা হউক, তাহাদের আবরণীয় অনাবৃত করিও না।"

লেবীয় ২০/১৭ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "আর যদি কেহ আপন ভগিনীকে, পিতৃকন্যাকে কিম্বা মাতৃকন্যাকে গ্রহণ করে, ও উভয়ে উভয়ের্ আবরণীয় দেখে, তবে তাহা লজ্জাকর বিষয়; তাহারা আপন জাতির সন্তানদের সাক্ষাতে হত্যাকৃত[95] হইবে; আপন ভগিনীর আবরণীয় অনাবৃত করাতে সে আপন অপরাধ বহন করিবে।"

দ্বিতীয় বিবরণ ২৭/২২: "যে কেহ আপন ভগিনীর সহিত, অর্থাৎ পিতৃকন্যার কিম্বা মাতৃকন্যার সহিত শয়ন করে, সে শাপগ্রস্থ।"

---

[94] বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী অবরাহামের স্ত্রী সারা আবরাহামের বৈমাত্রেয় ভগ্নি ছিলেন। আদিপুস্তক ২০/১২।

[95] বাংলা বাইবেলে এখানে 'হত্যাকৃত'-এর পরিবর্তে "উচ্ছিন্ন" বলা হয়েছে। আরবীতে 'হত্যাকৃত' বলা হয়েছে। ইংরেজি বাইবেলের পাঠ নিম্নরূপ: **(and they shall be cut off in the sight of their people)**।

এথেকে প্রমাণিত হলো যে, আদম আলাইহিস সালাম-এর ব্যবস্থায় (শরীয়তে) ভগিনীকে বিবাহ করা বৈধ ছিল। তা নাহলে প্রমাণিত হবে যে, সকল আদম-সন্তান 'ব্যভিচার-তুল্য বিবাহের' জারজ সন্তান এবং আদমের সন্তানগণ যারা এরূপ বিবাহ করেছিলেন তাঁরা সকলেই ব্যভিচারী ছিলেন, হত্যাযোগ্য অপরাধে অপরাধী ছিলেন এবং অভিশপ্ত ছিলেন। সঠিক কথা হলো, এরূপ বিবাহ পূর্বতন ভাববাদিগণের ব্যবস্থায় বৈধ ছিল, এরপর মোশির ব্যবস্থায় এই বৈধতা 'রহিত' করা হয়।

২. সকল প্রাণী ভক্ষণের জন্য বৈধ ছিল পরে তা রহিত করা হয়

আদিপুস্তকের ৯ম অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে নোহের সন্তানদেরকে উদ্দেশ্য করে ঈশ্বর বলেন: "প্রত্যেক গমনশীল প্রাণী তোমাদের খাদ্য হইবে (**Every moving thing that liveth shall be meat for you);** আমি হরিৎ ওষধির (**green herb**) ন্যায় সে সকল তোমাদিগকে দিলাম।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, নোহ-এর ব্যবস্থায় সকল প্রাণীই সবুজ শাকশব্জি-ফলমুলের মত বৈধ বা হালাল ছিল। পরবর্তীকালে মোশির ব্যবস্থায় অনেক প্রাণীর বৈধতা "রহিত" করে সেগুলি ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। লেবীয় পুস্তকের ১১/৪-৮ এবং দ্বিতীয় বিবরণের ১৪/৭-৮-এ যে বিষয়ে বিস্তারিত বলা হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় বিবরণের ১৪/৭-৮ উদ্ধৃত করছি: "(৭) কিন্তু যাহারা জাওর

কাট, কিম্বা দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট, তাহাদের মধ্যে এইগুলি ভোজন করিবে না: উষ্ট্র, শশক (**hare**: খরগোশ) ও শাফন (**coney**: খরগোশ); কেননা তাহারা জাওর কাটে বটে, কিন্তু দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট নয়, তাহারা তোমাদের পক্ষে অশুচি; (৮) আর শূকর দ্বিখণ্ড খুরবিশিষ্ট বটে, কিন্তু জাওর কাটে না, সে তোমাদের পক্ষে অশুচি; তোমরা তাহাদের মাংস ভোজন করিবে না, তাহাদের শব স্পর্শও করিবে না।"

৩. দুবোনকে একত্রে বিবাহ করা বৈধ ছিল পরে রহিত করা হয়

যাকোব (ইয়াকূব আ) লেয়া ও রাহেল নামক দু বোনকে বিবাহ করেন। এ দুইজনই ছিলেন তাঁর মামাতো বোন। আদিপুস্তকের ২৯ অধ্যায়ের ১৫-৩৫ শ্লোকে বিষয়টি স্পষ্ট বলা হয়েছে। মোশির ব্যবস্থায় দু বোনকে একত্রে বিবাহ করার বৈধতা "রহিত" করা হয়। লেবীয় পুস্তকের ১৮/১৮ শ্লোকে বলা হয়েছে: "আর স্ত্রীর সপত্নী হইবার জন্য তাহার জীবৎকালে আবরণীয় অনাবৃত করণার্থে তাহার ভগিনীকে বিবাহ করিও না।"

যদি যাকোবের ব্যবস্থায় দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা বৈধ না হতো তা নাহলে প্রমাণিত হবে যে, যাকোবের এ বিবাহদুইটি অবৈধ ছিল এবং এ দুই স্ত্রীর সন্তানগণ সকলেই ব্যভিচার-জাত জারজ সন্তান, নাঊযু বিল্লাহ! অধিকাংশ ইস্রায়েলীয় ভাববাদীই যাকোবের এ দুই স্ত্রীর সন্তান।

৪. স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ও অন্যত্র বিবাহ

মোশির ব্যবস্থায় বা শরীয়তে যে কোনো কারণে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারেন বা বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারেন। তালাকপ্রাপ্তা বা পরিত্যক্তা স্ত্রী তালাকদাতা স্বামীর গৃহ থেকে বেরিয়ে গেলে অন্য যে কোনো পুরুষ তাকে বিবাহ করতে পারেন। দ্বিতীয় বিবরণের ২৪ অধ্যায়ের ১-২ শ্লোকে বলা হয়েছে: "(১) কোন পুরুষ কোন স্ত্রীকে গ্রহণকরিয়া বিবাহ করিবার পর যদি তাহাতে কোন প্রকার অনুপযুক্ত ব্যবহার দেখিতে পায়, আর সেই জন্য সে স্ত্রী তাহার দৃষ্টিতে প্রীতিপাত্র না হয়, তবে সেই পুরুষ তাহার জন্য এক ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাটী হইতে তাহাকে বিদায় করিতে পারিবে। (২) আর সে স্ত্রী তাহার বাটী হইতে বাহির হইবার পর গিয়া অন্য পুরুষের ভার্যা হইতে পারে।"

পক্ষান্তরে যীশুর ব্যবস্থায় একমাত্র ব্যভিচারের অপরাধ ছাড়া কোনো স্বামী তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না বা পরিত্যাগ করতে পারে না। অনুরূপভাবে অন্য কোনো ব্যক্তি সে পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারবে না। এইরূপ বিবাহ ব্যভিচার বলে গণ্য হবে। মথিলিখিত সুসমাচারের ৫ম অধ্যায়ের ৩১-৩২ শ্লোকে এবং ১৯ অধ্যায়ের ৩-৯ শ্লোকে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মোশির ব্যবস্থার গোঁড়া অনুসারী ফরীশীগণ যীশুর নিকট এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যে, মোশি যেখানে ত্যাগপত্র বা তালাকনামা দিয়ে স্ত্রী পরিত্যাগের বিধান দিয়েছেন, সেখানে আপনি তা নিষেধ করছেন

কেন? উত্তরে যীশু বলেন: “তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন বলিয়া মোশি তোমাদিগকে আপন আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু আদি হইতে এরূপ হয় নাই। আর আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ব্যভিচার দোষ ব্যতিরেকে যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যাকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে; এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যাক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।” (মথি ১৯/৮-৯)

যীশুর এ উত্তর থেকে জানা গেল যে, এ বিধানের ক্ষেত্রে দুবার ‘রহিতকরণ’ ঘটেছে। প্রথম যুগে এইরূপ স্ত্রী-পরিত্যাগ অবৈধ ছিল। মোশির ব্যবস্থায় সেই অবৈধতা রহিত করে তা বৈধ করা হয়। পুনরায় যীশুর ব্যবস্থায় মোশির দেওয়া বৈধতা রহিত করা হয়। মূসার আলাইহিস সালাম শরীয়তে বৈধ বিষয়টি ঈসার আলাইহিস সালাম শরীয়তে ব্যভিচারের মত পাপ বলে গণ্য হয়।

৫. মূসার আলাইহিস সালাম ব্যবস্থার সকল বিধান রহিতকরণ!

ইস্রায়েলীগণের সকল বিধিবিধান তাওরাতের মধ্যে বিদ্যমান। ইস্রায়েল-বংশের সকল নবী বা ভাববাদী এ সকল বিধান পালনের জন্য আদিষ্ট ছিলেন। এ সকল বিধানের মধ্যে রয়েছে বৈধ ও অবৈধ বা শুচি ও অশুচি প্রাণী, খাদ্য ও পানীয়ের বিধান। ঈসা আলাইহিস সালাম ইস্রায়েল বংশের একজন নবী বা ভাববাদী। তিনি মূসার আলাইহিস সালাম শরীয়ত রহিত করেন নি, বরং তিনি তার

অনুসারী ছিলেন। মথিলিখিত সুসমাচারের ৫/১৭-১৮ শ্লোকের বর্ণনায় তিনি বলেন: "(১৭) মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আস নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। (১৮) আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যনত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সেই পর্যনত ব্যবস্থার (তাওরাত বা পুরাতন নিয়মের বিধিবিধান) এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।"

ড. ফান্ডার (**Carl Gottaleb Pfander**) তার লেখা "মীযানুল হক্ক" (**Scale of Truth**) গ্রন্থে যীশুর এ বক্তব্যকে ভিত্তি করে বলেছেন যে, তাওরাতের কোনো বিধান নাসখ বা রহিত হতে পারে না। তিনি বলেন যে, যীশু তাওরাতের কোনো বিধান রহিত করেন নি; কারণ তিনি রহিত করতে বা লোপ করতে আগমন করেন নি, বরং পূর্ণ করতে এসেছিলেন।

কিন্তু প্রকৃত সত্য কথা এই যে, মূসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যবস্থার সকল হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় সাধু পলের (**Paul**)-এর এক ফতোয়ায় বৈধ ও হালালে পরিণত হয়েছে। সাধু পলের ধর্মে কোনো হারাম বা অবৈধ কিছু নেই। শুধু যারা নিজেরা অপবিত্র তাদের জন্যই হালাল-হারাম বা শুচি-অশুচির ব্যবস্থা। অশুচি বা খারাপ মানুষদের জন্য হালাল বা শুচি ও পবিত্র খাদ্যও অপবিত্র। আর শুচি বা পবিত্র মানুষদের জন্য সকল প্রকার হারাম, অপবিত্র ও অশুচি

বিষয়ই হালাল ও পবিত্র। সাধু পলের এ এক মহা-বিস্ময়কর ফতোয়া!

রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ১৪ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "আমি জানি, এবং প্রভু যীশুতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, কোন বস্তুই স্বভাবত অপবিত্র নয়; কিন্তু যে যাহা অপবিত্র জ্ঞান করে, তাহারই পক্ষে তাহা অপবিত্র।" তীতের প্রতি প্রেরিত পত্রের ১ম অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে পৌল লিখেছেন: "শুচিগণের পক্ষে সকলই শুচি **(Unto the pure all things are pure)**; কিন্তু কলুষিত ও অবিশ্বাসীদের পক্ষে কিছুই শুচি নয়; বরং তাহাদের মন ও সংবেদ (বিবেক) উভয়ই কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে।"

সাধু পলের এ ফতোয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, মূসা আলাইহিস সালাম থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ইস্রায়েল বংশের সকল নবী-ভাববাদী ও স্বয়ং যীশু কেউই পবিত্র ছিলেন না, একারণে তাঁদের ভাগ্যে এইরূপ ঢালাও বৈধতা জোটে নি। পক্ষান্তরে খৃস্টানগণ যেহেতু 'পবিত্র' সেহেতু তাঁরা এইরূপ ঢালাও বৈধতা লাভ করলেন। তাঁদের জন্য সব কিছুই বৈধ ও পবিত্র হয়ে গেল। স্বয়ং যীশু খৃস্টও মূসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যবস্থা রহিত করে সব কিছু হালাল করতে পারলেন না; কারণ তিনি ও তার শিষ্যরা তো পবিত্র বা শুচি হতে পারেন নি। যেহেতু সাধু পল ও তার অনুসারীরা শুচিতা অর্জন করেন সেহেতু তাদের জন্য সকল হারাম ও অপবিত্র খাদ্য ও পানীয়

বৈধ ও পবিত্র হয়ে গেল। এভাবে মহামতি সাধু পল মোশির ব্যবস্থা পুরোপুরি রহিত করতে সক্ষম হলেন!

খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পল এ 'ঢালাও বৈধতা' প্রচারের ক্ষেত্রে খুবই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি সর্বদা প্রাণপনে তাঁর অনুসারীদের বুঝাতে চেষ্টা করতেন যে, মোশির ব্যবস্থা পুরোপুরি রহিত ও বাতিল হয়ে গিয়েছে। এজন্য তিনি তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত প্রথম পত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ১-৭ শ্লোকে লিখেছেন: "(১) ... উত্তরকালে কতক লোক ভ্রান্তিজনক আত্মাদিগেতে ও শয়তানদের[96] শিক্ষামালায় মন দিয়া **(giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils)** বিশ্বাস হইতে সরিয়া পড়িবে। ... (৩) ... এবং বিভিন্ন খাদ্যের ব্যবহার নিষেধ করে, যাহা ঈশ্বর এই অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন, যাহারা বিশ্বাসী ও সত্যের তত্ত্ব জানে, তাহারা ধন্যবাদ-পূর্ব ভোজন করে **(and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth)**। (৪) বাস্তবিক ঈশ্বরে সৃষ্ট সমস্ত বস্তুই ভাল; ধন্যবাদসহ গ্রহণ করিলে কিছুই অগ্রাহ্য নয়, (৫) কেননা ঈশ্বরের বাক্য ও প্রার্থনা দ্বারা তাহা পবিত্রীকৃত হয়। (৬) এই সকল কথা ভ্রাতৃগণকে

---

[96] এখানে কেরির বঙ্গানুবাদে "ভুতগণের" লেখা হয়েছে। মূল ইংরেজী **(devil)**-এর সুপ্রসিদ্ধ অর্থ শয়তান।

মনে করাইয়া দিলে তুমি খৃস্ট যীশুর উত্তম পরিচারক হইবে; যে বিশ্বাসের ও উত্তম শিক্ষার অনুসরণ করিয়া আসিতেছ তাহার বাক্যে পোষিত থাকিবে। (৭) আর ধর্মবিরূপক ও জরাতুর স্ত্রীলোকের যোগ্য গল্পসকল অগ্রাহ্য কর (**But refuse profane and old wives' fables**)।"[97]

৬- মূসার আলাইহিস সালাম শরীয়তের সকল পর্ব ও দিবস রহিতকরণ

লেবীয় পুস্তকের ২৩ অধ্যায়ে যে সকল সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক পর্ব পালনের বিধিবিধান প্রদান করা হয়েছে, মোশির ব্যবস্থা অনুসারে সেগুলি সবই চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। এই অধ্যায়ের

---

[97] সাধু পলের এ বক্তব্য থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়: (১) যীশুখৃস্ট ও অন্যান্য ভাববাদিগণ যারা বিভিন্ন খাদ্যের ব্যবহার নিষেধ করেছেন তারা ভ্রান্তিজনক আত্মাদিগের শয়তানদের শিক্ষামালা প্রচার করেছেন, (২) বিশ্বাস ও সত্যজ্ঞান থাকলে সকল হারাম খাদ্যই হালাল হয়ে যায়। (৩) সকল হারাম দ্রব্য ঈশ্বরের নাম নিয়ে খাওয়া যাবে এ কথা যত বেশি প্রচার করা যাবে ততবেশি যীশুর উত্তম শিষ্য হওয়া যাবে। (৪) অপবিত্র খাদ্য বর্জনের বিষয়ে যীশু ও অন্যান্য ভাববাদীর শিক্ষা ধর্মবিদ্বেষীয় কথা। আর যীশুখৃস্ট এরূপ ধর্মবিদ্বেষী কথাই বলেছেন, কারণ তিনি বলেছেন: "কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অধ্যাপক ও ফরীশীদের অপেক্ষা তোমাদের ধার্মিকতা যদি অধিক না হয় তবে তোমরা কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" মথি ৫/১৭-২০।

১৪, ২১, ৩১ ও ৪১ শ্লোকে সুস্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই পর্ববিষয়ক বিধানগুলি সর্বত্র ও সর্বদা পালনীয় চিরস্থায়ী বিধান।[98]

শনিবার (**the sabbath of the LORD**)-কে সম্মান করা এবং এ দিনে সকল প্রকার কাজকর্ম বন্ধ রাখা মোশির ব্যবস্থা অনুসারে একটি অলঙ্ঘনীয় চিরস্থায়ী বিধান। কেউ এ দিনে সামান্যতম কর্মও করতে পারবেন না। কেউ যদি এ দিনে কোনো প্রকারের কর্ম করেন তবে তাকে হত্যা করা অত্যাবশ্যক। পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদির বিভিন্ন স্থানে বারংবার এই বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন: আদিপুস্তক ২/৩; যাত্রাপুস্তক ২০/৮-১১, ২৩/১২ ও ৩৪/২১; লেবীয় ১৯/৩ ও ২৩/৩; দ্বিতীয় বিবরণ ৫/১২-১৫; যিরমিয় ১৭/১৯-২৭; যিশাইয় ৫৬/১-৮ ও ৫৮/১৩-১৪; নহিমিয় ৯/১৪; যিহিষ্কেল ২০/১২-২৪।

এ দিনে সামান্যতম কর্ম করলেই তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাত্রাপুস্তকের ৩১/১২-১৭ ও ৩৫/১-৩ শ্লোকে। মূসার আলাইহিস সালাম সময়ে ইস্রায়েল-সন্তানগণ এক শনিবারে এক ব্যক্তিকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করতে দেখেন। তখন তারা সেই কাষ্ঠসংগ্রহকারীকে আটক করে এবং সদাপ্রভুর নির্দেশে তাকে

---

[98] এ সকল শ্লোকে বারংবার বলা হয়েছে: "ইহা তোমাদের সকল নিবাসে পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি।"

আবাসিক এলাকার বাইরে নিয়ে পাথর মেরে হত্যা করে। গণনা পুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের ৩২-৩৬ শ্লোকে এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ সাধু পল (পৌল) মহাশয় শনিবার-সহ তাওরাতের সকল পর্ব ও দিবস রহিত ও বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল বিধান সবই ছিল এক প্রকারের ইঙ্গিত ও ছায়া মাত্র। কলসীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকে তিনি লিখেছেন: "অতএব ভোজন কি পান, কি উৎসব, কি অমাবস্যা, কি বিশ্রামবার, এই সকলের সম্মন্ধে কেহ তোমাদের বিচার না করুক।"

ডাওয়ালি ও রজারমেন্ট (**G. D'Oyley and R. Mant**)-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (**Notes, Practical and Explanatory to the Holy Bible**) কতিপয় খৃস্টান পণ্ডিতের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, ইয়াহূদীদের মধ্যে তিন প্রকারের পর্ব প্রচলিত ছিল: প্রতি বছর বছর পালিত পর্ব, প্রতি মাসে মাসে পালিত পর্ব ও প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে পালিত পর্ব। এ সকল পর্ব সবই রহিত হয়ে গিয়েছে। এমনকি শনিবার সাবাথ বা বিশ্রামদিন পালনও রহিত হয়ে যায়। তদস্থলে খৃস্টানদের সাবাথ (রবিবার) পালনের ব্যবস্থা করা হয়।"

৭- খাতনা বা ত্বকচ্ছেদ বিধান রহিতকরণ

খতনা বা ত্বক্ছেদ করা (**circumcision**) ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর শরীয়তের একটি অলঙ্ঘনীয় চিরস্থায়ী বিধান।

আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ের ৯-১৪ শ্লোকে তা স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে। কয়েকটি শ্লোক দেখুন: "(১২) পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্রসন্তানের আট দিন বয়সে ত্বকচ্ছেদ হইবে। (১৩) ... আর তোমাদের মাংসে-বিদ্যমান আমার নিয়ম চিরকালের নিয়ম হইবে **(my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant)**।"

এজন্য ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর দুই পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ও ইসহাক আলাইহিস সালাম-এর বংশধরদের মধ্যে এ বিধান প্রচলিত থাকে। মূসা আলাইহিস সালাম-এর শরীয়ত বা ব্যবস্থায়ও এ বিধান কার্যকর থাকে। লেবীয় পুস্তকের ১২ অধ্যায়ের ৩ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "পরে অষ্টম দিনে বালকটির পুরুষাঙ্গের ত্বক্ছেদ হইবে।"

যীশুরও ত্বক্ছেদ করা হয়েছিল। লূকলিখিত সুসমাচারের ২ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে: "আর যখন বালকটির ত্বকচ্ছেদনের জন্য আট দিন পূর্ণ হইল, তখন তাঁহার নাম যীশু রাখা গেল।" খৃস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন পর্যন্ত যীশুর ত্বক্ছেদ দিবস উপলক্ষে নির্ধারিত প্রার্থনা রয়েছে, যা তাঁরা এই দিবসের স্মরণে পালন করেন।

যীশুর ঊর্ধ্বারোহণ পর্যন্ত তক্কচ্ছেদ বা খাতনার এ বিধান কার্যকর ছিল। যীশু এ বিধান রহিত করেন নি। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রেরিতগণের যুগে তাঁরা এই 'চিরন্তন' বিধানটি রহিত করেন।[99]

খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পল এ বিধানটি রহিত করার বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। গালাতীয় ২/৩-৫, ৫/১-৬, ৬/১১-১৬; ফিলীপিয় ৩/৩; কলসীয় ২/১১ ইত্যাদি স্থানে তিনি বারংবার খাতনা বা তক্কচ্ছেদ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন এবং খাতনা করলে আর যীশুর অনুগ্রহ পাওয়া যাবে না বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে শুধু গালাতীয় ৫/২ ও ৬ শ্লোক উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেন: "(২) দেখ, আমি পৌল তোমাদিগকে কহিতেছি, যদি তোমরা ত্বক্ছেদ প্রাপ্ত হও, তবে খৃস্ট হইতে তোমাদের কিছুই লাভ হইবে না। ... (৬) কারণ খৃস্ট যীশুতে ত্বক্ছেদের কোন শক্তি নাই, অত্বকচ্ছেদেরও নাই; কিন্তু প্রেম দ্বারা কার্যসাধক বিশ্বাসই শক্তিযুক্ত।"[100]

---

[99] প্রেরিতগণের কার্যবিবরণ ১৫ অধ্যায় দেখুন।

[100] অর্থাৎ, অপবিত্র খাদ্যভক্ষণ, ব্যভিচার ইত্যাদির চেয়েও কঠিন অপরাধ হলো ত্বকছেদ করা। এ সকল অপরাধ করলে কেউ অনুগ্রহ থেকে পতিত হবে না। কিন্তু ত্বকছেদ করলে সে অনুগ্রহ থেকে পতিত হবে এবং খৃস্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হবে।

খৃস্টানগণ তাদের ধর্মগ্রন্থের এ চিরস্থায়ী বিধান, যা স্বয়ং যীশুও পালন করেছেন এবং নিষেধ বা রহিত করেন নি, সে বিধানকে সাধু পলের নির্দেশে বাতিল করে দেন এবং রহিত বলে গণ্য করেন।

৮- সাধু পলের দৃষ্টিতে তাওরাত বা পুরাতন নিয়মের মূল্য:

সাধু পল বারংবার বলেছেন যে, তাওরাত বা পুরাতন নিয়ম বাতিল, অচল, দুর্বল ও নিষ্ফল। ইব্রীয়দের প্রতি পত্রের ৭ম অধ্যায়েরই ১৮ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "কারণ এক পক্ষে পূর্বকার বিধির দুর্বলতা ও নিষ্ফলতা প্রযুক্ত তাহার লোপ (রহিতকরণ) হইতেছে **(For there is verily a disannulling of the commandment going before for the weakness and unprofitanleness thereof)**।"

বাইবেলের আরবী অনুবাদের বিভিন্ন সংস্করণের এখানে **disannulling** বা লোপ-এর অনুবাদে "নাসখ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ১৮২৫, ১৮২৬ সালের আরবী বাইবেলে এ শ্লোকের অনুবাদে বলা হয়েছ: "পূর্ববতী বিধানের (পুরাতন নিয়মের) দুর্বলতা ও নিষ্ফলতার কারণে তা নাসখ বা রহিত করা হয়েছে।"

১৬৭১, ১৮২৩ ও ১৮৪৪ সালের আরবী বাইবেলে শ্লোকটি নিম্নরূপ: "পূর্ববর্তী নিয়ম বাতিল ও অচল হয়েছে কারণ তার দুর্বল ও তার মধ্যে কোনো ফায়েদা বা উপকার নেই।" ১৮৮২ সালের আরবী সংস্করণে বলা হয়েছে: "পূর্ববর্তী নিয়ম আমরা প্রত্যাখ্যান করি

কারণ তার দুর্বলতা ও তার মধ্যে কোনো ফায়দা বা কল্যাণ না থাকা।"

ইব্রীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের ৮ম অধ্যায়ের ৭ ও ১৩ শ্লোক: "(৭) কারণ ঐ প্রথম নিয়ম যদি নির্দোষ হইত, তবে দ্বিতীয় এক নিয়মের জন্য স্থানের চেষ্টা করা যাইত না।... (১৩) 'নূতন' বলাতে তিনি প্রথমটি পুরাতন করিয়াছেন; কিন্তু যাহা পুরাতন ও জীর্ণ হইতেছে, তাহা অন্তর্হিত হইতে উদ্যত (**ready to vanish away**)।"

ইব্রীয়দের পত্রের ১০ অধ্যায়ের ৯ শ্লোকে সাধু পল বলেন: "তিনি প্রথম বিষয় লোপ (নাসখ) করিতেছেন, যেন দ্বিতীয় বিষয় স্থির করেন।"

আরবী বাইবেলের কোনো কোনো সংস্করণে এখানে "নাসখ" (রহিত) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এ সকল বক্তব্যে সাধু পল বারংবার বলেছেন যে, তাওরাত দুর্বল, নিষ্ফল, কল্যাণবিহীন, অচল, ত্রুটিযুক্ত, পুরাতন, জরাজীর্ণ, প্রস্থান-উদ্যত, বিলুপ্ত-প্রায়, প্রায়-অচল, প্রত্যাখ্যাত এবং রহিত।

ডাওয়ালি ও রজারমেন্ট-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে পাবেল-এর নিম্নলিখিত বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা হয়েছে: একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ঈশ্বর নতুন উত্তম বিধানের মাধ্যমে পুরাতন অসম্পূর্ণ বিধানকে রহিত করতে চান। এজন্যই ইয়াহূদীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিধানাবলি বিলোপ করে

সেখানে খৃস্টধর্মকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াহূদীদের যজ্ঞ ও নৈবেদ্য মুক্তি ও ঈশ্বর প্রেমের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এজন্য যীশু নিজে মৃত্যু গ্রহণ করে সেই অপূর্ণতা পূর্ণ করেছেন। তিনি একটি কর্মের মাধ্যমে অপরটি রহিত করেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিম্নের বিষয়গুলি বুঝতে পেরেছি:

১- পরবর্তী ব্যবস্থা বা ধর্মে পূর্ববর্তী ব্যবস্থা বা ধর্মের কিছু বিধিবিধান রহিত হওয়া শুধু মুসলমানদের দাবি নয় বা ইসলামের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় নয় বরং পূর্ববর্তী ধর্ম ও ব্যবস্থাগুলিতেও তা দেখতে পাওয়া যায়।

২- তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের সকল বিধানই খৃস্টধর্মে রহিত করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মে যে সকল বিধান 'চিরস্থায়ী' ও 'চিরন্তন' বলে ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলিসহ সকল ফরয দায়িত্ব, ইবাদত, শুচি-অশুচি বা হালাল-হারামের বিধান ইত্যাদি সবই সাধু পল রহিত করেছেন। তার অনুসারিগণের জন্য এ সকল বিধান পালনীয় নয় বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।[101]

---

[101] উপরন্তু এ সকল বিধান পালন করলে যীশুর দয়া থেকে বঞ্চিত হতে হবে বলে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। মহাপাপের চেয়েও বড় মহাপাপ মূসা (আ)-এর ব্যবস্থা মেনে চলা।

৩- খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পলের বক্তব্যের মধ্যে তাওরাতের বিধানাবলির ক্ষেত্রে 'নাসখ' বা 'রহিত করা' বা 'বিলোপ করা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী খৃস্টান গবেষক ও ধর্মগুরুগণও এক্ষেত্রে এ সকল শব্দ ব্যবহার করেছেন।

৪- সাধু পল দাবি করেছেন যে, পুরাতন ব্যবস্থা দুর্বল, নিষ্ফল, কল্যাণবিহীন, অচল, ত্রুটিযুক্ত, পুরাতন, জরাজীর্ণ, প্রস্থান-উদ্যত, বিলুপ্ত-প্রায়, প্রায়-অচল, প্রত্যাখ্যাত এবং রহিত। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইসলামী শরীয়ত বা ইসলামের ব্যবস্থা দ্বারা ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের ব্যবস্থা রহিত ও বিলুপ্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক বিষয়। বরং সাধু পলের বক্তব্য অনুসারে এরূপ বিলোপ সাধন জরুরী। কারণ যীশুর ব্যবস্থাটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রাচীন ও জীর্ণ। সর্বোপরি খৃস্টানদের প্রাণপুরুষ পল মহাশয় এবং খৃস্টান ব্যাখ্যাকার পণ্ডিতগণ তাওরাত সম্পর্কে অনেক অশালীন ও অশোভনীয় মন্তব্য করেছেন, যদিও তাঁরা তাকে ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করেন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সুনিশ্চিতরূপে জানতে পারছি যে, কুরআনের বিধান ও ব্যবস্থা দ্বারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের কিছু বিধান ও ব্যবস্থা রহিত হওয়া কোনো অস্বাভাবিক কিছু নয়। এরূপ রহিতকরণ, স্থগিতকরণ বা পরিবর্তন পূর্ববর্তী ভাববাদিগণের ব্যবস্থায় ঘটেছে বলে আমরা বাইবেলের আলোকে জানতে পারলাম।

কুরআনের বিধান পালনের মাধ্যমে তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিধান রহিতকরণ কার্যকর হয়।

১. ৪. ৩. ২. একই ভাববাদীর ব্যবস্থায় রহিতকরণ

রহিতকরণের দ্বিতীয় প্রকার হলো, একই নবীর ব্যবস্থার মধ্যে একটি বিধান রহিত করে অন্য বিধান দেওয়া। এর কতিপয় উদাহরণ দেখুন:

১. জবাই বা বলিদানের নির্দেশ রহিত করা

আদিপুস্তকের ২২/১-১৪ শ্লোকে বলা হয়েছে, ঈশ্বর অব্রাহামকে নির্দেশ দেন 'ইসহাক'কে[102] বলিদান করতে। তাঁরা উভয়ে যখন এ নির্দেশ পালন করতে প্রস্তুত হলেন তখন নির্দেশ কার্যকর করার আগেই তিনি তা রহিত করেন।

২. যিহিষ্কেল ভাববাদীকে দেওয়া বিধান রহিত করা:

---

[102] বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বর ইসহাক'কে বলিদান করার নির্দেশ দেন। তবে বাইবেলের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, এখানে 'ইসহাক' শব্দটি পরিবর্তিত। কারণ এখানে বারংবার বলা হয়েছে যে, তোমার একমাত্র পুত্র, তোমার অদ্বিতীয় পুত্র। এই বিশেষণটি শুধু ইশ্মায়েলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ ইশ্মায়েলের জন্মের ১৪ বৎসর পরে ইসহাকের জন্ম হয়। কাজেই ইসহাক কখনোই অবরাহামের অদ্বিতীয় পুত্র ছিলেন না, বরং তিনি জন্ম থেকেই তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। আদিপুস্তক ২২/২-১২।

যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ের ১০, ১২, ১৪ ও ১৫ শ্লোক নিম্নরূপ: "(১০) তোমার খাদ্য পরিমাণপূর্বক, অর্থাৎ দিন দিন বিংশতি তোলা করিয়া ভোজন করিতে হইবে। তুমি বিশেষ বিশেষ সময়ে তাহা ভোজন করিবে। ... (১২) আর ঐ খাদ্যদ্রব্য যবের পিষ্টকের ন্যায় করিয়া ভোজন করিবে, এবং তাহাদের দৃষ্টিতে মনুষ্যের বিষ্ঠা দিয়া তাহা পাক করিবে। ... (১৪) তখন আমি কহিলাম, আহা, প্রভু সদাপ্রভু, দেখ, আমার প্রাণ অশুচি হয় নাই; আমি বাল্যকাল অবধি অদ্য পর্যন্ত স্বয়ং-মৃত কিম্বা পশু দ্বারা বিদীর্ণ কিছুই খাই নাই, ঘৃণার্হ মাংস কখনও আমার মুখে প্রবিষ্ট হয় নাই। (১৫) তখন তিনি আমাকে কহিলেন, দেখ, আমি মনুষ্যের বিষ্ঠার পরিবর্তে তোমাকে গোময় দিলাম, তুমি তাহা দিয়া আপন রুটি পাক করিবে।"

এখানে ঈশ্বর প্রথমে মনুষ্যের বিষ্ঠা দিয়ে রুটি পাক করতে আজ্ঞা করেন। যিহিষ্কেল ভাববাদী অপারগতা প্রকাশ করলে পালন করার পূর্বেই তা রহিত করে মনুষ্যের বিষ্ঠার পরিবর্তে গরুর গোবর দিয়ে রুটি পাক করে খেতে নির্দেশ দিলেন।

৩. নির্ধারিত বেদিতে উৎসর্গের নির্দেশ রহিত করা:

লেবীয় পুস্তকের ১৭/১-৬ শ্লোকে মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম ও ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে নির্দেশ দেন যে, সকল প্রকার জবাই-কুরবানী হবে "সমাগম-তাম্বুর দ্বারে' নির্ধারিত স্থানে। যে ব্যক্তি

অন্য কোনো স্থানে জবাই করবে তাকে উচ্ছিন্ন অর্থাৎ হত্যা করতে হবে।[103]

এরপর দ্বিতীয় বিবরণের এ নির্দেশ রহিত করা হয় এবং তাদেরকে যে কোনো স্থানে জবাই-কুরবানী করার অনুমতি প্রদান করা হয়।[104]

---

[103] "ইস্রায়েল-কুলজাত যে কেহ শিবিরের মধ্যে কিম্বা শিবিরের বাহিরে গোরু কিম্বা মেষ কিম্বা ছাগ হনন করে, কিন্তু সদাপ্রভুর আবাসের সম্মুখে সদাপ্রভুর উদ্দেশে উপহার উৎসর্গ করিতে সমাগম-তাম্বর দ্বারসমীপে তাহা না আনে, তাহার উপর রক্তপাতের পাপ গণিত হইবে; সে রক্তপাত করিয়াছে, সে ব্যক্তি আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।" লেবীয় ১৭/৩-৪।

[104] "১৫ তথাপি যখন তোমার প্রাণের অভিলাষ হইবে, তখন তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর দত্ত আশীর্বাদানুসারে আপনার সমস্ত নগর-দ্বারের ভিতরে পশু বধ করিয়া মাংস ভোজন করিতে পারিবে... ২০ তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যেমন অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদনুসারে যখন তোমার সীমা বিস্তার করিবেন, এবং মাংস ভক্ষণে তোমার প্রাণের অভিলাষ হইলে তুমি বলিবে, মাংস ভক্ষণ করিব, তখন তুমি প্রাণের অভিলাষানুসারে মাংস ভক্ষণ করিবে। ২১ আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপনার্থে যে স্থান মনোনীত করিবেন, তাহা যদি তোমা হইতে বহু দূর হয়, তবে আমি যেমন বলিয়াছি, তদনুসারে তুমি সদাপ্রভুর দত্ত গোমেষাদি পাল হইতে পশু লইয়া বধ করিবে, ও আপন প্রাণের অভিলাষানুসারে নগর-দ্বারের ভিতরে ভোজন করিতে পারিবে। যেমন কৃষ্ণসার ও হরিণ ভক্ষণ করা যায়, তেমনি তাহা ভক্ষণ করিবে; অশুচি কি শুচি লোক, সকলেই তাহা ভক্ষণ করিবে।" দ্বিতীয় বিবরণের ১২/১৫-২১।

হর্ন তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে উপর্যুক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করার পর বলেন: এ দুই স্থানের মধ্যে বাহ্যত বৈপরীত্য রয়েছে। কিন্তু যদি এ কথা লক্ষ্য করা হয় যে, মোশির ব্যবস্থা অপরীবর্তনীয় ও স্থির ছিল না; বরং ইস্রায়েল সন্তানগণের অবস্থা অনুসারে তার মধ্যে সংযোজন ও বিয়োজন করা হতো, তবে এই বৈপরীত্যের সমাধান দেওয়া খুবই সহজ হবে। মিসর ত্যাগের ৪০তম বৎসরে প্যালেস্টাইনে প্রবেশের পূর্বে মোশি পূর্বোক্ত বিধানটি, অর্থাৎ লেবীয় পুস্তকের বিধানটি সুস্পষ্টরূপে রহিত করেন। তিনি তাঁদেরকে নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেখানে ইচ্ছা গোরু, মেষ ইত্যাদি বধ করতে পারবে এবং ভক্ষণ করতে পারবে।

এভাবে তিনি মূসার আলাইহিস সালাম ব্যবস্থায় নাসখ বা রহিত হওয়ার বিষয়টি বিদ্যমান থাকার কথা স্বীকার করলেন। তিনি আরো স্বীকার করলেন যে, মোশির ব্যবস্থার মধ্যে ইস্রায়েল সন্তানগণের অবস্থা অনুসারে সংযোজন ও বিয়োজন করা হতো। ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণের অবস্থা দেখলে বড় অবাক লাগে! এরূপ সংযোজন ও বিয়োজন যদি অন্য কোনো ব্যবস্থা বা ধর্মে ঘটে তবে তাঁরা তা খুব আপত্তিকর বলে মনে করেন এবং দাবি করেন যে, এইরূপ সংযোজন ও বিয়োজন দ্বারা ঈশ্বরের অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়।[105] আর

---

[105] ইহূদী-খৃস্টান ধর্মগুরুগণ এবং প্রাচ্যবিদগণ প্রায়শ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিবর্তন ও বিভিন্ন বিধানের ক্রমান্বয় পরিবর্তনকে

প্রকৃত সত্য হলো, মুসলিমগণ যে ‘নাসখ’ বা রহিতকরণে বিশ্বাস করেন তা মহান আল্লাহর একক অধিকার ও তাঁর মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ যে “প্রকাশ পাওয়া” মতবাদে বিশ্বাস করেন তার দ্বারা ঈশ্বরের অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়। ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ এবং সাধু পল বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে এরূপ আল্লাহর ক্ষেত্রে “প্রকাশ পাওয়া”, অর্থাৎ প্রথম বিধানের ফলাফল জানার পরে মত পাল্টানোর কথা উল্লেখ করেছেন।

৪- লেবীয়দের সেবাদানের বয়সসীমার পরিবর্তন

গণনাপুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩, ২৩, ৩০, ৩৫, ৩৯, ৪৩, ও ৪৬ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমাগম তাম্বুর (**tabernacle of the congregation**) কর্মচারীর বয়স কোনো মতেই ত্রিশের কম এবং পঞ্চাশের বেশি হবে না (ত্রিশ বৎসর বয়স্ক অবধি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত)।

নিয়ে অনেক উপহাস করেন। তারা দাবি করেন যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের সুবিধামত বিভিন্ন বিধান পরিবর্তন করতেন এবং একে ‘নাসখ’ বলে বুঝাতেন (নাউযূ বিল্লাহ)। অথচ আমরা দেখছি যে, মূসা, ঈসা ও অন্যান্য বাইবেলীয় ভাববাদিগণের শরীয়তেও একইরূপ বিবর্তন, পরিবর্তন বা নাসখ বিদ্যমান। তাহলে তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, তাদের ভাববাদিগণ বা “প্রভু যীশু”-ও সুবিধামত তাদের বিধান পরিবর্তন করতেন।

পক্ষান্তরে এই পুস্তকেরই ৮ম অধ্যায়ের ২৪ ও ২৫ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, তাদের বয়স ২৫ বৎসরের কম হবে না এবং ৫০ বৎসরের বেশি হবে না (লেবীয়দের বিষয়ে এই ব্যবস্থা: পঁচিশ বৎসর ও ততোধিক বয়স্ক লেবীয়েরা সমাগম তাবুতে সেবাকর্ম করিবার জন্য শ্রেণীভুক্ত হইবে..)।

একই পুস্তকে দু প্রকারের বিধান। এখানে ইয়াহূদী-খৃস্টানগণকে দুটি বিষয়ের একটি স্বীকার করতেই হবে। হয় একে ভুল ও বৈপরীত্য মেনে নিয়ে স্বীকার করতে হবে যে, বাইবেলের মধ্যে বিকৃতি ঘটেছে। অথবা একে "নাসখ" বা রহিতকরণ বলে মেনে নিয়ে স্বীকার করতে হবে যে, একই ভাববাদীর ব্যবস্থায় বিবর্তন ও রহিতকরণ ঘটতে পারে।

৫- হিষ্কিয়ের বয়স বিষয়ক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন ও রহিতকরণ

২ রাজাবলির ২০/১-৬ শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ যিশাইয় ভাববাদীকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যিহূদা রাজ্যের রাজা হিষ্কিয়কে তার আয়ু শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিবেন, যেন রাজা তার পরিবারকে মৃত্যুকালীন ওসীয়ত করতে পারেন। আয়ু শেষ হওয়ার খবর পেয়ে রাজা হিষ্কিয় অনেক কাঁদাকাটি ও প্রার্থনা করেন। এতে আল্লাহ তার আয়ুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টে তার আয়ু বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেন এবং যিশাইয় ভাববাদী ফিরে নগরের মধ্যস্থানে পৌঁছানোর আগেই তাকে নির্দেশ দেন বিষয়টি রাজাকে জানিয়ে দিয়ে

তিনি যেন রাজাকে বলেন, আল্লাহ বলেছেন: “আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম, আমি তোমার নেত্রজল দেখিলাম; দেখ, আমি তোমাকে সুস্থ করিব; তৃতীয় দিবসে তুমি সদাপ্রভুর গৃহে উঠিবে। আর আমি তোমার আয়ূ পনের বৎসর বৃদ্ধি করিব...।”

এখানে ঈশ্বর যিশাইয় ভাববাদীর মুখে হিষ্কিয় রাজাকে নির্দেশ দিলেন, তুমি আপন বাটীর ব্যবস্থা কর; কারণ তুমি মারা যাচ্ছ। এরপর যিশাইয় ভাববাদী এই আজ্ঞা যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে তাঁর নিজ বাড়ি পৌঁছানোর আগেই তিনি তাঁর এই আজ্ঞা রহিত করলেন এবং হিষ্কিয়ের আয়ু পনের বৎসর বৃদ্ধি করলেন। রহিত বিধান ও রহিতকারী নতুন বিধান উভয়ই একই ভাববাদীর দ্বারা প্রচার করা হলো।

৬- যীশুর ধর্ম শুধু ইস্রায়েলীদের জন্য না সকলের জন্য

মথিলিখিত সুসমাচারের দশম অধ্যায়ে বলা হয়েছে: “(৫) এই বারো জনকে যীশু প্রেরণ করিলেন, আর তাঁহাদিগকে এই আদেশ দিলেন- (৬) তোমরা পরজাতিগণের পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও।”

মথিলিখিত সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে যীশু তাঁর নিজের বিষয়ে বলেছেন: “ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।”

এ সকল শ্লোকের নির্দেশনা অনুসারে যীশু খৃস্টের মিশন ছিল শুধু ইস্রায়েল সন্তানদের জন্যই, আর কারো জন্য নয়। কিন্তু মার্কের সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে যীশুর নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে: "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর।"

এখানে হয় বৈপরীত্য, নয় রহিতকরণ স্বীকার করতে হবে। খৃস্টান প্রচারকগণ দাবি করেন যে, দ্বিতীয় বক্তব্যটি যীশুর ধর্মের সার্বজনীনতা প্রমাণ করে। তাহলে মানতে হবে যে, প্রথম নির্দেশটি 'নাসখ' বা রহিত হয়ে গিয়েছে। প্রথমে যীশু তার ধর্মকে শুধু ইস্রায়েল-সন্তানদের জন্য নির্দিষ্ট করলেন এবং অন্য কাউকে দীক্ষা দিতে নিষেধ করলেন। এরপর এ নির্দেশ রহিত করে সবাইকে দীক্ষা দিতে নির্দেশ দিলেন।

এখন তাঁরা যদি আল্লাহর নির্দেশের পরিবর্তন ও রহিত হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন তাহলে আমাদের দাবি প্রমাণিত হলো। আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হলাম যে, তাদের ধর্মগ্রন্থগুলির অনেক বিধান রহিত হয়েছে এবং তাদের ধর্মের বিধান বা ধর্মগ্রন্থের বিধান রহিত হওয়া কোনো অবাস্তব বা অসম্ভব বিষয় নয়। আর তারা যদি "রহিতকরণ" বা পরিবর্তন মানতে রাজি না হন তাহলে তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, তাদের ইঞ্জিল বা সুসামাচারগুলির মধ্যে বিকৃতি ঘটেছে এবং বিকৃতির কারণে বৈপরীত্য বা পরস্পর বিরোধী

বক্তব্য এতে স্থান পেয়েছে। এখানে প্রকৃত সত্যকথা হলো, মার্কের সুসমাচারের এ বক্তব্যটি ঈসা আলাইহিস সালাম-এর নয়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিতরূপে জানতে পেরেছি যে, উভয় প্রকারের 'রহিতকরণ'ই পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান। এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। ঈশ্বরের ধর্মীয় বিধান বা ব্যবস্থায় কোনোরূপ পরিবর্তন, বিলোপ বা রহিতকরণ সম্ভব নয় বলে ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ যে দাবি করেন তা যে একেবারে ভিত্তিহীন, বাতিল ও অসত্য দাবি তা উপরের আলোচনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে।

আর পরিবর্তন বা রহিতকরণ-এর বিদ্যমানতাই তো বিবেক ও যুক্তির দাবি। পরিবর্তন ছাড়া কিভাবে সম্ভব? স্থান ও কাল ও পাত্রে পরিবর্তনের কারণে মানুষের প্রয়োজনের পরিবর্তন হয়। কোনো কোনো বিধান বা আজ্ঞা বিশেষ সময়ে বিশেষ মানুষদের পক্ষে পালন করা সম্ভব এবং অন্য সময়ে অন্য মানুষদের জন্য অসম্ভব হতে পারে। কোনো কোনো আজ্ঞা কিছু মানুষের জন্য পালনযোগ্য ও অন্যদের জন্য পালনের অযোগ্য হতে পারে। মানুষের প্রকৃত কল্যাণ কিসে তা মানুষ অনেক সময় পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারে না, বরং মহান আল্লাহই তা ভাল জানেন।

ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ আল্লাহর বিধানের নাসখ, রহিতকরণ বা পরিবর্তন অসম্ভব বলে যে দাবি করেন তা তাদের ধর্মগ্রন্থের

আলোকেই ভিত্তিহীন ও সত্যের বিপরীত বলে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়:
ত্রিত্ববাদ খণ্ডন

এ অধ্যায়ে একটি ভূমিকা ও তিনটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

ভূমিকা:
কতিপয় প্রয়োজনীয় মূলনীতি ও তথ্য

মানবীয় জ্ঞান, বিবেক ও বাইবেলের আলোকে ত্রিত্ববাদ[106] আলোচনার পূর্বে ভুমিকায় কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছি। এ

---

[106] (Trinity) বা ত্রিত্ববাদ-এর সাধারণ অর্থ 'তিনত্ব', তিনের সমাহার বা তিনের সমস্টি (a group of three closely related persons or things)। খৃস্টধমের পরিভাষায় এর অর্থ (the unity of Father, Son, and Holy Spirit as three persons in one Godhead): এক ঈশ্বরত্বের মধ্যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই তিন ব্যক্তির মিলন।

খৃস্টান পন্ডিতগণ সকলেই একমত যে, (Trinity) শব্দটি বাইবেলের পুরাতন বা নতুন নিয়মের কোথাও নেই। খৃস্টের কোনো বাক্যে কখনো এ শব্দটি বা এ অর্থের কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। এমনকি খৃস্টের প্রেরিতগণ, শিষ্যগণ বা তাদের শিষ্যগণও এ পরিভাষাটি কখনো ব্যবহার করেন নি। মূলত দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে এ পরিভাষাটির জন্ম। কে এই পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তাও নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। খৃস্টান ধর্মগুরুগণ মনে করেন যে, দ্বিতীয়-তৃতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু কার্থেজের প্রেসবিটার (Presbyter) টার্টোলিন (Tertullian), যিনি ২২০ খৃস্টাব্দের পরে মৃত্যুবরণ করেন, তিনিই সর্বপ্রথম এ পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। তখনো এ পরিভাষাটির অর্থ ও ব্যবহার স্পষ্ট ছিল না। সত্যিকার অর্থে বিগত ২০০০ বৎসরে কখনো এ পরিভাষাটির অর্থ স্পষ্ট হয় নি। খৃস্টধর্মের মধ্যে অগণিত দল, উপদল ও মতভেদ মূলত এ বিশ্বাসটির ব্যাখ্যা নিয়ে। প্রথম খৃস্টীয় শতকগুলিতে অনেক খৃস্টান সম্প্রদায়ই একেশ্বরবাদী ছিলেন। মানুষ ঈশ্বর হতে পারে, বা ঈশ্বর

মানুষের দেহ গ্রহণ করতে পারেন এরূপ বিশ্বাস কখনোই ইহূদীদের মধ্যে ছিল না। তবে পৌত্তলিক রোমানগণের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস অতি-প্রচলিত ছিল। তাঁরা সম্রাটকেও ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিভু হিসাবে পূজা করতেন। এছাড়া গ্রীক দর্শনভিত্তিক রোমান ধর্মে 'প্রজ্ঞা' (Logos)-কে ঈশ্বরের প্রকাশ বলে বিশ্বাস করা হতো। পৌল ও প্রথম যুগের কিছু খৃস্টান গুরু এ সকল বিশ্বাসকে ভিত্তি করে প্রথমে 'যীশুর' ঈশ্বরত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। এরপর এ বিশ্বাসের সাথে 'একত্ববাদে'র সমন্বয় এবং যিশুর ঈশ্বরত্বের সাথে মানবত্বের সমন্বয় করার ক্রমাগত প্রচেষ্টার চূড়ান্ত রূপ হলো এই ত্রিত্ববাদ। এখানে পাঠকের জন্য 'এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায়' ত্রিত্ববাদ' সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তা থেকে কিছু কথা উল্লেখ করছি:

Neither the word Trinity nor the explicit doctrine appears in the New Testament, nor did Jesus and his followers intend to contradict the Shema in the Old Testament: "Hear, OIsrael: The Lord our God is one Lord" (Deuteronomy 6:4). The earliest Christians, however, had to cope with the implications of the coming of Jesus Christ and of the presumed presence and power of God among them, i.e, the Holy Spirit, whose coming was connected with the celebration of the Pentecost. The Father, Son, and Holy Spirit were associated in such New Testament passages as the Great Commission: "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit" (Matthew 28:19); and in the apostolic benediction: "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all" (2 Corinthians 13:14). Thus, the New Testament established the basis for the doctrine of the Trinity. The doctrine developed gradually over several centuries and through many controversies. Initially, both the requirements of monotheism inherited from the Old Testament and the implications of the need to interpret the biblical teaching to Greco-Roman religions seemed to demand that

বিষয়গুলি পাঠককে পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলির আলোচনা হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করবে।

১ম বিষয়: পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি বারংবার ঘোষণা করছে যে, আল্লাহ বা ঈশ্বর এক, একক, অনাদি, অনন্ত, চিরন্তন, স্ত্রী-সন্তানগ্রহণ থেকে পবিত্র, অমরণশীল, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়, তাঁর সত্ত্বাতেও নয় এবং তাঁর গুণাবলিতেও নয়। তিনি দেহ ও আকৃতি থেকে পবিত্র। এই বিষয়গুলি পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলিতে এত বেশি বলা হয়েছে এবং এত বেশি প্রসিদ্ধ যে এগুলির জন্য উদ্ধৃতি বা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা নিষ্প্রয়োজন।

২য় বিষয়: আল্লাহ বা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কাউকে উপাসনা বা পূজা করা নিষিদ্ধ। তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ে

---

the divine in Christ as the Word, or Logos, be interpreted as subordinate to the Supreme Being. An alternative solution was to interpret Father, Son, and Holy Spirit as three modes of the self-disclosure of the one God but not as distinct within the being of God itself. The first tendency recognized the distinctness among the three, but at the cost of their equality and hence of their unity (subordinationism); the second came to terms with their unity, but at the cost of their distinctness as "persons" (modalism). It was not until the 4th century that the distinctness ofthe three and their unity were brought together in a single orthodox doctrine of one essence and three persons.....

বারংবার বলা হয়েছে। যেমন, যাত্রাপুস্তকের ২০/৩, ৪, ৫, ২৩; ৩৪/১৪, ১৭; দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/১-১১, ১৭/২-৭ ইত্যাদি।

তাওরাতে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত, উপাসনা, পূজা বা আরাধনার কথা প্রচার করে বা এরূপ করতে আহবান করে তবে তাকে হত্যা করতে হবে, তিনি যদি মহা মহা অলৌকিক চিহ্ন বা মুজিযার অধিকারী নবীও হন। অনুরূপভাবে তাওরাতে সুস্পষ্টত বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত, উপাসনা বা পূজা করে বা এরূপ করতে কাউকে উদ্বুদ্ধ করে বা অনুপ্রেরণা দেয় তবে তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। এরূপ ব্যক্তি নারী হোক আর পুরুষ হোক, আত্মীয় হোক, অনাত্মীয় হোক বা বন্ধু হোক সর্বাবস্থায় তাকে এভাবে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে।[107]

তৃতীয় বিষয়: তোরাহ-এর বিভিন্ন শ্লোক থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর কোনো তুলনীয় নেই এবং তিনি কোনো সৃষ্টির মত নন। দ্বিতীয় বিবরণের ৪র্থ অধ্যায়ের ১২ ও ১৫ শ্লোক নিম্নরূপ: "(১২) তখন অগ্নির মধ্য হইতে সদাপ্রভু তোমাদের কাছে কথা কহিলেন; তোমরা বাক্যের রব শুনিতেছিলে, কিন্তু কোনো মুর্তি দেখিতে পাইলে না, কেবল রব হইতেছিল। ... (১৫) যে দিন সদাপ্রভু হোরেবে অগ্নির

[107] দ্বিতীয় বিবরণ ১৩/১-১১, ১৭/২-৭।

মধ্য হইতে তোমাদের সহিত কথা কহিতেছিলেন, সেই দিন তোমরা কোন মুর্তি দেখ নাই; অতএব আপন আপন প্রাণের বিষয়ে অতিশয় সাবধান হও।''

নতুন নিয়মের অনেক স্থানেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে বলা হয়েছে: ''ঈশ্বরকে কেহ কখনো দেখে নাই।''

তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র ৬/১৬ শ্লোক: ''যাঁহাকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও না।''

যোহনের প্রথম পত্র ৪/১২: ''ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই।''

এ সকল শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ঈশ্বরের কোনো তুলনা বা নমুনা নেই। সৃষ্টির কোনো কিছুই তার সাথে তুলনীয় নয়। তাকে পৃথিবীতে দেখা যায় না। যাকে দেখা যায় তিনি কখনোই ঈশ্বর হতে পারেন না, যদিও ঈশ্বরের বাক্যে, ভাববাদিগণের বাক্যে বা প্রেরিতগণের বাক্যে তাঁর বিষয়ে 'ঈশ্বর', 'প্রভু' বা অনুরূপ কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয়। কাজেই কারো বিষয়ে শুধু 'ঈশ্বর' (God), সদাপ্রভু (Lord), উপাস্য (god) বা অনুরূপ কোনো শব্দের প্রয়োগ দেখেই ধোঁকাগ্রস্থ হয়ে তাঁকে ঈশ্বর বলে পূজা করা যায় না। কারণ জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও বাইবেলের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক প্রয়োগকে রূপক অর্থে গ্রহণ করা জরুরী।

বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে অগণিত স্থানে ফিরিশতা, ঈশ্বরের দূত, মূসা আলাইহিস সালাম, ভাববাদী, ইস্রায়েল-বংশীয় বিচারকর্তৃগণ, ভাল মানুষ, সাধারণ মানুষ, এমনকি শয়তানকে ‘‘ঈশ্বর’’ বা উপাস্য বলা হয়েছে।[108] ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে যখন ঈশ্বর শব্দের প্রয়োগ করা হয় তখন এরূপ ব্যবহারের পিছনে নির্ধারিত কোনো কারণ বা সূত্র থাকে। মূল বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করলে শ্রোতা বা পাঠক সে সূত্র অনুধাবন করতে পারেন। কাজেই ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে ‘‘ঈশ্বর’’ বা অনুরূপ শব্দের প্রয়োগ দেখে

---

[108] সামান্য কয়েকটি নমুনা দেখুন: যাত্রাপুস্তক ৭/১ ‘‘তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, আমি ফরৌণের কাছে তোমাকে ঈশ্বর করিয়া (I have made thee a god to Pharaoh) (বাংলা বাইবেলে: ‘‘ঈশ্বর স্বরূপ করিয়া’’, আসলে ‘‘স্বরূপ’’ শব্দটি অতিরিক্ত) নিযুক্ত করিলাম; আর তোমার ভ্রাতা হারোণ তোমার ভাববাদী হইবে।’’ এখানে মোশিকে ঈশ্বর বলা হয়েছে। গীতসংহিতা ৮২/৬: ‘আমিই বলিয়াছি, তোমরা ঈশ্বর, তোমরা সকলে পরাৎপরের (মহান ঈশ্বরের) সন্তান (I have said, Ye are gods; and all of you are children of the Most High)।’’ এখানে শুধু বিশেষ মানুষদেরকেই নয় গড়ভাবে সাধারণ মানুষদেরকে ‘‘ঈশ্বর’’ ও ‘‘ঈশ্বরের পুত্র’’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২ করিন্থীয় ৪/৪ ‘‘তাহাদের মধ্যে এই যুগের ঈশ্বর (god of this world: এখানে বাংলা বাইবেলে ও ‘ইঞ্জিলে (god) অর্থ ‘দেব’ বা ‘দেবতা’ বলা হয়েছে; অথচ অন্যান্য স্থানে God ও god : আল্লাহ এবং ইলাহ উভয়ের অর্থই ‘ঈশ্বর’ লেখা হয়েছে) অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করিয়াছে, যেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যে খৃস্ট তাঁহার গৌরবের সুসমাচারের দীপ্তি তাহাদের প্রতি উদয় না হয়।’’

বাইবেলের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশনা ও মানবীয় জ্ঞান-বিবেক বিসর্জন দিয়ে তাকে প্রকৃত ঈশ্বর, ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের অংশ বা উপাস্য বলে দাবি করা কোনো বিবেকবান সজ্ঞান মানুষের জন্য সম্ভব নয়।

চতুর্থ বিষয়: কোনো নবী বা ভাববাদী কখনো "ত্রিত্ববাদ" প্রচার করেন নি, ত্রিত্ববাদের পক্ষে কিছু বলেন নি এবং কোনো আসমানী গ্রন্থে এ বিষয়ক কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয় নি। তাওরাত বা মোশির ব্যবস্থা ও ধর্মবিশ্বাসে এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে যে ত্রিতত্ত্ববাদের অস্তিত্ব নেই তা সকলেই জানেন। এজন্য কোনো পৃথক প্রমাণ পেশের প্রয়োজন নেই। যে কেউ প্রচলিত তোরাহ পাঠ করলেই দেখবেন যে, এর মধ্যে সুস্পষ্টভাবে, অস্পষ্টভাবে, ইশারা-ইঙ্গিতে বা কোনোভাবে ত্রিত্ববাদের কথা উল্লেখ করা হয় নি। মূসা আলাইহিস সালাম-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কোনো ইয়াহূদী আলিম, পণ্ডিত বা ধর্মগুরু ত্রিত্ববাদী বিশ্বাস স্বীকার করতে বা এরূপ বিশ্বাসের কোনো প্রমাণ তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে বলে কখনোই স্বীকার করবেন না।

যদি ত্রিত্ববাদ সত্য হতো তাহলে অবশ্যই মূসা আলাইহিস সালাম থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত ইস্রায়েলীয় ভাববাদীগণ সকলেই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট ও বোধগম্যভাবে ব্যাখ্যা করতেন এবং ঈশ্বরের এ গুণটি সকলের বোধগম্য করে ব্যাখ্যা করাই তাদের মূল দায়িত্ব

হতো। কারণ তাদের দায়িত্ব ছিল মূসার শরীয়তের বা ব্যবস্থার বিশ্বাস ও কর্ম উভয় দিকের সকল নির্দেশ পালন করা।

ত্রিত্ববাদীগণ বিশ্বাস করেন যে, ত্রিত্বে বিশ্বাস করা, অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এ তিনিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাধীন ও পৃথক তিনটি সত্ত্বার সমন্বয়ে ঈশ্বরের সত্ত্বা গঠিত এবং এ তিনটি সম্পূর্ণ স্বাধীন, পৃথক ও পরিপূর্ণ ঈশ্বর মিলে এক ঈশ্বর- এ কথা বিশ্বাস করাই মুক্তির একমাত্র পথ। কোনো মানুষ, এমনকি কোনো ভাববাদীও ত্রিত্বে বিশ্বাস না করলে তিনি পরকালে মুক্তি পাবেন না বা ‘‘ঈশ্বরের রাজ্যে’’ প্রবেশ করতে পারবেন না।

বড় অবাক লাগে যে, ঈশ্বরের যে গুণটি বিশ্বাস না করলে ভাববাদী ও অ-ভাববাদী কোনো মানুষেরই মুক্তি নেই, সে গুণটির কথা মোশি থেকে যীশু পর্যন্ত একজন ভাববাদীও স্পষ্টভাবে সকলের জন্য বোধগম্য করে ব্যাখ্যা করলেন না। কেউই বিষয়টির আলোচনা করে এ বিষয়ক সকল সন্দেহ নিরসন করলেন না। খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সাধু পলের মতে যে বিষয়গুলি একেবারেই গুরুত্বহীন, দূর্বল ও অপূর্ণ, সেই বিষয়গুলি মোশি ও সকল ভাববাদী কত বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন, একবার বলে আবার বললেন, বারংবার বিভিন্ন ভাবে বুঝালেন, সেগুলি মেনে চলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দিলেন, সেগুলি অমান্যকারীকে মৃত্যুদন্ড প্রদানের বিধান

দিলেন.... অথচ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুক্তির উৎসটির বিষয়ে কিছুই বললেন না!!

এর চেয়েও অবাক বিষয় হলো, স্বয়ং যীশু তাঁর ঊর্ধ্বারোহণ পর্যন্ত কখনোই এই 'বিশ্বাস'টিকে পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে বললেন না। তিনি কখনোই বললেন না যে, "ঈশ্বর তিনটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও সত্তা (three hypostases or three concrete realities): পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা। তন্মধ্যে পুত্র সত্তা আমার দেহের সাথে অমুকভাবে সম্পর্কিত ও সম্মিলিত হয়েছে। অথবা পুত্র সত্তাটি আমার দেহের সাথে এমন একভাবে সম্পর্কিত ও সম্মিলিত হয়েছে যার নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাদের জ্ঞানের ধারণ ক্ষমতার বাইরে। কাজেই তোমরা জেনে রাখ যে, উক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে আমিই ঈশ্বর।" অথবা এই অর্থে এমন কোনো কথা বললেন না যাতে অন্তত এ বিশ্বাসটি স্পষ্টরূপে জানা যেত। ত্রিত্ববাদী খৃস্টানগণ ত্রিত্বের পক্ষের তাঁর কোনো স্পষ্ট বাক্য পেশ করতে পারেন না। শুধু কয়েকটি দ্ব্যর্থবোধক অস্পষ্ট বাক্যই তাঁদের সম্বল।

'মীযানুল হক্ক' (Scale of Truth) গ্রন্থের প্রণেতা ড. ফান্ডার (Carl Gottaleb Pfander) তাঁর 'মিফতাহুল আসরার' (রহস্যের চাবি) নামক পুস্তকে বলেন: "আপনি যদি বলেন যে, তাহলে কেন যীশু তাঁর ঈশ্বত্বের কথা আরো পরিস্কারভাবে বললেন না? তিনি কেন স্পষ্টভাবে ও এককথায় বললেন না যে, 'আমিই ঈশ্বর'?"...

এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন: "কারণ, তাঁর পুনরুত্থান ও ঊর্ধ্বারোহণের পূর্বে কেউ এ সম্পর্ক এবং একত্ববাদ বুঝতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি যদি এ কথা বলতেন তবে তাঁরা বুঝতেন যে, তিনি তাঁর মানবীয় দেহ অনুসারে ঈশ্বর। আর এই কথাটি নিশ্চয়ই বাতিল। এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করাও সে সকল বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত যেগুলির বিষয়ে তিনি বলেন: "তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা (the Spirit of truth : আল-আমীন, আস-সাদিক) যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।"[109]

এরপর তিনি বলেন: "ইয়াহূদী ধর্মের নেতৃবৃন্দ অনেকবারই তাঁকে গ্রেফতার করতে ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে চেয়েছেন, অথচ তিনি তাঁর ঈশ্বরত্বের কথা তাঁদের সামনে একান্তই ধাঁধার আকারে পেশ করেছিলেন।"

---

[109] যোহন ১৬/১২-১৩। এখানে সুস্পষ্টতই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। এই গুণাবলির সবগুলিই তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং কোনোভাবেই 'পবিত্র আত্মার' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।...

পাদরী সাহেবের বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, দুইটি কারণে যীশু তাঁর ঈশ্বরত্বের কথা স্পষ্ট করে জানান নি:

প্রথমত, তাঁর ঊর্ধ্বারোহণের পূর্বে কেউ তা বুঝতে সক্ষম ছিল না।

দ্বিতীয়ত, ইয়াহূদীদের ভয়।

দুইটি ওজরই অত্যন্ত দুর্বল ও একান্তই অবাস্তব ব্যাখ্যা।

প্রথম বিষয়টি একেবারেই বাতিল। কারণ এক্ষেত্রে তাঁর এতটুকু কথাই যথেষ্ট ছিল যে, ‘‘আমার দেহের সাথে ঈশ্বরের দ্বিতীয় সত্ত্বা (পুত্রের সত্তার) সম্মিলন ও সংমিশ্রণের বিষয়টি বুঝা তোমাদের সাধ্যের বাইরে। কাজেই তোমরা এ বিষয়ে গবেষণা বাদ দেও। তোমরা শুধু বিশ্বাস কর যে, আমি এ মানবীয় দেহের হিসাবে ঈশ্বর নই; বরং উপর্যুক্ত সম্মিলনের ও সংমিশ্রণের ভিত্তিতে আমি ঈশ্বর।’’[110]

---

[110] এ কথাগুলি তিনি নিজে মুখে বললে তাঁর ঈশ্বরত্বের বিষয়টি বুঝা কতই না সহজ হতো! হাজার বছর ধরে তাঁর অনুসারীদের আর ঝগড়া ও দলাদলি করতে হতো না!! তিনি কত কথা বললেন! কত অপ্রয়োজনীয় (!) কথা বললেন, যেগুলি সব তাঁর শিষ্যরা ‘রহিত’ করে দিলেন! ধার্মিকতার বিষয়ে কত কথা বললেন, যেগুলি মূলত পাপমোচন ও মুক্তির জন্য অপ্রয়োজনীয়। কত কথা তিনি বললেন, যা শিষ্যগণ না বুঝলে আবার বুঝিয়ে দিলেন। ... অথচ যে বিষয়টির উপর পাপমোচন ও মুক্তি নির্ভর করছে, সেই বিষয়টি তিনি একেবারেই বুঝালেন না।... তিনি

এছাড়া তাঁর সাথে ঈশ্বরত্বের সম্পর্ক বুঝার অক্ষমতা তাঁর ঊর্ধ্বারোহণের পরে দূরীভূত হয়েছে বলে যে দাবি তিনি করেছেন তা একেবারেই ভিত্তিহীন। এ বিষয়টি বুঝার অক্ষমতা এর পরেও একইভাবে বিদ্যমান। আজ পর্যন্ত একজন খৃস্টান পণ্ডিতও এ সম্পর্ক ও একত্ববাদের সাথে এর সম্পর্ক সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি। যে যা বলেছেন সবই আন্দাযে ঢিল ছুঁড়েছেন। প্রত্যেকের কথার মধ্যেই কঠিন সমস্যা ও বিভ্রান্তি রয়েছে। সর্বদা তাঁরা একে অপরকে বিভ্রান্ত বলে অভিযোগ করেছেন। এজন্যই প্রটেস্টান্ট পণ্ডিতগণ এ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন। মি. ফান্ডারও তাঁর পুস্তকাদিতে বিভিন্ন স্থানে স্বীকার করেছেন যে, এ বিষয়টি একটি গূঢ় রহস্য যা জ্ঞান দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়।[111]

নিজের প্রাণ উৎসর্গ করলেন বিশ্বের পাপ মোচনের জন্য, অথচ যে বিশ্বাস দিয়ে পাপ মোচন হবে সে বিশ্বাসের কথাটি বুঝালেন না!

[111] ত্রিত্বের সাথে একত্বের সমন্বয় ও খৃস্টের ঈশ্বরত্বের সাথে মনুষ্যত্বের সমন্বয়ের দাবিটি একটি অযৌক্তিক ও বুদ্ধিবিরোধী বিষয়। ফলে খৃস্টানগণ কখনোই এ বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। খৃস্টানদের ধর্মীয় ইতিহাস ও অগণিত যাজকীয় সম্মেলনের (ecumenical council) বিবরণ পাঠ করলেই পাঠক তা জানতে পারবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, 'অবতারবাদ' বা মানুষরূপে ঈশ্বরের (God incarnate) আগমন বিষয়ক ধর্মবিশ্বাস বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। হিন্দুধর্মেও এই বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু এই বিশ্বাসটির ব্যাখ্যা করতে যেয়ে খৃস্টানদের মত বিপদে কেউ পড়েন নি। হিন্দুরা খুবই সহজভাবে কৃষ্ণকে

ঈশ্বরের অবতার (God incarnate) বলে বিশ্বাস করেন। এর ব্যাখ্যা চাইলে তারা অতি সহজে বলবেন যে, ঈশ্বর মানুষ রূপে এসেছিলেন.... ইত্যাদি। আবার খৃস্টানরা খৃস্টকে ঈশ্বরের অবতার (God incarnate) বলে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এর ব্যাখ্যা দিতে তাঁদের খুবই বেগ পেতে হয়। মূলত পুরাতন নিয়মের একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাসের সাথে এই অবতার বাদের সমন্বয় করতে যেয়েই এই বিপদ। এর পাশাপাশি নতুন নিয়মের কিছু কথাও তাঁদেরকে বিপদে ফেলেছে। ৪টি বিষয় তাঁদেরকে বিপদগ্রস্থ করেছে: (১) ঈশ্বরকে তিনটি পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্রময় সত্তায় বিভক্ত করা, (২) আবার এই তিনটি স্বতন্ত্র সত্তাকে এক বলে দাবি করা, (৩) এই তিনের একজন খৃস্টের মধ্যে আবার পৃথক দুইটি সত্তার অস্তিত্ব দাবি করা এবং (৪) এই ঈশ্বর মানব জাতির পাপের জন্য প্রাণ দিয়েছেন বলে দাবি করা। এই ৪টি বিষয়ের সমন্বিত ব্যাখ্যা তাঁদের জন্য এত কঠিন যে, প্রকৃতপক্ষে কেউ এর ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। ফলে একজনের ব্যাখ্যার সাথে অন্যজনের ব্যাখ্যা মিলে না। প্রাচীন যুগ থেকে অগণিত খৃস্টান ধর্মগুরু ও পন্ডিতের মতামত পাঠ করলেই পাঠক তা বুঝতে পারবেন। খৃস্টধর্মের অগণিত দল উপদলও মূলত এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই জন্মেছিল। কোনো খৃস্টানই এই তিনটি বিষয়ের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। এ বিষয়ক কিছু মতামত দেখুন: Encyclopaedia Britannica, articles: Chalcedon, Council of; Syrian Orthodox Patriarchate of Antioch, Nestorius; Nestorian, Monarchianism; Paul Of Samosata, etc.

বর্তমানে অনেকেই এ বলে পার পেতে চান যে, ত্রিত্ববাদ একটি অযৌক্তিক ও অবাস্তব বিষয়, তবে যেহেতু ধর্মগ্রন্থে রয়েছে তাই আমরা বিশ্বাস করি (an irrational truth found in revelation)। তাদের এ কথাটি প্রতারণা মাত্র। প্রথমত, কখনোই কোনো ধর্মগ্রন্থে ত্রিত্ববাদের এ কথাগুলি নেই। প্রচলিত বিকৃত বাইবেলের মধ্যেও কোথাও ত্রিত্ববাদ (Trinity) শব্দটিই নেই, এর সংজ্ঞা বা

দ্বিতীয় ওযরটিও একইভাবে বাতিল। কেন যীশু খৃস্ট ধাঁধার আকারে তার ঈশ্বরত্বের কথা বলবেন? কেন তিনি ইয়াহূদীদেরকে ভয় পাবেন? খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে তাঁর আগমনের তো একটিই উদ্দেশ্য, তা হলো ক্রুশে চড়ে প্রাণ দিয়ে সৃষ্টির পাপ মোচন। ইয়াহূদীদের হাতে ক্রুশবিদ্ধ হতেই তো তিনি এসেছিলেন। তিনি নিশ্চিতরূপে জানতেন যে, ইয়াহূদীরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করবে। কখন তাঁরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করবে তাও তিনি জানতেন। কাজেই তিনি সঠিক বিশ্বাসটি ব্যাখ্যা করতে ভয় পাবেন কেন?

বড় অবাক কান্ড! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্ঠা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টদের থেকে ভয় পাচ্ছেন! তাঁর সৃষ্টির মধ্যে একটি দুর্বল জাতিকে তিনি এত ভয় পাচ্ছেন যে, ভয়ের চোটে সেই কথাটিও বলতে পারছেন না, যে কথাটি বিশ্বাস করার উপরে মুক্তি ও পূর্ণতা নির্ভর করছে। অথচ সেই ঈশ্বরেরই সৃষ্ট ভাববাদিগণ, যেমন যিরমিয়, যিশাইয়, যোহন, এরা তাঁদের সামনে সত্য বলতে

ব্যাখ্যা তো অনেক দূরের কথা। দ্বিতীয়ত, যদি কোনো ধর্মগ্রন্থে এরূপ কথা থাকে তবে তা প্রমাণ করবে যে, তা মহান আল্লাহর দেওয়া ওহী নয়; কারণ ওহী ও মানবীয় জ্ঞান উভয়ই একই উৎস থেকে আগত, কাজেই উভয়ের মধ্যে ব্যতিক্রম থাকতে পারে, তবে সংঘর্ষ থাকতে পারে না। বিস্তারিত দেখুন: ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা, পৃ. ৭০-৭৩।

ভয় পাচ্ছেন না। তাঁদেরকে কঠিন ভাবে যন্ত্রণা ও শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। কাউকে আবার হত্যাও করা হচ্ছে! কিন্তু তাঁরা সত্য প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছেন না।

এর চেয়েও অবাক বিষয় হলো, খৃস্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ বিশ্বাসটি সঠিকভাবে বলার ক্ষেত্রে ইয়াহূদীদেরকে ভয় পাচ্ছেন। অথচ সৎকার্যে আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করার বিষয়ে তাঁদেরকে কঠোরতার সাথে সত্য কথা বললেন। এমনকি সে বিষয়ে তাঁদেরকে গালাগালি করলেন। তিনি ইয়াহূদী অধ্যাপক ও ফরীশীগণকে মুখোমুখি সম্বোধন করে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাদের গালি দিয়েছেন ও তাদের অনাচার মানুষদের সামনে প্রকাশ করে দেন। এমনকি তাঁদের একজন তাঁকে অভিযোগ করে বলেন যে, "হে গুরু, এ কথা বলিয়া আপনি আমাদেরও অপমান করিতেছেন।" মথি ২৩/১৩-৩৭ ও লূক ১১/৩৭-৫৪-এ সকল বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।[112]

এর পরেও কিভাবে মনে করা যায় যে, খৃস্ট ইয়াহূদীদের ভয়ে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এ বিশ্বাসটি স্পষ্ট করে বলেন নি? কখনোই তা তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে ঘটতে পারে না, কখনোই না।

---

[112] মথি ২৩/১৩-৩৭; লূক ১১/৩৭-৫২।

প্রথম পরিচ্ছেদ:
বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণাদি দ্বারা ত্রিত্ববাদ খণ্ডন

খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ উভয়ই প্রকৃত, বাস্তব ও আক্ষরিক সত্য, কোনোটিই রূপক বা আপেক্ষিক নয়। আর মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক, যুক্তি ও বিজ্ঞান কখনোই প্রকৃত 'একত্ব' ও প্রকৃত 'বহুত্ব'কে একত্রিত বলে স্বীকার করতে পারে না। কোনো কিছু প্রকৃত ও আক্ষরিক অর্থে "তিন" বলে প্রমাণিত হওয়ার অর্থ তা প্রকৃত ও আক্ষরিকভাবে "একাধিক" বলে প্রমাণিত। আর যা প্রকৃত "একাধিক" তা কখনোই প্রকৃত "এক" হতে পারে না। একই বিষয়ে প্রকৃত 'একাধিক্য'-এর সাথে প্রকৃত 'একত্ব' একত্রিত হওয়ার দাবি করলে 'দুইটি প্রকৃত সাংঘষিক বিষয়' একত্রিত হওয়ার দাবি করা হবে। যা একেবারেরই অসম্ভব ও অবান্তর।

কাজেই যিনি ত্রিত্বে বিশ্বাস করেন, অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রকৃত অর্থেই সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তিনটি ব্যক্তি বা সত্ত্বা (three persons) বলে বিশ্বাস করেন, তিনি কখনোই প্রকৃত একত্বে- অর্থাৎ ঈশ্বর প্রকৃতই এক ব্যক্তি বা সত্ত্বা বলে বিশ্বাস করতে পারেন না।

যা প্রকৃত 'এক' তার পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ এক-তৃতীয়াংশ থাকতে পারে না। কিন্তু 'তিন'-এর একটি পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে, তা হলো 'এক'। তিন হলো 'তিনটি এক'-এর সমষ্টি। 'প্রকৃত এক' কখনো একাধিক 'এক' এর সমষ্টি হতে পারে না।

প্রকৃত 'এক' তিন-এর একটি অংশ। যদি একই বস্তু একই সময়ে 'তিন' ও 'এক' হয় তবে বুঝতে হবে যে, বস্তুটি একই সময়ে নিজেই পূর্ণ এবং নিজেই নিজের অংশ। একত্ব ও ত্রিত্বের একত্রিত হওয়ার অর্থ হলো 'এক' নিজেই নিজের এক-তৃতীয়াংশ এবং তিন 'এক'-এর এক তৃতীয়াংশ। আবার তিন নিজেই নিজের তিনগুণ এবং এক নিজেই নিজের তিনগুণ। মানবীয় বুদ্ধি-বিবেক এরূপ চিন্তাকে পাগলের প্রলাপ বলে গণ্য করবে।[113]

---

[113] খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, তাঁদের ধর্ম পুরাতন নিয়মের ধর্মের শিক্ষা থেকে গৃহীত। কিন্তু এই দাবিটি একটি অন্তঃসারশূণ্য মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। পুরাতন নিয়মের "মাসীহ", "বাক্য" ইত্যাদি কয়েকটি শব্দের বিকৃত অর্থ ছাড়া পুরাতন নিয়মের কোনো ধর্ম বিশ্বাস বা ধর্মীয় আচারই প্রচলিত খৃস্টধর্মে নেই। খৃস্টধর্মের ভিত্তি হলো গ্রীক দর্শন ভিত্তিক রোমান প্যাগান ধর্ম। ইসলাম ধর্ম ভারতে আগমণের পরে সম্রাট আকবর হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তিতে 'ইসলাম' ধর্মকে 'সাইজ' করে নতুন ধর্ম তৈরির চেষ্টা করেন। তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু একই চেষ্টায় পৌল ও তাঁর সহকর্মিগণ সফল হয়েছিলেন। গ্রীক লগস (logos) শব্দটির অর্থ 'জ্ঞান', 'বিবেক', 'পরিকল্পনা' 'বাক্য' ইত্যাদি (word, reason, plan)। গ্রীক দর্শনে ও রোমান পৌত্তলিক ধর্মে এই 'লগস' শব্দটিকে ঈশ্বরের বিশেষ গুণ এবং সৃষ্টির উৎস মনে করা হতো। এছাড়া মানুষের মধ্যে 'বিবেক' বা 'জ্ঞান'-কেও ঐশ্বরিক শক্তি বলে বিশ্বাস করা হতো। এর পৌত্তলিক ব্যবহারও ছিল। শব্দটির প্রতি এই পৌত্তলিক ভক্তি ও গ্রীক দর্শনের ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে 'খৃস্টকে' মুর্তিমান লগস বলে প্রচার করা হয়। বলা হয় 'বাক্য মাংস হলেন'। বিস্তারিত দেখুন: Encyclopaedia Britannica, articles: Logos;

এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে "প্রকৃত ত্রিত্ব" কখনোই সম্ভব নয়। এজন্য যদি খৃস্টানগণের ধর্মগ্রন্থে আল্লাহর ত্রিত্ববোধক কোনো কথা পাওয়া যায় তাহলে তা এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যেন তা বাইবেলের অন্যান্য বক্তব্য ও মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

জর্জ সেল (George Sale) অষ্টাদশ শতকের একজন খৃস্টান পণ্ডিত। তিনি ইংরেজি ভাষায় কুরআন কারীমের অনুবাদ করেন ১৭৩৪ সালে প্রথম প্রকাশিত এবং ১৮৩৬ খৃস্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত হয়। তিনি খৃস্টান প্রচারক ও পাদরিদেরকে মুসলিমদের বিষয়ে কিছু উপদেশ ও পরামর্শ দান করেন। এতে তিনি বলেন: "আপনারা মুসলমানদেরকে জ্ঞানবুদ্ধি-বিরোধী ধর্মীয় বিষয়গুলি শেখাবেন না। কারণ তারা এমন বোকা নয় যে, এ সকল জ্ঞান বিরোধী বিষয় আমরা তাদেরকে গেলাতে পারব। যেমন মুর্তি বা প্রতিকৃতির উপাসনা[114], প্রভুর নৈশভোজ (Eucharist/Holy Communion/

Incarnation. বাক্যের দেহ গ্রহণ যদি জিন, ভুত বা ফিরিশতার দেহ গ্রহণের মত কিছু বলে তাঁরা দাবি করতেন, তবে তাঁদের সমস্যা কম হতো। তাঁরা দাবি করেন যে, যীশুর মানবীয় সত্তার সাথে বাক্যের ঈশ্বরীয় সত্তা মিশ্রিত হয়। এ মিশ্রণের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তাঁরা কোনো দিনই দিতে পারেন নি।

[114] খৃস্টানগণ উপাসনায় বা প্রার্থনায় যীশু, মেরি, ক্রশ ইত্যাদির প্রতিমুতির (icon) পুজা করেন, এগুলির উদ্দেশ্যে প্রণতি জানান ও প্রার্থনা করেন, যদিও বাইবেলের

Lord's Supper)[115] ইত্যাদি বিষয়। এ সকল বিষয় গ্রহণ করতে তাদের খুবই অসুবিধা হয়। যে সকল চার্চে বা ধর্মমতে এ ধরনের বিষয় রয়েছে সেগুলি কখনো মুসলমানদেরকে আকর্ষণ করতে পারে না।"

এখানে এ খৃস্টান পণ্ডিত স্বীকার করছেন যে, প্রতিকৃতি উপাসনা এবং প্রভুর নৈশভোজ জাতীয় অনুষ্ঠানগুলি 'জ্ঞান বিরোধী'।[116] প্রকৃত সত্য কথা হলো, এই সকল বিষয় যারা বিশ্বাস করেন তারা নিঃসন্দেহে একত্ববাদের ছায়া থেকে বঞ্চিত এবং বহু-ঈশ্বরবাদের অন্ধকারে নিমজ্জিত। মহিমাময় আল্লাহ তাঁদেরকে সঠিক পথে

পুরাতন ও নতুন নিয়মে মুর্তি, প্রতিমা ও প্রতিকৃতির পূজা-অর্চনা কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

[115] খৃস্টধর্মের মূল 'ইবাদত' বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে খৃস্টানগণ রুটি ও মদ গ্রহণ করেন এবং বিশ্বাস করেন যে পাদরি প্রার্থনার সাথে সাথে প্রত্যেকের হাতের রুটির টুকরা ও মদ প্রকৃত অর্থে যীশু খৃস্টের দেহ ও রক্তে রূপান্তরিত হয়। তারা আক্ষরিকভাবে ও প্রকৃত অর্থে যীশুর মাংস ভক্ষণ করেন ও রক্ত পান করেন। এভাবে যীশুর রক্ত-মাংস পানাহারের মাধ্যমে তারা অনন্ত জীবন লাভ করেন।

[116] তিনি আরো স্বীকার করলেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে ইসলামী ধর্মবিশ্বাস এত স্বচ্ছ, যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যে, মুসলমানদের মধ্যে এরূপ জ্ঞান-বিরোধী কুসংস্কারের ও বিশ্বাসের প্রতি স্বভাবজাত ঘৃণা সৃষ্টি হয়। এজন্য তাঁরা এ প্রকারের বিষয় মানতে পারেন না।

পরিচালিত করুন। প্রকৃত সত্য কথা হলো, পৃথিবীতে এত বেশি অবান্তর, অবাস্তব ও বুদ্ধিবিবেক বিরোধী ধর্ম বিশ্বাস আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা ধর্মবিশ্বাস হিসেবে ও তাঁর প্রমাণে যে সকল কথা বলেন এগুলি বুদ্ধিবৃত্তিক অসচ্ছত ও মানবীয় জ্ঞানের সার্থে সাংঘর্ষিকতা যে কোনো বিবেকবান মানুষের কাছে সুস্পষ্ট।[117]

---

[117] খৃস্টধর্মের মূল বিষয় : ত্রিত্ববাদ (Trinity), মূল পাপ (Original Sin) ও প্রায়শ্চিতবাদ (Atonement), নৈশভোজ, ইত্যাদি। ত্রিত্ববাদ ও নৈশভোজের কথা পাঠক জনলেন। মূলপাপ ও প্রায়শ্চিতবাদের মূল কথা হলো, আদমের ফল ভক্ষণের কারণে সকল মানুষ জন্মগতভাবে পাপী। এ পাপের জন্য সকল মানব সন্তানকে জাহান্নামে যেতেই হবে। প্রায়শ্চিত্ব হিসেবে কুরবানী দিতে হবে। কিন্তু পাপী নিজে বা পাপীর সন্তানগণ প্রায়শ্চিত করলে বা কুরবানী দিলে হবে না। নিষ্পাপকে পাপীর জন্য কুরবানী দিতে হবে। ঈশ্বর মানুষের এ পতনে বেদনাতুর হন। মানুষকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার আর কোনো পথ না পেয়ে তিনি নিজের পুত্র সত্ত্বাকে মানুষরূপে পৃথিবীতে পাঠান। মানুষরূপী ঈশ্বর মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত হিসেবে নিজে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। জাহান্নাম বা নরকের চাবী শয়তানের হাতে থাকে। মৃত্যুর দরজা পার না হয়ে সেখানে যাওয়া যায় না। ঈশ্বর স্বয়ং মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে মৃত্যুর দরজা পার হয়ে নরকে গমন করেন এবং তিন দিন নরক-শাস্তি ভোগ করার পর নরকের চাবি নিয়ে চলে আসেন। এভাবে তিনি আদমের পাপের প্রায়শ্চিত করেন ও মানবজতিকে নরক থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করেন। এখন মানুষের দায়িত্ব শুধু একথা বিশ্বাস করা যে, ঈশ্বর তিনটি ঈশ্বরের সমষ্টি। তিনজনই পরিপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প্রকৃত ঈশ্বর। তবে তিন মিলে তিন ঈশ্বর নন, এক ঈশ্বর। আর

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:
যীশুর বক্তব্য দ্বারা ত্রিত্ববাদ খণ্ডন

প্রথম বাক্য: যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে যীশুখৃস্ট ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বলেছেন: "আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়। (And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.)"

এখানে যীশু অনন্ত জীবন কী তা অতি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, অনন্ত জীবন হলো আল্লাহকে

এ ঈশ্বরের এক ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর পৃথিবীতে এসে মরিয়ম-তনয় যীশুর দেহের মধ্যে মিশে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন, তিনদিন নরকবাস করেন এবং পুনরুত্থিত হয়ে স্বর্গে পিতার নিকট গমন করেন। এ বিশ্বাস করলেই মানুষের জান্নাত লাভ সুনিশ্চিত। এ বিশ্বাস যার আছে সে যত পাপই করুক না কেন তার জন্য জান্নাত সুনিশ্চিত। কোনো কর্মই তার জন্য জরুরী নয়। বরং কর্ম করে বা শরীয়ত মেনে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করার অর্থই যীশুর বরকতে অবিশ্বাস করা। খৃস্টধর্মের মূলপাপ ও প্রায়শ্চিতবাদ বিষয়ে জনৈক খৃস্টান লেখক বলেন: "No heathen tribe has conceived so grotesque an idea, involving as it does the assumption, that man was born with a hereditary stain uopn him, and that this stain (for wihch he was not personally responsible) was to be atoned for, and that the creator of all things had to sacrifice His only begotten son to neutralise this mysterious curse." Major Yeats-Brown, Life of a Bengal Lancer. From Ahmed Deedat, The Choice Vo.-2, p165.

একমাত্র সত্য ঈশ্বর বা উপাস্য বলে জানা এবং যীশুখৃস্টকে তাঁর প্রেরিত (রাসূল) বলে জানা।

তিনি বলেন নি যে, 'ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা জানিবে তোমার সত্ত্বা তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্ত্বার সমন্বয় এবং যীশু মনুষ্য ও ঈশ্বর, অথবা যীশু মাংশে প্রকাশিত ঈশ্বর (God manifested in the flesh/ God in the flesh/ God incarnate)।'

যীশুর এ কথা বলেছিলেন ঈশ্বরকে সম্বোধন করে প্রার্থনার মধ্যে। কাজেই ইয়াহূদীদের ভয়ে প্রকৃত সত্য এড়িয়ে গিয়েছিলেন বলে চিন্তা করার কোনো সুযোগ এখানে নেই। যদি সত্যই 'ঈশ্বরের ত্রিত্বে' ও 'যীশুর ঈশ্বরত্বে' বিশ্বাসের' উপর অনন্ত জীবনের ভিত্তি হতো তবে নিশ্চয়ই তিনি এখানে তা উল্লেখ করতেন। তিনি তা জানান নি, বরং জানিয়েছেন যে, 'ঈশ্বরের প্রকৃত (true) একত্বে' ও 'যীশুর প্রেরিতত্বে' বিশ্বাসই অনন্ত জীবন। এথেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এর বিপরীত কোনো বিশ্বাস পোষণ করা অনন্ত ধ্বংস বা অনন্ত মৃত্যু। কাজেই ঈশ্বরের একত্বের বিপরতীতে ঈশ্বরের ত্রিত্বে বিশ্বাস করা এবং যীশুর প্রেরিতত্বের বিপরীতে যীশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করা অনন্ত ধ্বংস ও অনন্ত মৃত্যু। এখানে যীশু নিজেকে প্রেরিত ও আল্লাহকে প্রেরণকারী বলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যীশুর প্রেরিত হওয়া তাঁর ঈশ্বর হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক। প্রেরিত ও

প্রেরণকারী কখনোই এক হতে পারেন না; তারা অবশ্যই পৃথক। নইলে এ কথার কোনো অর্থ থাকে না।

দ্বিতীয় বাক্য: মার্কলিখিত সুসমাচারের ১২/২৮-৩৪: "(২৮) আর অধ্যাপকদের এক জন নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে তর্ক বিতর্ক করিতে শুনিয়া, এবং যীশু তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল আজ্ঞার মধ্যে কোন্টি প্রথম? (২৯) যীশু উত্তর করিলেন, প্রথমটি এই, 'হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু; (৩০) আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে। (৩১) দ্বিতীয়টি এই, 'তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে। এই দুই আজ্ঞা হইতে বড় আর কোন আজ্ঞা নাই। (৩২) অধ্যাপক তাঁহাকে কহিল, বেশ, গুরু, আপনি সত্য বলিয়াছেন যে, তিনি এক, এবং তিনি ব্যতীত অন্য নাই; (৩৩) আর সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত বুদ্ধি ও সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহাকে প্রেম করা এবং প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করা সমস্ত হোম ও বলিদান হইতে শ্রেষ্ঠ। (৩৪) তখন সে বুদ্ধিপূর্বক উত্তর দিয়াছে দেখিয়া যীশু তাহাকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য হইতে তুমি দূরবর্তী নও।"

মথিলিখিত সুসমাচারের ২২ অধ্যায়ের ৩৪-৪০ শ্লোকেও যীশুর এ বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। এখানে তিনি উপর্যু&ক্ত দুটি আজ্ঞার কথা

উল্লেখ করে বলেন: "এই দুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদীগ্রন্থও ঝুলিতেছে।"[118]

এ থেকে একটি বাস্তব মহাসত্য জানা গেল। তা হলো, প্রথম যে আজ্ঞাটি তোরাহ ও সকল ভাববাদীর গ্রন্থেই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যা ঈশ্বরের রাজ্যের নৈকট্যের মূল কারণ তা হলো একত্ববাদ, অর্থাৎ একথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহই একমাত্র ঈশ্বর বা উপাস্য এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। যদি ত্রিত্ববাদের উপরে মুক্তি নির্ভর করতো, তবে নিশ্চয়ই তা তোরাহ ও অন্য সকল ভাববাদীর গ্রন্থে প্রথম আজ্ঞা হিসেবে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হতো। আর তাহলে যীশু বলতেন: 'প্রথম আজ্ঞাটি এই, 'ঈশ্বর প্রভু এক, যিনি তিনটি প্রকৃত ও সম্পূর্ণ পৃথক সত্তার অধিকারী এবং আমিই দ্বিতীয় ঈশ্বর বা ঈশ্বরের দ্বিতীয় ব্যক্তি ও ঈশ্বরের পুত্র।'

যেহেতু যীশু তা বলেন নি এবং পুরাতন নিয়মের কোনো পুস্তকেই তা বলা হয় নি, সেহেতু আমরা সুনিশ্চিতরূপে জানতে পারছি যে, ঈশ্বরের প্রকৃত একত্বে বিশ্বাস করাই মুক্তির পথ। ঈশ্বরের ত্রিত্বে বিশ্বাস ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক, কাজেই তা মুক্তির পথ নয়, বরং ধ্বংসের পথ।[119]

---

[118] মথি ২২/৪০।

[119] এখানে লক্ষণীয় যে, এ অধ্যাপক ত্রিত্বে বিশ্বাস করতেন না। উপরন্তু কেউ ত্রিত্বের কথা বললে বা যীশু নিজেকে ঈশ্বরের এক অংশ বলে দাবি করলে

পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলি ঈশ্বরের প্রকৃত একত্বের নির্দেশনায় ভরপুর। নমুনা হিসেবে পাঠক নিম্নের কয়েকটি অনুচ্ছেদ দেখতে পারেন: দ্বিতীয় বিবরণ ৪/৩৫ ও ৩৯; ৬/৪-৫; যিশাইয় ৪৫/৫-৬; ৪৬/৯।

তৃতীয় বাক্য: মার্কলিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে বলা হয়েছে: "কিনতু সেই দিনের বা সেই দন্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না; স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।"

এ বাক্যটি সন্দেহাতীতভাবে ত্রিত্ববাদের বাতুলতা ঘোষণা করছে। কারণ যীশু এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করছেন যে, কিয়ামত বা বিনাশ দিবসের জ্ঞান একমাত্র ঈশ্বরেই আছে, আর কারো নেই। অন্য সকল সৃষ্টির সাথে তাঁর নিজেকেও তিনি এই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত বলে উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনিও অন্য সকল সৃষ্টির

তাকে নির্দ্বিধায় হত্যা করতেন। অথচ যীশু সুস্পষ্ট উক্ত অধ্যাপককে ঈশ্বরের রাজ্যের নিকটবর্তী বলে উল্লেখ করেছেন। এতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, ঈশ্বরের রাজ্যে বা জান্নাতে প্রবেশের জন্য ত্রিত্বে বিশ্বাস ও যীশুর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস প্রয়োজনীয় নয়; বরং ত্রিত্বমুক্ত প্রকৃত একত্বে বিশ্বাসই জান্নাতের জন্য যথেষ্ট।

সমান বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁকে ঈশ্বর কল্পনা করলে তা কখনোই সম্ভব নয়।[120]

চতুর্থ বাক্য: মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭/৪৬ ও ৫০ শ্লোক: "(৪৬) আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, এলী এলী লামা শবক্তানী, অর্থাৎ ঈশ্বর আমার,

---

[120] বিশেষত, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, খৃস্টধর্মের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে 'বাক্য' এবং ঈশ্বরের 'পুত্রসত্ত্বা' বলতে ঈশ্বরের জ্ঞানকেই বুঝানো হয়। খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের বাক্য বা ঈশ্বরের পুত্রসত্ত্বা যীশুর সত্ত্বার সাথে একাকার হয়ে ছিল। এ সংমিশ্রণের প্রকৃতি নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেভাবেই হোক, তারা বিশ্বাস করেন যে, যীশু ছিলেন ঈশ্বরের জীবন্ত জ্ঞান। আর সেক্ষেত্রে পিতা ঈশ্বরের চেয়ে পুত্র ঈশ্বরের মধ্যে জ্ঞান বেশি থাকা উচিত। তা না হলে অন্তত পুত্রের জ্ঞান পিতার চেয়ে কোনো অংশেই কম হতে পারে না। খৃস্টান পন্ডিতগণ যীশুর এ জাতীয় বাক্যের ব্যাখ্যায় অনেক সময় বলেন যে, যীশু তার দেহের দিকে লক্ষ্য করে ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করতেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যার কোনো উপায় নেই। কারণ 'জ্ঞান' কোনো দৈহিক বিষয় নয় বা দেহ সম্পৃক্ত গুণ নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, দেহ, প্রাণ, সত্ত্বা বা আত্মায় কোনো দিক থেকেই যীশু ঈশ্বর ছিলেন না। এছাড়া এখানে যীশু সুস্পষ্ট পুত্রের কথা বলেছেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র হিসেবেও তিনি এ দিবসের কথা জানেন না। এতে প্রমাণিত যে, ঈশ্বরের পুত্র বলতে তিনি কখনোই নিজেকে ঈশ্বরের সত্ত্বার অংশ বলে দাবি করেন নি; বরং ইস্রায়েলীয়গণ অন্যান্য নেককার মানুষ বা ভাববাদিগণকে যেভাবে ঈশ্বরের পুত্র বলত, সেভাবেই তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলতেন।

ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ? (৫০) পরে যীশু আবার উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া নিজ আত্মাকে সমর্পণ করিলেন।"

লূকলিখিত সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে বলা হয়েছে: "আর যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া কহিলেন, পিত, তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি; আর এই বলিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।"

খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে এ হলো যীশুর জীবনের সর্বশেষ কথা। আর এ কথাগুলি তাঁর ঈশ্বরত্বের বিষয়ে খৃস্টানদের দাবি সর্বোতভাবে মিথ্যা ও বাতিল বলে প্রমাণ করে। তিনি যদি ঈশ্বরই হতেন তাহলে অন্য কোনো ঈশ্বরের নিকট তিনি ত্রাণ বা সাহায্য প্রার্থনা করতেন না। ঈশ্বর এরূপ অসহায় হতে পারেন না বা ঈশ্বর এভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারেন না। অবসাদ, দুর্বলতা, অসহায়ত্ব, শ্রান্তি, ক্লান্তি ইত্যাদির দুর্বলতা কখনো ঈশ্বরকে স্পর্শ করতে পারে না। যিশাইয় ৪০/২৮: "তুমি কি জ্ঞাত হও নাই? তুমি কি শুন নাই? অনাদি অননত ঈশ্বর, সদাপ্রভু, পৃথিবীর প্রান্ত সকলের সৃষ্টিকর্তা ক্লান্ত হন না, শ্রান্ত হন না; তাঁহার বুদ্ধির অনুসন্ধান করা যায় না।"

এভাবে পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে অগণিত শ্লোক ও অনুচ্ছেদ বিদ্যমান যেগুলিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এরূপ মানবীয় দর্বলতা কখনো ঈশ্বরকে স্পর্শ করতে পারে না। নমুনা হিসেবে পাঠক যিশাইয় ৪৪/৬; যিরমিয় ১০/১০; হবক্কুক ১/১২; তিমথীয় ১/১৭ ইত্যাদি দেখতে পারেন। এ সকল শ্লোকে বারংবার

বলা হয়েছে যে, প্রকৃত ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, জীবন্ত, অমর (everlasnting), অক্ষয় ও মৃত্যুর ঊর্ধ্বে (immortal)।

যে ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, যাকে কোনো ক্লান্তি, শ্রান্তি বা দুর্বলতা স্পর্শ করতে পারে না, যিনি জীবন্ত-চিরঞ্জীব, অমর ও অক্ষয় তিনি কিভাবে অসহায় হয়ে ত্রাণপ্রার্থনা করতে করতে মৃত্যুবরণ করবেন? মরণশীল ক্ষয়শীল অসহায় অক্ষম কি ঈশ্বর হতে পারে? কখনোই নয়! কোনোভাবেই নয়!! বরং তাদের ধারণা ও বর্ণনা অনুসারে এই অন্তিম সময়ে যীশু যার কাছে ত্রাণ প্রার্থনা করে চিৎকার করেছিলেন তিনিই হলেন প্রকৃত ও সত্য ঈশ্বর।

এখানে লক্ষণীয় যে, ঈশ্বরকে বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে অমর বা মৃতুহীন বলা হয়েছে। এর মধ্যে হবক্কুক ১/১২। আরবী অনুবাদের প্রাচীন সংস্করণগুলিতে এ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার পবিত্রতম ..... তুমি মরিবে না (لا تموت)।" কিন্তু পরবর্তী আরবী সংস্করণগুলিতে লেখা হয়েছে: "... আমরা মরিব না (لا نموت)।"

কেরির বঙ্গানুবাদে আয়াতটি নিম্নরূপ: " হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার পবিত্রতম, তুমি কি অনাদিকাল হইতে নহ? আমরা মারা পড়িব না; হে আমার সদাপ্রভু, তুমি বিচারার্থে উহাকে নিরূপন করিয়াছ...।" 'আমরা মারা পড়িব না' কথাটির টীকায় লেখা হয়েছে "(বা) তুমি মরিবে না।"

যে কোনো পাঠক এ শ্লোকটি পাঠ করলে বুঝবেন যে, "আমরা মারা পড়িব না" কথাটি এখানে অর্থহীন। এ বাক্য সম্পূর্ণ ঈশ্বরের প্রশংসায় বলা হয়েছে, আগে ও পরে সবই ঈশ্বরকে সম্বোধন করে তার গুণাবলি বর্ণনা করা। এখানে মাঝখানে "আমরা মরিব না" কথাটি অর্থহীন। একথা সুস্পষ্ট যে, "তুমি মরিবে না" কথাটি কোনো ধার্মিক খৃস্টান লিপিকার বিকৃত করে "আমরা মরিব না" বানিয়ে দেন; যেন যীশুর মৃত্যু দাবির বৈধতা পাওয়া যায়। আর আরবী, হিব্রু ইত্যাদি ভাষায় এরূপ বিকৃতি খুবই সহজ, একটি বা দুটি নুকতা পরিবর্তন করলেই হয়।

পঞ্চম বাক্য: যোহন ২০/১৭ শ্লোকে মগ্দলীনী মরিয়মকে সম্বোধন করে যীশু বলেন: "আমাকে স্পর্শ করিও না, কেননা এখনও আমি ঊর্ধ্বে পিতার নিকটে যাই নাই; কিনতু তুমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে আমি ঊর্ধ্বে যাইতেছি (I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God)।"

এখানে যীশু ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর নিজেকে অন্য সকল মানুষের সমান বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: "যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর"। তাঁর একথা বলার উদ্দেশই হলো, যেন মানুষ মিথ্যা অবপাদ

দিয়ে তাঁকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র বলতে না পারে। তিনি সুস্পষ্টভাবে বললেন যে, তার শিষ্যরাও তারই মত ঈশ্বরের পুত্র। অর্থাৎ তারাও যেমন ঈশ্বরের প্রকৃত পুত্র নয়, বরং রূপক অর্থে 'আল্লাহর বান্দা' অর্থে ঈশ্বরের পুত্র, তিনিও ঠিক তেমনি রূপক অর্থে 'আল্লাহর বান্দা' অর্থে ঈশ্বরের পুত্র, প্রকৃত অর্থে নন। ঈশ্বর যেমন তাদের সকলের ঈশ্বর, ঠিক তেমনিভাবে তিনি তাঁরও ঈশ্বর এবং সকলেই ঈশ্বরের দাস অর্থে ঈশ্বরের পুত্র।

এখানে লক্ষণীয় যে, খৃস্টানদের বর্ণনা অনুসারে যীশু একথা বলেছেন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পরে স্বর্গারোহণের কিছু আগে। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বর্গারোহণের পূর্ব পর্যন্ত আজীবনই তিনি নিজেকে 'আল্লাহর বান্দা' বা 'ঈশ্বরের দাস' বলে উল্লেখ করেছেন এবং 'ঈশ্বরের পুত্র' পরিভাষাটি এ অর্থেই ব্যবহার করেছেন। এর সাথে কুরআনের বর্ণনা মিলে যায়। সূরা আল-ইমরানের ৫১ আয়াতের বর্ণনায় ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু।" সূরা মায়িদার ৭২ ও ১১৭ আয়াতের বর্ণনায় তিনি বলেন: "তোমরা আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু আল্লাহর ইবাদত কর...।" সূরা মরিয়মের ৩৬ আয়াতের বর্ণনায় তিনি বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু, অতএব তোমরা তার ইবাদত কর।" সূরা যুখরুফের

৬৪ আয়াতের বর্ণনায় তিনি বলেন: "নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু, অতএব তোমরা তার ইবাদত কর।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, যীশু সর্বশেষ যে কথাগুলি বলেছেন এবং তার ঊর্ধ্বারোহণের পূর্বমুহূর্তে শিষ্যদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন তার সাথে ত্রিত্ববাদ এবং যীশুর ঈশ্বরত্বের দাবি সাংঘর্ষিক। তিনি সেই সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর শিষ্যদেরকে আল্লাহর একত্ববাদ এবং তিনি নিজেও যে তাঁদেরই মত আল্লাহর বান্দা তা শিক্ষা দিয়েছেন।

ষষ্ঠ বাক্য: সুসমাচারগুলিতে অগণিত স্থানে যীশু বলেছেন যে, তিনি মানুষের সন্তান বা 'মনুষ্যপুত্র' (son of man)।[121] তিনি যে মানুষ মাত্র তা বুঝাতেই তিনি তা বলেছেন; কারণ মনুষ্য পুত্র মানুষ ছাড়া আর কিছুই হতে পারেন না। এছাড়া তিনি বারংবার বলেছেন যে, তিনি আচার্য বা শিক্ষক, তিনি প্রেরিত-রাসূল, তিনি নবী বা ভাববাদী। নমুনা হিসেবে পাঠক নিম্নের শ্লোকগুলি দেখতে পারেন: মথি ১০/৪০,

---

[121] হিব্রু বা সেমিটিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভু অর্থে ঈশ্বরকে 'পিতা' বলার প্রচলন ছিল। তেমনিভাবে মানুষদেরকে বা ঈশ্বরের প্রিয় মানুষদেরকে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলার প্রচলন ছিল। এই অর্থে যীশুও ঈশ্বরকে পিতা বলতেন। তবে মানুষ যেন অতিভক্তির কারণে তাকে প্রকৃত অর্থে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে শির্ক বা অংশীবাদিতায় নিপতিত না হতে পারে, এজন্য তিনি নিজেকে সর্বদা 'মনুষ্য পুত্র' বলে আখ্যায়িত করতেন। কারণ, বাইবেলে বারংবার "মনুষ্যপুত্র" বা মানুষের পুত্র বলতে মানুষ বুঝানো হয়েছে। উপরন্তু বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর মানুষ নন এবং মনুষ্যপুত্রও নন। দেখুন গণনা পুস্তক ২৩/১৯।

১১/১৯, ১৩/৫৭, ১৫/২৪, ১৭/১২, ২২, ১৯/১৬, ২১/১১, ৪৬, ২৩/৮, ১০, ২৬/১৮; মার্ক ৯/৩৭, ৩৮, ১০/৩৫; লূক ৪/৪৩, ৫/৫, ৭/১৬, ৩৯, ৪০, ৮/২৪, ৪৫, ৯/৩৩, ৩৮, ৫৬, ১০/১৬, ১২/১৩, ১৩/৩৩, ৩৪, ১৭/১৩, ২৩/৪৭, ২৪/১৯; যোহন ১/৩৮, ৪/১৯, ৩১, ৩৪, ৫/২৩, ২৪, ৩৬, ৩৭, ৬/১৪, ২৫, ৭/১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ৫২, ৮/১৬, ১৮, ২৬, ২৮, ২৯, ৪০, ৪২, ৯/১১, ১৫, ১৭, ১১/৪২, ১২/৪৪, ৪৯, ৫০, ১৩/১৩, ১৪, ১৪/২৪, ১৭/৩, ৮, ১৮, ২৫, ২০/১৬, ২১।

এখানে সামান্য কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি। মথি ১০/৪০: "যে তোমাদিগকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন তাকে (আমার প্রেরণকর্তাকে) গ্রহণ করে (he that receiveth me receiveth him that sent me)।"

মথি ১৫/২৪: "তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারো নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই (I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel)।"

মথি ২১/১১: "তাহাতে লোকসমূহ কহিল, উনি সেই ভাববাদী, গালীলের নাসরাতীয় যীশু।"

মথি ২৩/৮ ও ১০: "তোমাদের গুরু (আচার্য) একজন তিনি খৃস্ট (one is your Master, even Christ)।"

লূক ৪/৪৩: "কিন্তু তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, অন্য অন্য নগরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে হইবে; কেননা সেই জন্যই আমি প্রেরিত হইয়াছি।"

লূক ৭/১৬: "তখন সকলে ভয়গ্রস্ত হইল, এবং ঈশ্বরের গৌরব করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমাদের মধ্যে একজন মহান ভাববাদীর (a great prophet) উদয় হইয়াছে, আর 'ঈশ্বর আপন প্রজাদের তত্ত্বাবধান করিয়াছেন।"

লূক ১০/১৬: " যে তোমাদিগকে মানে, সে আমাকেই মানে, এবং যে তোমাদিগকে অগ্রাহ্য করে, সে আমাকেই অগ্রাহ্য করে, আর যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, সে তাঁহাকেই অগ্রাহ্য করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

যোহন ৫/৩৬, ৩৭: "(৩৬) ... যে সকল কার্য আমি করিতেছি, সেই সকল আমার বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছে যে, পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। (৩৭) আর পিতা যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন; তাঁহার রব তোমরা কখনও শুন নাই, তাহার আকারও দেখ নাই।"

যোহন ৬/১৪ শ্লোকে যীশুর অল্প খাদ্য দিয়ে অনেক মানুষকে খাওয়ানোর অলৌকিক চিহ্নের কথা উল্লেখের পরে বলা হয়েছে: "অতএব সেই লোকের তাঁহার কৃত চিহ্ন-কার্য দেখিয়া বলিতে লাগিল, উনি সত্যই সেই ভাববাদী যিনি জগতে আসিতেছেন (This

is of a truth that prophet that should come into the world)।"

যোহন ৭/১৫-১৭: "(১৫) তাহাতে যিহূদীরা আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি শিক্ষা না করিয়া কি প্রকারে শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া উঠিল? (১৬) যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন, আমার উপদেশ আমার নহে, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাহার। (১৭) যদি কেহ তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে ইচ্ছা করে, সে এই উপদেশের বিষয়ে জানিতে পারিবে, ইহা ঈশ্বর ইহতে হইয়াছে, না আমি আপনা হইতে বলি।"

যোহন ৮/১৮, ২৬, ২৯, ৪০, ৪২: "(১৮) আর পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। (২৬) যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি সত্য, এবং আমি তাঁহার নিকটে যাহা যাহা শুনিয়াছি, তাহাই জগৎকে বলিতেছি। (২৯) আর যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তিনি আমাকে একা ছাড়িয়া দেন নাই...। (৪০) কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সত্য শুনিয়া তোমাদিগকে জানাইয়াছি যে, আমি, আমাকেই বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ...। (৪২) আমি তো আপনা হইতে আসি নাই, কিন্তু তিনিই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

যোহন ৯/১০, ১১, ১৭ শ্লোকে জন্মান্ধকে চক্ষু দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "তখন তাহারা তাহাকে (জন্মান্ধকে) বলিল, তবে কি প্রকারে

তোমার চক্ষু খুলিয়া গেল? (১১) সে উত্তর করিল, যীশু নামের একজন মানুষ (A man that is called Jesus)[122] কাদা করিয়া আমার চক্ষুতে লেপন করিলেন...। (১৭) পরে তাহারা পুনরায় সেই অন্ধকে কহিল, তুমি তাহার বিষয়ে কি বল? কারণ সে তোমারই চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে। সে কহিল তিনি ভাববাদী।"

যোহন ১৩/১৩: "তোমরা আমাকে গুরু ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাক; আর তাহা ভালই বল, কেননা আমি সেই।"

যোহন ১৪/২৪: "আর তোমরা যে বাক্য শুনিতে পাইতেছ, তাহা আমার নয়, কিন্তু পিতার, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

এ সকল বক্তব্যে এবং অনুরূপ অগণিত বক্তব্যে যীশু অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন যে, তিনি একজন মানুষ, শিক্ষাদাতা গুরু, একজন ভাববাদী ও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত (রাসূল), তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বাণী, কথা বা প্রত্যাদেশ বিশ্বস্ততার সাথে শিষ্যদেরকে শিক্ষা দেন, কোনো কিছু গোপন করেন না, তিনি যেভাবে আল্লাহর নিকট থেকে শুনেন সেভাবেই তা শিষ্যদেরকে শিক্ষা দেন এবং আল্লাহ তাঁর হাতে যে সকল অলৌকিক চিহ্ন-কার্য সম্পন্ন করান তা সবই একজন মানুষ ও প্রেরিত নবী বা ভাববাদী

122 কেরির বাংলা বাইবেলে: যীশু নামের সেই ব্যক্তি।

হিসেবে, তিনি এগুলি ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রকৃত পুত্র হিসেবে এ সকল চিহ্ন-কার্য করেন নি।

সপ্তম বাক্য: মথি ২৬/৩৬-৪৬: "(৩৬) তখন যীশু তাঁহাদের সহিত গেৎশিমানী নামক এক স্থানে গেলেন, আর আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি যতক্ষণ ঐখানে গিয়া প্রার্থনা করি, ততক্ষণ তোমরা এইখানে বসিয়া থাক। (৩৭) পরে তিনি পিতরকে এবং সিবদিয়ের দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, আর দুঃখার্ত ও ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। (৩৮) তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্যনত দুঃখার্ত হইয়াছে; তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জাগিয়া থাক। (৩৯) পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া (fell on his face: সাজদা করিয়া) প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক। (৪০) পরে তিনি সেই শিষ্যদের নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আর তিনি পিতরেক কহিলেন, এ কি? এক ঘন্টাও কি আমার সঙ্গে জাগিয়া থাকিতে তোমাদের শক্তি হইল না? (৪১) জাগিয়া থাক, ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু মাংস দুর্বল। (৪২) পুনরায় তিনি দ্বিতীয় বার গিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, হে আমার পিতঃ আমি পান না করিলে যদি ইহা দূরে যাইতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছা

সিদ্ধ হউক। (৪৩) পরে তিনি আবার আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, কেননা তাঁহাদের চক্ষু ভারী হইয়া পড়িয়াছিল। (৪৪) আর তিনি পুনরায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়া তৃতীয় বার পূর্বমত কথা বলিয়া প্রার্থনা করিলেন। (৪৫) তখন তিনি শিষ্যদের কাছে আসিয়া কহিলেন, এখন তোমরা নিদ্রা যাও, বিশ্রাম কর, দেখ, সময় উপস্থিত, মনুষ্যপুত্র পাপীদের হস্তে সমর্পিত হন। (৪৬) উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে সমর্পন করিতেছে, সে নিকটে আসিয়াছে।"

এ বিষয়টি লূকলিখিত সুসমাচারের ২২/৩৯-৪৬ শ্লোকে আলোচনা করা হয়েছে। উপরের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত যীশুর অবস্থা ও কথাবার্তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি ঈশ্বর ছিলেন না, বরং ঈশ্বরের দাস ও মানুষ ছিলেন। ঈশ্বর কি কখনো দুঃখার্ত, বেদনার্ত ও আকুল হতে পারেন? ঈশ্বর কি মৃত্যু বরণ করেন এবং অন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন? ঈশ্বর কি অন্য ঈশ্বরের কাছে এভাবে আকুল আবেগ ও কাতরতা নিয়ে প্রার্থনা করেন? কখনোই নয়।[123]

---

[123] খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে যীশু ঈশ্বর ছিলেন, তাঁর রক্ত দিয়ে বিশ্ববাসীকে নরক থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই তিনি দেহ গ্রহণ করে এই বিশ্বে এসেছিলেন। তাহলে এই দুঃখ, বেদনা ও আহাজারির অর্থ কী? আর সম্ভব হলে এই পানপাত্র দূরীভুত করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনারই বা অর্থ কী?!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ:
যীশুর ঈশ্বরত্বের প্রমাণাদির অসারতা

সুসমাচারগুলির কিছু বক্তব্যকে, বিশেষত যোহনলিখিত সুসমাচারের কিছু বক্তব্যকে খৃস্টান ধর্মগুরুগণ যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন।[124] এ পরিচ্ছেদে আমরা তাদের এ সকল প্রমাণগুলি উল্লেখ করে তার অসারতা প্রমাণ করব।

প্রথম প্রমাণ: যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে খৃস্টান ধর্মগুরুগণের পেশকৃত প্রথম প্রমাণ, বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে যীশুর ক্ষেত্রে 'ঈশ্বরের পুত্র' (Son of God) কথাটির প্রয়োগ।

দুটি কারণে এ প্রমাণটি বাতিল:

---

[124] যীশু তার স্বর্গারোহণ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কখনোই তার ঈশ্বরত্বের কথা দ্ব্যর্থহীন সন্দেহমুক্তভাবে উল্লেখ করেন নি। তিনি এমন কিছুই বলেন নি যা থেকে তার ঈশ্বরত্বের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে জানা যায়। এ বিষয়ে খৃস্টানগণ যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করেন তা মূলত যোহনের লেখা থেকে গৃহীত দ্ব্যর্থবোধক অস্পষ্ট কিছু কথা। সকল খৃস্টান গবেষক একমত যে, যোহনের বাক্যাবলি রূপকতায় পরিপূর্ণ। ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই এমন অনুচ্ছেদ তার পুস্তকে কমই পাওয়া যায়। এছাড়া সুসমাচারগুলি থেকে দেখা যায় যে, খৃস্টের কথার মধ্যে অনেক অস্পষ্টতা থাকত, যে কারণে তার সমসাময়িক মানুষেরা এবং তার নিকটতম শিষ্যরাও অনেক সময় তিনি বুঝিয়ে না দিলে তার কথার মর্ম বুঝতে পারতেন না।

প্রথমত, 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটির বিপরীতে বাইবেলে বারংবার যীশুকে 'মনুষ্য পুত্র' (son of man) বলা হয়েছে। এছাড়া তাকে বারংবার 'দাঊদের পুত্র' বা 'দাউদ সন্তান' (son of David) বলেও অভিহিত করা হয়েছে। যীশুকে মানুষের পুত্র বা মানুষের সন্তান বলে আখ্যায়িত করার বিষয়ে নমুনা স্বরূপ পাঠক মথির সুসমাচারের নিম্নের শ্লোকগুলি দেখতে পারেন: ৮/২০, ৯/৬, ১৬/১৩, ২৭, ১৭/৯, ১২, ২২, ১৮/১১, ১৯/২৮, ২০/১৮, ২৮, ২৪/২৭, ২৬/২৪, ৪৫, ৬৪। আর যীশুকে দায়ূদের পুত্র বলার বিষয়ে পাঠক নমুনা হিসেবে নিম্নের শ্লোকগুলি দেখতে পারেন: মথি ১/১, ৯/২৭, ১২/২৩, ১৫/২২, ২০/৩০, ৩১, ২১/৯, ১৫ ২২/৪২; মার্ক ১০/৪৭, ৪৮; লূক ১৮/৩৮, ৩৯।

এছাড়া মথির ১/১-১৭ ও লূকের ৩/২৩-৩৪ শ্লোকে যীশুর বংশতালিকা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে তাকে দায়ূদের বংশধর ও দায়ূদের মাধ্যমে ইয়াকূব, ইসহাক ও ইব্রাহীমের বংশধর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল ভাববাদী সকলেই আদম সন্তান বা মানব সন্তান ও মানুষ ছিলেন। তাঁদের বংশধর যীশু নিঃসন্দেহে মানব সন্তান ছিলেন। আর এজন্যই তাঁকে বারংবার "মানুষের পুত্র (son of man) বলা হয়েছে। আর মানুষের পুত্র তো মানুষই হবেন, তিনি

ঈশ্বর হতে পারেন না বা আক্ষরিক অর্থে ঈশ্বরের পুত্র হতে পারেন না।[125]

---

[125] বাইবেলে, বিশেষ করে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলিতে বারংবার "মনুষ্যপুত্র" বা মানুষের পুত্র বলতে মানুষ বুঝানো হয়েছে। পুরাতন নিয়মে মনুষ্যপুত্র শতাধিক স্থানে "মনুষ্যপুত্র" বা "মানুষের ব্যাটা" (Son of man) পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। সর্বত্র একমাত্র উদ্দেশ্য "মরণশীল মানুষ" বুঝানো। নবী বা ভাববাদীকে বিশেষভাবে "মানুষের পুত্র বা মানব সন্তান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে একই উদ্দেশ্যে যেন কেউ অলৌকিক কার্যাদি দেখে তাদেরকে ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ত মনে না করে। নমুনা হিসেবে পাঠক নিম্নের শ্লোকগুলি দেখতে পারেন: গণনা পুস্তক ২৩/১৯; ইয়োব ২৫/৬, ৩৫/৮; গীতসংহিতা ৮/৪, ৮০/১৭, ১৪৪/৩, ১৪৬/৩; যিশাইয় ৫১/১২, ৫৬/২; যিরমিয় ৪৯/১৮, ৪৯/৩৩, ৫০/৪০, ৫১/৪৩; যিহিষ্কেল ২/১, ৩, ৬, ৮, ৩/১, ৩, ৪, ১০, ১৭, ২৫, ৪/১, ১৬, ৫/১, ৬/২, ৭/২, ৮/৫, ৬, ৮, ১২, ১৫, ১৭, ১১/২, ৪, ১৫, ১২/২, ৩, ৯, ১৮, ২২, ২৭, ১৩/২, ১৭, ১৪/৩, ১৩, ১৫/২, ১৬/২, ১৭/২, ২০/৩, ৪, ৭, ৪৬, ২১/২, ৬, ৯, ১২, ১৪, ১৯, ২৮, ২২/২, ১৮, ২৪, ২৩/২, ৩৬, ২৪/২, ১৬, ২৫, ২৫/২, ২৬/২, ২৭/২, ২৮/২, ১২, ২১, ২৯/২, ১৮, ৩০/২, ২১, ৩১/২, ৩২/২, ১৮, ৩৩/২, ৭, ১০, ১২, ২৪, ৩০, ৩৪/২, ৩৫/২, ৩৬/১, ১৭, ৩৭/৩, ৯, ১১, ১৬, ৩৮/২, ১৪, ৩৯/১, ১৭, ৪০/৪, ৪৩/৭, ১০, ১৮, ৪৪/৫, ৪৭/৬, ১৩, দানিয়েল ৮/১৭। এগুলি পাঠ করলে পাঠক সন্দেহাতীতভাবে সুনিশ্চিত হবেন যে, বাইবেলের পরিভাষায় মানুষ্যপুত্র অর্থ মানুষের ব্যাটা মানুষ মাত্র।

এর পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে বারংবার বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর কখনোই মনুষ্যপুত্র নন, এবং কোনো মনুষ্যপুত্র কখনো ঈশ্বর হতে পারে না। নিম্নের কয়েকটি

অনুচ্ছেদ দেখুন: গণনা পুস্তক ২৩/১৯: "God is not a man, that he should lie; neither the son of man, that he should repent: ঈশ্বর মনুষ্য নহেন যে, মিথ্যা বলিবেন; তিনি মনুষ্যপুত্র (কেরির বঙ্গানুবাদে: মনুষ্য-সন্তান) নহেন যে অনুশোচনা করিবেন।"

ইয়োব ২৫/৬: (How much less man, that is a worm? and the son of man, which is a worm?) মানুষের মূল্য কত কম, যা একটি কীটের তুল্য? মনূষ্যপুত্রের মূল্য কত কম, যা একটি কীটের তুল্য (কেরির বঙ্গানুবাদে: তবে কীটসদৃশ মত্ত্য কি? কৃমিসদৃশ মনুষ্য-সন্তান কি?)

গীতসংহিতা ১৪৬/২-৫ শ্লোকে রাজা-বাদশা ও মনুষ্যপুত্রের উপর নির্ভর না করে একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করতে ও তারই কাছে সাহায্য চাইতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বলা হয়েছে: (Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help. His breath goeth forth, he returneth to his earth; in that very day his thoughts perish. Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the LORD his God) "(৩) তোমরা নির্ভর করিও না রাজন্যগণে, বা মনুষ্যপুত্রে (কেরির অনুবাদে: মানুষ্য-সন্তানে), যাহার নিকট ত্রাণ নাই। (৪) তাহার স্বাস নির্গত হয়, সে নিজ মৃত্তিকায় প্রতিগমন করে; সেই দিনেই তাহার সঙ্কল্প সকল নষ্ট হইবে। (৫) ধন্য সেই, যাহার সহায় যাকোবের ঈশ্বর, যাহার আশাভূমি সদাপ্রভু, তাহার ঈশ্বর।"

যিশাইয় ৫১/১২-১৩ তেও একই কথা বলা হয়েছে: "(I, even I, am he that comforteth you: who art thou, that thou shouldest be afraid of a man that shall die, and of the son of man which shall be made as grass; And forgettest the LORD thy maker) আমি, আমিই তোমাদের সান্তনাকর্তা। তুমি কি যে, মানুষকে (মর্তকে) ভয় করিতেছ, সে ত মরিয়া যাইবে; এবং মনুষ্যপুত্রকে (মনুষ্য-সন্তানকে) ভয় করিতেছ, সে ত তৃণের ন্যায়

দ্বিতীয়ত, 'ঈশ্বরের পুত্র' (son of God) কথাটির মধ্যে 'পুত্র' শব্দটি কখনোই তার প্রকৃত ও আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। কারণ সকল জ্ঞানী একমত যে, আভিধানিক ও প্রকৃত অর্থে পুত্র বলতে বুঝানো হয় পিতামাতা উভয়ের দৈহিক জৈবিক মিশ্রণের মাধ্যমে যার জন্ম। এ অর্থ 'ঈশ্বরের পুত্র' (son of God)-এর ক্ষেত্রে কোনোভাবেই প্রযোজ্য হতে পারে না। কাজেই এক্ষেত্রে এমন একটি রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হবে যা খৃস্টের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যতাপূর্ণ। আর ইঞ্জিল বা নতুন নিয়মের ব্যবহার থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটি যীশুর ক্ষেত্রে 'ধার্মিক' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এর প্রমাণ, মার্কলিখিত সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোকে যীশুর ক্রুসবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে: "আর যে শতপতি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি যখন দেখিলেন যে, যীশু এই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিলেন, তখন কহিলেন,

---

হইয়া পড়িবে; আর তোমার নির্মাতা সদাপ্রভুকে ভুলিয়া গিয়াছ?..." এভাবে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মনুষ্যপুত্র অসহায়, তার নিকট কোনো ত্রাণ নেই, তার কাছে কিছু আশা করা যাবে না, সে মরণশীল, সে তৃণের ন্যায়, সে কীটের ন্যায়। এরপরও কি আমরা মনে করব যে, বাইবেলের পরিভাষায় মনুষ্যপুত্র বলতে মানুষ ছাড়া অন্য কোনো কিছু বুঝানো হতে পারে?

সত্যই এ মানুষটি (ইনি) ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন (Truly this man was the Son of God)।”

একই ঘটনায় উক্ত শতপতির উপর্যুক্ত বক্তব্য লূক তার সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে উদ্ধৃত করেছেন। লূকের ভাষা: “যাহা ঘটিল, তাহা দেখিয়া শতপতি ঈশ্বরের গৌরব করিয়া কহিলেন, সত্য, এই ব্যক্তি ধার্মিক ছিলেন (Certainly this was a righteous man)।”

এভাবে আমরা দেখছি যে, মার্ক যেখানে ‘ঈশ্বরের পুত্র’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেখানে লূক ‘ঈশ্বরের পুত্র’-র পরিবর্তে ‘ধার্মিক’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ থেকে সুনিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, যীশু ও যীশুর যুগের মানুষদের ভাষায় ‘ঈশ্বরের পুত্র’ কথাটির অর্থ ছিল “ধার্মিক মানুষ (righteous man)”।

আমরা দেখেছি যে, যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণের জন্য খৃস্টান ধর্মগুরুগণ সুসামাচরগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করেছেন, যে কারণে সুসমাচারগুলির মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে এবং এগুলি নির্ভরযোগ্যতা হারিয়েছে। তারপরও খৃস্টানগণের দাবিমত এগুলি বিশুদ্ধ এবং তাঁদের দাবিমতই একথা প্রমাণিত হলো যে, সুসমাচারের পরিভাষায় ঈশ্বরের পুত্র অর্থ ধার্মিক মানুষ (righteous man)। বিশেষত মার্ক ও লূক উভয়ের বর্ণনাতেই শতপতি যীশুকে মানুষ (man) বলে উল্লেখ করেছেন।

সুসমাচারগুলির বিভিন্ন স্থানে যীশু ছাড়া অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, যেমনভাবে 'পাপী'র ক্ষেত্রে 'দিয়াবলের পুত্র' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

মথিলিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ে রয়েছে: "৯ ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।... ৪৪ কিনতু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও; ৪৫ যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সনতান হও...।"

এখানে যীশু যারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন ও মানুষদের মধ্যে মিল করে দেন তাদেরকে এবং যারা এভাবে শত্রুমিত্র সকলকেই ভালবাসেন তাদেরকে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে অভিহিত করেছেন এবং 'ঈশ্বর'-কে তাদের পিতা বলে উল্লেখ করেছেন।

যোহনলিখিত সুসমাচারের ৮ম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়াহূদীগণ ও খৃস্টের মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন হয়: "(৪১) তোমাদের পিতার কার্য তোমরা করিতেছ। তাহারা তাঁহাকে কহিল, আমরা ব্যভিচারজাত নহি; আমাদের একমাত্র পিতা আছেন, তিনি ঈশ্বর। (৪২) যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হইতেন, তবে তোমরা আমাকে প্রেম করিতে ... (৪৪) তোমরা তোমাদের পিতা দিয়াবলের, এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল

পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা; ... কেননা সে মিথ্যাবাদী ও তাহার (মিথ্যাবাদীর) পিতা।"

এখানে আমরা দেখছি যে, ইয়াহূদীগণ দাবি করেন যে, তারা ঈশ্বরের পুত্র, একমাত্র একজনই তাদের পিতা, তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। যীশু তাদেরকে বললেন, না, বরং তোমাদের পিতা দিয়াবল বা শয়তান। কারণ তারা মিথ্যাবাদী ও শয়তানের অনুগত। শয়তান মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যাবাদীগণের পিতা। এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ অথবা দিয়াবল তাদের প্রকৃত পিতা নয়। পুত্র শব্দটি এখানে শাব্দিক বা প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কাজেই রূপক অর্থ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। ইয়াহূদীদের বক্তব্যের অর্থ হলো, আমরা ধার্মিক ও ঈশ্বরের আদেশ পালন কারী। আর যীশুর কথার অর্থ হলো, তোমরা ধার্মিক ও ঈশ্বরের আদেশ পালনকারী নও, বরং তোমরা অধার্মিক ও দিয়াবলের আদেশ পালনকারী।

সুসমাচারের আরো অনেক স্থানে পিতা বা পুত্র শব্দের এরূপ ব্যাখ্য ছাড়া গত্যন্তর নেই। যোহনের প্রথম পত্রের ৩ অধ্যায়ে রয়েছে: "(৮) যে পাপাচরণ করে সে দিয়াবলের; কেননা দিয়াবল আদি হইতে পাপ করিতেছে।... (৯) যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপাচরণ করে না, কারণ তাঁহার বীর্য তাহার অনতরে থাকে; এবং সে পাপ করিতে পারে না, কারণ সে ঈশ্বর হইতে জাত। (১০) ইহাতে ঈশ্বরের সনতানগণ এবং দিয়াবলের সনতানগণ প্রকাশ

হইয়া পড়ে (the children of God are manifest, and the children of the devil)।"

উক্ত পত্রের ৪ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে বলা হয়েছে: "যে কেহ প্রেম করে, সে ঈশ্বর হইতে জাত (born of God) ও ঈশ্বরকে জানে"।

উক্ত পত্রের ৫ অধ্যায়ে রয়েছে: "(১) যে কেহ বিশ্বাস করে যে, যীশুই সেই খ্রীষ্ট, সে ঈশ্বর হইতে জাত (born of God); এবং যে কেহ জন্মদাতাকে প্রেম করে; সে তাঁহা হইতে জাত ব্যক্তিকেও প্রেম করে (every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him) (২) ইহাতে আমরা জানিতে পারি যে, ঈশ্বরের সনতানগণকে প্রেম করি, যখন ঈশ্বরকে প্রেম করি ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি।"

রোমীয় ৮ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে বলা হয়েছে: "কেননা যত লোক ঈশ্বরের আজ্ঞা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র।"

ফিলিপীয় ২/১৪-১৫: "(১৪) তোমরা বচসা ও তর্কবিতর্ক বিনা সমস্ত কার্য কর, (১৫) যেন তোমরা অনিন্দনীয় ও অমায়িক হও, এই কালের সেই কুটিল ও বিপথগামী লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও।"

উপরের উদ্ধৃতিগুলি সুস্পষ্টরূপে আমাদের দাবি প্রমাণ করে। এ সকল শ্লোকে যাদেরকে "ঈশ্বরের পুত্র" ও "ঈশ্বরের জাত" বলা হয়েছে তারা কেউই আক্ষরিক অর্থে "ঈশ্বরের জাত" বা "ঈশ্বরের

পুত্র” নন; বরং উপরে উল্লেখিত রূপক অর্থে তাদেরকে “ঈশ্বরের পুত্র” বলা হয়েছে।

এছাড়া আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকগুলিতে ‘পিতা’ ও ‘পুত্র’ শব্দদ্বয়কে অসংখ্য অগণিত স্থানে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি উদ্ধৃতি প্রদান করছি।

(১) লূক তার সুসমাচারের ৩ অধ্যায়ে খৃস্টের বংশাবলি বর্ণনা করতে যেয়ে ৩৮ শ্লোকে বলেছেন: আদম ঈশ্বরের পুত্র।

(২) যাত্রাপুস্তক ৪ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বর সদাপ্রভু মোশিকে নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করেন: “২২ আর তুমি ফরৌণকে কহিবে, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, ইস্রায়েল আমার পুত্র, আমার প্রথমজাত (my son, even my firstborn)। ২৩ আর আমি তোমাকে বলিয়াছি, আমার সেবা করণার্থে আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দেও; কিনতু তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইলে; দেখ, আমি তোমার পুত্রকে, তোমার প্রথমজাতকে, বধ করিব।”

এখানে দুই স্থানে ‘ইস্রায়েল’-কে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে, উপরন্তু তাকে প্রথমজাত পুত্র অর্থাৎ বড় ছেলে বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(৩) গীতসংহিতার ৮৯ গীতে দায়ূদ সদাপ্রভু ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বলেছেন: “(২০) আমার দাস দায়ূদকেই পাইয়াছি, আমার

পবিত্র তৈলে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়াছি (with my holy oil have I anointed him)।... (২৬) সে আমাকে ডাকিয়া বলিবে, তুমি আমার পিতা, আমার ঈশ্বর (Thou art my father, my God)...। (২৭) আবার আমি তাহাকে প্রথমজাত করিব ...।"

এখানে দায়ূদকে অভিষিক্ত অর্থাৎ মসীহ (The Messiah) বা খৃস্ট (The Christ, The Anointed) ও ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র (firstborn) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(৪) যিরমিয় ৩১/৯-এ ঈশ্বরের নিম্নোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করা হয়েছে: "যেহেতু আমি ইস্রায়েলের পিতা, এবং ইফ্রয়িম আমার প্রথমজাত পুত্র।"

(৫) ২ শমূয়েল ৭ অধ্যায়ে শলোমনের বিষয়ে ঈশ্বরের নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে: "আমি তাহার পিতা হইব, ও সে আমার পুত্র হইবে"।

যদি যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলায় তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়, তাহলে আদম, ইস্রায়েল, ইফ্রয়িম দায়ূদ ও সুলাইমান ঈশ্বরত্বের বেশি অধিকারী বলে প্রমাণিত হবে; কারণ তাঁরা যীশুর পূর্বেই এ পদ লাভ করেছেন, তাঁরা তাঁর পূর্বপুরুষ এবং বিশেষত ইস্রায়েল, ইফ্রয়িম ও দায়ূদকে 'ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র' বলা হয়েছে। আর আবরাহাম, মোশি ও অন্যান্য পূর্ববর্তী ভাববাদীদের ব্যবস্থা অনুসারে প্রথমজাত

পুত্রই সম্মান-মর্যাদার সর্বাধিক অধিকার ভোগ করেন। সাধারণভাবে সকল মানুষের মধ্যেই এর প্রচলন রয়েছে।[126]

[126] এখানে খৃস্টানগণ বলতে পারেন যে, যীশুকে নতুন নিয়মের কোথাও কোথাও 'ঈশ্বরের একজাত পুত্র বা 'ঈশ্বরের জন্মদেওয়া একমাত্র পুত্র' (only begotten son)' বলে উল্লেখ করেছেন। এতে তার বিশেষত্ব বুঝা যায়। তাদের এ দাবি বাইবেলের আলোকে বাতিল বলে প্রমাণিত। এক্ষেত্রে 'একজাত' বা 'একমাত্র জন্মদেওয়া' শব্দটি কখনোই তার প্রকৃত অর্থে গৃহীত হতে পারে না। কারণ ঈশ্বর নিজেই এ 'একমাত্র জন্মদেওয়া পুত্রের' আরো অনেক ভাইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে তিনজনতে 'প্রথমজাত' বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই 'পুত্র' বা 'প্রথমজাত' শব্দের ন্যায় 'একজাত' শব্দেরও রূপক অর্থ গ্রহণ করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। ইস্রায়েল, ইফ্রমিয় ও দায়ূদ-এর ক্ষেত্রে ঈশ্বর স্বয়ং বলেছেন যে তাঁরা তাঁর প্রথমজাত। আর যীশুর ক্ষেত্রে ঈশ্বর নিজে এরূপ কিছু বলেছেন বলে প্রচলিত সুসমাচারগুলিতেও নেই। যীশুর অস্পষ্ট বক্তব্যের মধ্যে বা সুসমাচার লেখকদের কথার মধ্যে এরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়। সর্বোপরি (only begotten son) বা "একমাত্র জন্মদেওয়া পুত্র" কথাটিকে প্রকৃত ও আক্ষরিক অথ্যে গ্রহণ করলে বাইবেরের আলোকে তা মিথ্যা বলে গণ্য হবে। কারণ বাইবেলেই ঈশ্বর আরো অনেক পুত্র জন্ম দেওয়ার কথা বলেছেন। গীতসংহিতা ২/৭: "(the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee) সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি।" কাজেই ঈশ্বরের জন্মদেওয়া (begotten) পুত্র মাত্র একজন একথা বাইবেলের আলোকে মিথ্যা।

(৬) বাইবেলের অনেক স্থানে সকল ইস্রায়েল-সন্তানকে ‘‘ঈশ্বরের পুত্র’’ বা ‘‘ঈশ্বরের সন্তান’’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় বিবরণ ১৪/১, ৩২/১৯; যিশাইয় ১/২, ৩০/১, ৬৩/৮; হোশেয় ১/১০।

(৭) আদিপুস্তকের ৬ অধ্যায়ে রয়েছে: ‘‘(২) তখন ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাগণকে সুন্দরী দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা, সে তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল। (৪) তৎকালে পৃথিবীতে মহাবীরগণ ছিল, এবং তৎপরেও **ঈশ্বরের পুত্রেরা** মনুষ্যদের কন্যাদের নিকটে গমন করিলে তাহাদের গর্ভে সনতান জন্মিল, তাহারাই সেকালের প্রসিদ্ধ বীর।’’

এখানে আদম সন্তানদেরকে ‘ঈশ্বরের পুত্র’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৮) যিশাইয় ৬৩/১৬ ও ৬৪/৮ শ্লোকে ঈশ্বরকে ইস্রায়েল-সন্তানদের সকলের পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৯) ইয়োব ৩৮/৭: ‘‘তৎকালে প্রভাতীয় নক্ষত্রগণ একসঙ্গে আনন্দরব করিল, **ঈশ্বরের পুত্রগণ** সকলে জয়ধ্বনি করিল।’’

(১০) গীতসংহিতার ৬৮/৫: ‘‘ঈশ্বর আপন পবিত্র বাসস্থানে পিতৃহীনদের পিতা ও বিধবাদের বিচারকর্তা।’’

এখানে ঈশ্বরকে পিতৃহীনদের পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সকল স্থানে “ঈশ্বরের পুত্র” পরিভাষাকে অবশ্যই “রূপক” অর্থে ব্যবহার করতে হবে। কোনো একজন খৃস্টানও বলবেন না যে, এ সকল স্থানে ঈশ্বরের পুত্র বলতে বা ঈশ্বরকে পিতা বলতে প্রকৃত ও আক্ষরিক অর্থ বুঝানো হয়েছে। যেভাবে আদম, আদম-পুত্রগণ, ইস্রায়েল (ইয়াকুব), ইফ্রয়িম, দায়ূদ, সুলাইমান, সকল ইস্রায়েলীয় মানুষ এবং সকল এতিম-পিতৃহীন-কে ঈশ্বরের পুত্র বা অনুরূপ কিছু বলার কারণে ঈশ্বর, ঈশ্বরের সত্ত্বার অংশ বা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের পুত্র বলে কল্পনা করা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি যীশুখৃস্টের ক্ষেত্রেও তাকে ঈশ্বরের পুত্র বা অনুরূপ কিছু বলার কারণে তাকে ঈশ্বর, ঈশ্বরের সত্ত্বার অংশ বা প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের পুত্র বলে কল্পনা করা সম্ভব নয়। এরূপ কল্পনা বাইবেল, সকল ভাববাদীর শিক্ষা ও মানবীয় জ্ঞান-বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিক।

দ্বিতীয় প্রমাণ: যীশুর ঈশবরত্বের পক্ষে খৃস্টানগণের দ্বিতীয় প্রমাণ, নতুন নিয়মের কিছু শ্লোকে যীশুকে এ জগতের নন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যোহন ৮/২৩: “তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা অধঃস্থানের, আমি ঊর্ধ্বস্থানের (Ye are from beneath; I am from above); তোমরা এ জগতের, আমি এ জগতের নহি।”

খৃস্টানগণ ধারণা করেন যে, এখানে যীশু তাঁর ঈশ্বরত্বের প্রতি “ইঙ্গিত” করেছেন এবং বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি পিতা ঈশ্বরের

নিকট থেকে আগমন করেছেন এবং তিনি এ জগতের নন। তিনি মানুষরূপী হলেও মানুষ নন, বরং স্বর্গের বা ঊর্ধ্বজগতের ঈশ্বর।

তাদের এ ব্যাখ্যা মোটেও সঠিক নয়। কারণ যীশু বাহ্যত ও প্রকৃত অর্থে এ জগতেরই ছিলেন। তাদের ব্যাখ্যাটি দুই কারণে বাতিল:

প্রথমত, এ ব্যাখ্যা যুক্তি, জ্ঞান ও বিবেকের সাথে সাংঘর্ষিক। তেমনি ভাবে তা নতুন ও পুরাতন নিয়মের অগণিত বাক্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

দ্বিতীয়ত, যীশু তাঁর শিষ্যদের ক্ষেত্রেও এরূপ কথা বলেছেন। যোহনের সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছেন: "তোমরা যদি জগতের হইতে, তবে জগৎ আপনার নিজস্ব বলিয়া ভাল বাসিত; কিনতু তোমরা ত জগতের নহ, বরং আমি তোমাদিগকে জগতের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়াছি, এই জন্য জগৎ তোমাদিগকে দ্বেষ করে।"

যোহনের সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ে রয়েছে: "১৪ আমি তাহাদিগকে তোমার বাক্য দিয়াছি; আর জগৎ তাহাদিগকে দ্বেষ করিয়াছে, কারণ তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই। ... ১৬ তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই।"

এভাবে যীশু তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে বললেন যে, তাঁরা এ জগতের নন। উপরন্তু তিনি স্পষ্টভাবেই এ বিষয়ে তাঁদেরকে তাঁরই

মত একই পর্যায়ের বলে উল্লেখ করলেন। তিনি যেমন এ জগতের নন, তাঁর শিষ্যরাও ঠিক তেমনি এ জগতের নন। খৃস্টানদের দাবি অনুসারে, যদি এ জগতের না হওয়ার কারণে ঈশ্বরত প্রমাণিত হয়, তবে যীশুর শিষ্যগণ সকলেই ঈশ্বর ছিলেন বলে প্রমাণিত হবে। আর যেহেতু খৃস্টানগণ যীশুর শিষ্যদের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেন, সেহেতু তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, ঊর্ধ্বজগতের হওয়া, ঈশ্বরের নিকট থেকে আগমন করা বা এ জগতের না হওয়া অর্থের বাক্যাদি দিয়ে যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই।

যীশুর এ বাক্যের সঠিক অর্থ হলো, তোমরা পার্থিব জগতের লোভ লালসার অনুসারী ও জাগতিক স্বার্থান্বেষী আর আমি তদ্রুপ নই, বরং আমি ও আমার শিষ্যগণ ঊর্ধ্বজগতের বা স্বর্গের মর্যাদার অভিলাসী এবং ঈশ্বরের প্রেম অনুসন্ধানী। এরূপ রূপক ব্যবহার সকল ভাষাতেই বিদ্যমান। ধার্মিক ও সংসারবিমুখ মানুষদেরকে সকল দেশে এবং সকল ভাষাতেই বলা হয় 'এরা এ জগতের মানুষ না।'

তৃতীয় প্রমাণ: যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে খৃস্টানদের তৃতীয় দলিল, যীশু নিজেকে ঈশ্বরের সাথে এক বলে উল্লেখ করেছেন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে যীশুর নিম্নোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করা হয়েছে: "আমি ও পিতা, আমরা এক (I and my Father are one)।"

খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, এই বাক্য যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করে। দু কারণে তাঁদের এই দাবি বাতিল:

প্রথম কারণ: প্রকৃত অর্থে খৃস্ট এবং ঈশ্বর কখনোই এক হতে পারেন না। খৃস্টানদের বিশ্বাস অনুসারেও তিনি ও ঈশ্বর এক ছিলেন না। কারণ খৃস্টের একটি মানবীয় আত্মা ও দেহ ছিল, খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, এ দিক থেকে তিনি ঈশ্বর থেকে পৃথক ছিলেন। তাঁরা বলেন যে, 'আমি ও পিতা এক' কথাটি বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা যাবে না বরং এর ব্যাখ্যা করতে হবে। তাদের মতে এর ব্যাখ্যা হলো, ঈশ্বরত্বের দিক থেকে তিনি ও ঈশ্বর এক। মানুষ হিসেবে তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন। আবার ঈশ্বরত্বের দিক থেকে তিনি পরিপূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন। তার মধ্যে দুটি পৃথক সত্ত্বা বিদ্যমান ছিল। তার মধ্যকার পুত্র সত্ত্বার দিক তিনি ও পিতা এক ছিলেন।

তাঁদের এ ব্যাখ্যা অন্তসারশূন্য বাগাড়ম্বর মাত্র। কারণ খৃস্টের বাক্য হয় তার প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। অথবা যীশুর অন্যান্য বাক্য, অন্যান্য ঐশ্বরিক গ্রন্থের বাক্য এবং যুক্তি, বিবেক ও জ্ঞানের দাবির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাদের ব্যাখ্যাটি প্রকৃত ও বাহ্যিক অর্থের সাথে সাংঘর্ষিক, আবার জ্ঞান, যুক্তি এবং বাইবেলের অন্যান্য বাণীর সাথেও সাংঘর্ষিক।

দ্বিতীয় কারণ: এরূপ কথা যীশুর শিষ্যদের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ে রয়েছে যে, যীশু তাঁর

শিষ্যদের বিষয়ে বলেন: "২১ যেন তাহারা সকলে এক হয় (they all may be one); ২১ পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদের মধ্যে (এক)[127] থাকে (that they also may be one in us); যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। ২২ আর তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি; যেন তাহারা এক হয়, যেমন আমরা এক (that they may be one, even as we are one); ২৩ আমি তাহাদের মধ্যে ও তুমি আমাতে, যেন তাহারা একের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে[128] (I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one)।"

এখানে যীশু বলেছেন: "যেন তাহারা সকলে এক হয়", "যেন তাহারা এক হয় যেমন আমরা এক" এবং "যেন তাহারা একের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে"। এ বাক্যগুলি থেকে বুঝা যায় যে, তাঁরা সকলে এক ছিলেন। দ্বিতীয় বাক্যে যীশু উল্লেখ করেছেন যে, 'ঈশ্বরের সাথে তাঁর একত্ব' যেরূপ 'তাদের মধ্যকার একত্ব'-ও ঠিক তদ্রূপ।

---

[127] (এক) শব্দটি বাংলা বাইবেলে উল্লেখ করা হয় নি, তবে ইংরেজিতে রয়েছে।

[128] বাংলা বাইবেলের ভাষ্য: যেন তাহারা সিদ্ধ হইয়া এক হয়।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, যীশুর প্রেরিতগণ প্রকৃত অর্থে ‘একসত্ত্বা’ ছিলেন না, ঠিক তেমনি যীশুও প্রকৃত অর্থে ‘ঈশ্বরের’ সাথে ‘একসত্ত্বা’ ছিলেন না।

বস্তুত, ‘ঈশ্বরের সাথে এক’ হওয়ার অর্থ হলো, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নির্দেশের সাথে নিজের ইচ্ছা ও কর্ম এক করে দেওয়া। তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা ও ধার্মিক জীবন যাপন করা। এই ঐক্যের মূল পর্যায়ে খৃস্ট, প্রেরিতগণ ও সকল বিশ্বাসী সমান। পার্থক্য হলো ঐক্যের শক্তি ও দুর্বলতায়। ঈশ্বরের সাথে এরূপ ঐক্যে খৃস্ট অন্যদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও তাঁর ঐক্য পূর্ণতর।

তাহলে এ সকল বক্তব্যে ‘একত্ব’, ঐক্য বা এক হওয়ার অর্থ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে নিজের ইচ্ছাকে এক করে দেওয়া, তার আনুগত্যে ও সেবায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া। একত্ব অর্থ সকলে সত্ত্বা এক হয়ে যাওয়া নয়। প্রেরিত ও শিষ্যগণের এক হওয়ার অর্থ তাদের সকলের সত্ত্বা এক হওয়া নয়। অনুরূপভাবে যীশু ও ঈশ্বরের এক হওয়ার অর্থ উভয়ের সত্ত্বা এক হওয়া নয়।

চতুর্থ প্রমাণ: যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে খৃস্টানদের চতুর্থ প্রমাণ যীশুকে দেখলেই ঈশ্বরকে দেখা হবে বলে যীশুর বক্তব্য। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ে রয়েছে: “(৯)...যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে; তুমি কেমন করিয়া বলিতেছ, পিতাকে আমাদের দেখাউন? (১০) তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি

পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন? আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলি, তাহা আপনা হইতে বলি না; কিনতু পিতা আমাতে থাকিয়া আপনার কার্য সকল সাধন করেন।”

খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, খৃস্টের এই কথাগুলি: “যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে (he that hath seen me hath seen the Father)”, “আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন (I am in the Father, and the Father in me)” এবং “পিতা আমাতে থাকিয়া (the Father that dwelleth in me) আপনার কার্য সকল সাধন করেন” এগুলি প্রমাণ করে যে, খৃস্ট ও ঈশ্বর একই সত্ত্বা ছিলেন বা ঈশ্বরের সত্ত্বা যীশুর সত্ত্বার মধ্যে অবতরণ ও অবস্থান করেছিল।

তাঁদের এই দাবি দুটি কারণে অগ্রহণযোগ্য।

প্রথমত, বাইবেলে প্রমাণ করে যে, এ পৃথিবীতে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। কাজেই যীশুর কথা তাদের মতেই প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এজন্য তাঁরা ব্যাখ্যা করেন যে, এখানে ঈশ্বরকে দেখা বলতে ঈশ্বরকে জানা বুঝানো হয়েছে। আর খৃস্টকে তার দৈহিকরূপে দেখলে বা তার দেহকে জানলে ঈশ্বরকে দেখা বা জানা হয় না। এ বক্তব্যের সঠিক অর্থ হলো, যে ব্যক্তি যীশুর কর্মকান্ড দেখবে সে যেন ঈশ্বরের কর্মই দেখল; কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা, আদেশ ও শক্তিতেই তিনি এ সকল কর্ম করেছেন।

দ্বিতীয়ত, যীশুর শিষ্যদের ক্ষেত্রেও এরূপ কথা বলা হয়েছে। উপর্যুক্ত যোহনলিখিত সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে যীশু বলেছেন: "সেই দিন তোমরা জানিবে যে, আমি আমার পিতাতে আছি, ও তোমরা আমাতে আছ, এবং আমি তোমাদের মধ্যে আছি।"

যোহন ১৭/২১ শ্লোকে যীশু তাঁর শিষ্যদের বিষয়ে বলেন: "পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে (that they also may be one in us)।"

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত ১ম পত্রের ৬/১৯ শ্লোকে[129] শ্লাকে সাধু পল বলেন: "অথবা তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অনতরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ? আর তোমরা নিজের নও।"

২ করিন্থীয় ৬/১৬: "আমরাই ত জীবনত ঈশ্বরের মন্দির, যেমন ঈশ্বর বলিয়াছেন, আমি তাহাদের মধ্যে বসতি করিব (I will dwell in them)।

ইফিষীয় ৪/৬: "সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি সকলের উপরে, সকলের নিকটে ও (তোমাদের) সকলের মধ্যে (in you all)[130] আছেন।"

---

[129] বাংলায় শেষ বাক্যটি ২০ শ্লোকের অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

[130] বাংলা বাইবেলে "সকলের অন্তরে"।

খৃস্টানদের ব্যাখ্যা অনুসারে এ বাক্যগুলি দ্বারা যীশুর শিষ্যদের ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়! কারণ একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যার মধ্যে কেউ অবস্থান করছেন তিনি যদি কোথাও অবস্থান করেন, তবে তার মধ্যের সত্ত্বাও তথায় অবস্থান করবেন। আর যীশু ও ঈশ্বর এক এবং যীশুর মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন। সেই যীশু ও শিষ্যগণ এক এবং শিষ্যগণের মধ্যে যীশু অবস্থান ও অবতরণ করেছেন। কাজেই শিষ্যদের মধ্যেও ঈশ্বর অবতরণ ও অবস্থান করছেন। কারো মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান করা যদি উক্ত ব্যক্তির সাথে ঈশ্বরের একত্ব (union) বা উক্ত ব্যক্তির ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করে, তবে বাইবেলের উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলি দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যীশুর প্রেরিত শিষ্যগণ সকলেই ঈশ্বর, বরং করিন্থের বাসিন্দাগণ সকলেই ঈশ্বর এবং ইফেসাস (Ephesus) অঞ্চলের সকল বাসিন্দাই ঈশ্বর! কোনো খৃস্টান কি তা মানবেন!

বস্তুত কারো মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থান, কারো সাথে ঈশ্বরের এক হওয়া, কারো মধ্যে যীশুর অবস্থান বা কারো সাথে যীশুর এক হওয়া ইত্যাদি দ্বারা আনুগত্য ও মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। যীশুকে জানা ও তার আনুগত্য করার অর্থ তাঁর প্রেরণকারী মহান আল্লাহকে জানা ও তাঁর আনুগত্য করা। কারণ তাঁর আদেশের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর আদেশ। অনুরূপভাবে শিষ্যদের আনুগত্য করার অর্থ তাঁদের প্রেরণকারী যীশুর আনুগত্য করা; কারণ তাঁদের নির্দেশের মধ্যেই

তাঁর নির্দেশ নিহিত। ঐক্য ও মধ্যে থাকার এ হলো সঠিক ব্যাখ্যা।[131]

---

[131] যদিও যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রচলিত খৃস্টধর্মের মূল ভিত্তি, কিন্তু বাইবেলের বক্তব্য দিয়ে তা সমর্থন করা খুবই কঠিন। কোথাও যীশু স্পষ্ট করে তা বলেন নি। তার বিপরীতে ঈশ্বরের একত্বের কথা ও তাঁর নিজের মানবত্বের কথা ও অ-ঈশ্বরত্বের কথা তিনি বারংবার বলেছেন। তারপরও তাঁরা বাইবেলের বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তাদের মূল দলীলগুলি উপরে আলোচিত হয়েছে। এগুলির পাশাপাশি অনেক সময় তারা যে সকল বিষয়কে যীশুর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে চেষ্টা করেন সেগুলির অন্যতম হলো: (১) যীশুর পিতা ব্যতিরেকে জন্ম ও (২) যীশু কর্তৃক অলৌকিক কার্যাদি, বিশেষত মৃতকে জীবিত করা। বাইবেলের আলোকে এ দুটি বিষয়ের একটিও ঈশ্বরত্বের প্রমাণ নয়। বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম পিতামাতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়া বাইবেলের উল্লেখ করা হয়েছে যে, অবরাহামের সমসাময়িক যাজক মল্কীষেদক (Melchisedec)-ও পিতামাতা ব্যতিরেকেই জন্ম গ্রহণ করেন। ইব্রীয় ৭/১-৩ শ্লোকে সাধু পল লিখেছেন: "সেই যে মল্কীষেদক... তাঁহার পিতা নাই, মাতা নাই, পূর্বপুরুষাবলি নাই, ... "। অলৌকিক কার্য বা মৃতকে জীবিত করাও যীশুর কোনো বিশেষত্ব নয়। যদি আমরা প্রচলিত সুসমাচারগুলির এ বিষয়ক বর্ণনাগুলি সঠিক বলে মেনে গ্রহণ করি, তবে তা থেকে প্রমাণিত হবে যে, যীশু মাত্র তিন ব্যক্তিকে জীবিত করেছিলেন। পক্ষান্তরে যিহিষ্কেল ভাববাদী হাজার হাজার মৃত মানুষকে জীবিত করেন (যিহিষ্কেল ৩৭/১-১৪)। কাজেই মৃতকে জীবিত করা যদি ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হয় তবে যিহিষ্কেল ভাববাদীই ঈশ্বর হওয়ার অধিকতর যোগ্যতা রাখেন। এছাড়া এলিয় (Elijah) একটি মৃত শিশুকে পুনর্জীবিত করেন (১ রাজাবলির

প্রিয় পাঠক, এখানে খৃস্টের ঈশ্বরত্বের পক্ষে পেশকৃত খৃস্টের বা প্রেরিতদের বাণীগুলি উল্লেখ করে সেগুলির প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করেছি খৃস্টান প্রচারকদের দাবির অসারতা নিশ্চিত করার জন্য। অন্যথায় আমাদের বিশ্বাস, নতুন নিয়মে উদ্ধৃত এ সকল বক্তব্য বা বাণী খৃস্টের বা তার প্রেরিতদের বলে প্রমাণিত নয়। প্রচলিত এ সকল পুস্তকের কোনোটিরই অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা সংরক্ষিত নেই। এছাড়া এসকল পুস্তকের মধ্যে সাধারণভাবে পরিবর্তন, পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে অগণিত বিকৃতি সাধিত হয়েছে। খৃস্টের ঈশ্বরত বা ত্রিত্বের বিষয়ে বিশেষভাবে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। এ সকল বিষয়ে বিকৃতি সাধন করা বা মিথ্যা বলা খৃস্টান পণ্ডিতদের একটি সুপরিচিত অভ্যাস।[132]

১৭/১৭-২৪)। ইলীশায় (Elisha) একজন মৃত বালককে পুনর্জীবিত করেন (২ রাজাবলির ৪/৮-৩৭)। এছাড়া ইলীশায় ভাববাদী কুষ্ঠরোগীকে তার কুষ্ঠরোগ থেকে আরোগ্য করেছিলেন (২ রাজাবলির ৫/১-১৪)। মূসা (আ)-এর অলৌকিক কার্যাদি প্রসিদ্ধ। অলৌকিক কার্য ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হলে এরা সকলেই ঈশ্বর বলে গণ্য হতেন।

[132] ঈশ্বরের গৌরব প্রমাণের জন্য পৌল মিথ্যা কথা বলতেন বলে নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: "For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner? কিনতু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?''

আমরা বিশ্বাস করি যে, নিঃসন্দেহে যীশু খৃস্ট এবং তাঁর প্রেরিতগণ এ সব কুফরী বা ঈশ্বর বিরোধী (blasphemous) বিশ্বাস থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র ছিলেন। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা (দাস) ও রাসূল (প্রেরিত ভাববাদী) এবং ঈসা (যীশু) আল্লাহর বান্দা (দাস) ও রাসূল (প্রেরিত ভাববাদী) এবং যীশুর প্রেরিতগণ আল্লাহ প্রেরিতের প্রেরিত।

(রোমান ৩/৭) এ থেকে জানা যায় যে, তিনি যে বিষয়কে 'ঈশ্বরের গৌরব' প্রকাশক বলে কল্পনা করেছেন, সে বিষয়ে ঈশ্বর, যীশু বা পবিত্র-আত্মার নামে বানোয়াট ও মিথ্যা কথা বলতে মোটেও দ্বিধা করতেন না। তাঁর অনুসারী খৃস্টান ধর্মগুরুগণও এ মূলনীতিতে বিশ্বাসী ও পালনকারী।

তৃতীয় অধ্যায়:
আল-কুরআন ও আল-হাদীস

আল-কুরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার প্রমাণ, তার অলৌকিকত্ব, কুরআনের বিষয়ে পাদরিগণের আপত্তির পর্যালোচনা, আল-হাদীসের বিশুদ্ধতার প্রমাণ ও এ বিষয়ে পাদরিগণের আপত্তির পর্যালোচনা

এ অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম পরিচ্ছেদ : আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব ও এ বিষয়ে পাদরিগণের আপত্তির পর্যালোচনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হাদীস বিষয়ে পাদরিগণের আপত্তির পর্যালোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ:
আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব

এ পরিচ্ছেদে আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব ও এ বিষয়ে পাদরিগণের আপত্তির পর্যালোচনা করা হবে। প্রথমে আমরা কুরআন কারীমের অলৌকিকত্বের বিভিন্ন দিক আলোচনা করব। এরপর এ বিষয়ে পাদরিগণের আপত্তিগুলির পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

৩. ১. ১. আল কুরআনের অলৌকিকত্ব

অগণিত বিষয় প্রমাণ করে যে, কুরআন কারীম সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর বাণী **(God's Word)**[133]**।** এবং তা একটি অলৌকিক

[133] মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে অনেক অলৌকিক চিহ্ন প্রদান করেন। সেগুলির অন্যতম হলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। গ্রন্থকার এখানে কুরআনের অলৌকিকত্বের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন। তবে কুরআনের অলৌকিকত্ব এগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বস্তুত, কুরআনের অলৌকিকত্ব চিরন্তন। প্রত্যেক যুগের মানুষেরা কুরআনের মধ্যে নতুন নতুন অলৌকিকত্বের সন্ধান লাভ করেছেন। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীগণ মানবদেহ, পৃথিবী, মহাকাশ ইত্যাদির বিষয়ে অনেক সত্য উদঘাটন করেছেন। তাঁরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছেন যে, কুরআনে এসকল বিষয়ে অনেক তথ্য রয়েছে যা নব আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যাদির সাথে শতভাগ সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁরা স্বীকার করছেন যে, কুরআনের অলৌকিকত্বের এটি একটি বড় প্রমাণ। এভাবে আগত সকল যুগেই মানুষ কুরআনের মধ্যে নতুন নতুন অলৌকিকত্বের সন্ধান লাভ করবে।

গ্রন্থ। এখানে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হবে, যেগুলি বিষয়টি প্রমাণ করে।

৩. ১. ১. ১. অলৌকিক ভাষাশৈলী

কুরআনের অলৌকিকত্ব ও আল্লাহর বাণীত্বের (**Divinity, Divine Authority**) একটি প্রমাণ হলো, কুরআনে সর্বত্র ভাষা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাহিত্য মান রক্ষা করা হয়েছে।[134] আরবীতে এই সর্বোচ্চ সাহিত্য মানকে 'বালাগাত' বলা হয়। এর অর্থ হলো, আকর্ষণীয় সর্বোত্তম শব্দের মাধ্যমে প্রয়োজীনয় অর্থের প্রকাশ ঘটানো

কেউ সেগুলি বিবেচনা করে হৃদয়কে আলোকিত করবেন। কেউ তা জেনেও অবহেলা করবেন বা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

[134] মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করার প্রধান মাধ্যম হলো কথা। কথা যত সুন্দর হয় মানুষের হৃদয়ে তার প্রভাবও তত গভীর হয়। কুরআন কারীম শুধু ধর্মগুরুদের জন্য 'নিয়ম পুস্তক' নয়। বরং প্রত্যেক বিশ্বাসী ও প্রত্যেক মানুষের পাঠের, শ্রবণের ও অনুধাবনের জন্য এই গ্রন্থ। এজন্য কুরআন কারীমে সকল বিষয়ে ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষা করা হয়েছে। এটিই কুরআন কারীমের একমাত্র অলৌকিকত্ব নয়, তবে তার অলৌকিকত্বের একটি দিক। লক্ষণীয় যে, এটি কুরআন কারীমের একক বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থে এই বৈশিষ্ট পাওয়া যায় না। সকল ধর্মগ্রন্থেই ভালভাল বিষয় আলেচিত হয়েছে, যেগুলি পাঠ করলে বিষয় ও অর্থ মানুষের মন নাড়া দিতে পারে। তবে অর্থের পাশাপাশি শব্দ, বাক্য ও ভাষাশৈলীর মাধুর্য ও হৃদয়গ্রাহিতা কুরআনের বৈশিষ্ট্য।

এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা। এভাবে শব্দের সৌন্দর্য, অর্থের মহত্ব ও বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য যত গভীর ও পরিপূর্ণ হয় 'বালাগাত'-এর মানও তত পূর্ণতা পায়। বিভিন্নভাবে কুরআনের এই সর্বোচ্চ সাহিত্যমান জানা যায়:

(ক) প্রথম দিক: বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ও সাহিত্যিক উচ্চাঙ্গতা

আরব ও অনারব কবি-সাহিত্যিকগণের সাহিত্যিক পারঙ্গমতা বা বালাগাত সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে বর্ণনার ক্ষেত্রে। উট, ঘোড়া, নারী, রাজা, তরবারীর আঘাত, তীর নিক্ষেপ, যুদ্ধক্ষেত্র, আক্রমন ইত্যাদির বর্ণনায় আরবগণ সবচেয়ে বেশি পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে সাহিত্য ও অলঙ্কারের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। কারণ অধিকাংশ মানুষের প্রকৃতি এরূপ বর্ণনা পছন্দ করে। প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে কবি ও সাহিত্যিকগণ এ সকল বিষয়ে নতুন নতুন অর্থ উদ্ভাবন করেছেন। পরবর্তী কবি সাহিত্যিকগণ সাধারণত এ বিষয়ে পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের থেকে ভাব ও ভাষা গ্রহণ করেন। যদি কোনো বুদ্ধিমান ও মেধাবী মানুষ কোনো একটি বিষয়ে সাহিত্যিক যোগ্যতা অর্জন করার মানসে দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে পূর্ববর্তী কবি সাহিত্যিকদের রচনা পাঠ ও চর্চা করেন তবে ক্রমান্বয়ে তিনি এ বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করেন।

কুরআন মূলত এ সকল কাব্যিক বা সাহিত্যিক কোনো বিষয়ের বর্ণনায় রচিত নয়, সেহেতু এ গ্রন্থে সাহিত্যিক মান রক্ষিত না হওয়াই

ছিল স্বাভাবিক। অথচ বাস্তবে কুরআনে সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষা করা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, কোনো মানবীয় চর্চা বা চেষ্টার ফলে নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে অলৌকিকভাবেই এর সাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক মান রক্ষা করা হয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় দিক: সত্যনিষ্ঠা ও সাহিত্যিক উচ্চাঙ্গতা

সাহিত্যের উচ্চাঙ্গতার সাথে কল্পনা ও মিথ্যা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যে কোনো কবি বা সাহিত্যিক যদি মিথ্যা বর্জন করে শুধু সত্যের মধ্যে নিজের সাহিত্যকর্ম আবদ্ধ রাখেন তবে তার সাহিত্যমানের অবনতি ঘটে। এরূপ সাহিত্য উন্নত সাহিত্য বলে গণ্য হয় না। এজন্য আরবী সাহিত্যে বলা হয়: 'সবচেয়ে সুন্দর কাব্য যা সবচেয়ে বেশি মিথ্যা।' কিন্তু কুরআন এর সম্পুর্ণ ব্যতিক্রম। মহান আল্লাহ কুরআনে সকল ক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠা বজায় রেখেছেন এবং মিথ্যা সর্বোতভাবে পরিহার করেছেন। সকল প্রকার মিথ্যা, অতিরঞ্জন ও বাড়িয়ে বলা থেকে বিমুক্ত থাকা সত্ত্বেও কুরআনের সর্বোচ্চ সাহিত্যমান অক্ষুন্ন রয়েছে।

(গ) তৃতীয় দিক: সর্বব্যাপিতা

মানবীয় উচ্চাঙ্গ সাহিত্য কর্মের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, একটি বৃহৎ কাব্যের মধ্যে হয়ত একটি দুইটি পংক্তি উচ্চমানের সাহিত্যকর্ম বলে গণ্য হয়। বাকি পংক্তিগুলি সাধারণ মানের হয়। পক্ষান্তরে কুরআনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, যত বৃহৎ বা দীর্ঘ কাহিনী বা বর্ণনাই হোক, প্রথম

থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষা করা হয়েছে, যা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কেউ যদি সূরা ইউসূফ নিয়ে একটু চিন্তা করেন তবে দেখতে পাবেন যে, এই দীর্ঘ সূরাটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই পর্যায়ের সাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক মান রক্ষা করা হয়েছে।

(ঘ) চতুর্থ দিক: পুনরাবৃত্তির উচ্চাঙ্গতা

কোনো কবি বা সাহিত্যিক যদি কোনো বিষয় বা গল্প পুনরাবৃত্তি করেন তবে প্রথম বর্ণনা ও দ্বিতীয় বর্ণনার মধ্যে সাহিত্য মানের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। পক্ষান্তরে কুরআন কারীমে নবীগণের কাহিনী, সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের কাহিনী, ধর্মীয় বিধিবিধান, আল্লাহর গুণাবলির বিবরণ বিভিন্ন স্থানে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কোথাও দীর্ঘ এবং কোথাও সংক্ষেপ করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বর্ণনার শব্দ, বাক্য, ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনয়ন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা দেখি যে, সকল বর্ণনায় চূড়ান্ত সাহিত্যমান রক্ষা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানের বর্ণনার মধ্যে সাহিত্যিক মানের কোনো কমবেশি লক্ষ্য করা যায় না।

(ঙ) পঞ্চম দিক: অসাহিত্যিক বিষয়ের সাহিত্যিকতা

কুরআনের আলোচ্য বিষয় মূলত উপাসনা-আরাধনা বা ইবাদত বন্দেগির নির্দেশ দেওয়া, অশ্লীল, অন্যায় ও গর্হিত কাজ নিষিদ্ধ করা, উত্তম আচরণ, লোভমুক্ত জীবন ও আখিরাতমুখিতার উৎসাহ প্রদান।

এ ধরনের বিষয়ে সাহিত্যিকের সাহিত্যিক পারঙ্গমতা পরিদর্শনের সুযোগ খুবই সীমিত। কোনো সুপ্রসিদ্ধ ভাষার যাদুকর কবি বা সাহিত্যিককে যদি বলা হয়, তুমি উচ্চাঙ্গের উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও ভাষার অলঙ্কার দিয়ে দশটি ফিক্হী বিষয়ে অথবা ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ, তাহলে তিনি তাতে পুরোপুরি সক্ষম হবেন না। পক্ষান্তরে কুরআন এই অসাহিত্যিক বিষয়গুলিতেই সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষা করেছে।

(চ) ষষ্ঠ দিক: বিষয়বস্তুর বৈচিত্রময়তা ও সাহিত্যিক উচ্চাঙ্গতা

কোনো কবি বা সাহিত্যিক একাই সাহিত্যের সকল বিষয়ে পারঙ্গমতা দেখাতে পারেন না। প্রত্যেকেই একটি বিশেষ বিষয়ে ভাল করেন, বাকি বিষয়গুলিতে অত ভাল করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কুরআনে সকল বিষয়েই সর্বোচ্চ সাহিত্যমান রক্ষিত হয়েছে। উদ্দীপনা প্রদান, ভয় প্রদর্শন, উপদেশ, শাসন ইত্যাদি সকল বিষয়েই আমরা তা দেখতে পাই। এখানে নমুনা হিসেবে কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।[135]

---

[135] স্বভাবতই আরবী পাঠের সাহিত্যিক মান, শব্দ প্রয়োগ ও ভাষাশৈলীর প্রভাব অনুবাদের মধ্যে রক্ষা করা যায় না। এখানে লক্ষণীয় যে, প্রত্যেক বিষয়ের আলাদা ছন্দ আছে। উদ্দীপনার ছন্দ থেকে ভয়ের ছন্দ আলাদা। অনেক সময় ভাষা ভাল না বুঝলেও এই ছন্দের প্রভাব হৃদয়ে অনুভব করা যায়।

পারলৌŠকিক জীবনের প্রতি আগ্রহ প্রদান করে কুরআনে বলা হয়েছে: “কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন-প্রীতিকর কী লুক্কায়িত রাখা হয়েছে।”[136]

ভয় প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এক স্থানে বলা হয়েছে: “তারা বিজয় কামনা করল এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল। তাদের প্রত্যেকের পিছনে রয়েছে জাহান্নাম এবং প্রত্যেককে পান করান হবে গলিত পুঁজ। যা সে অতি কষ্টে গলাধঃকরণ করবে কিন্তু তা গলাধঃকরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সবদিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আসবে, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না এবং সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে।”[137]

শাসন ও নিন্দাবাদের অর্থে একস্থানে বলা হয়েছে: “তাদের প্রত্যেককেই আমি তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম। তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছিলোম প্রস্তরসহ প্রচন্ড ঝটিকা, কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ, কাউকে আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি কোনো যুলুম করেন নি; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছিল।”[138]

---

[136] সূরা : ৩২ সাজদা, ১৭ আয়াত।

[137] সূরা : ১৪ ইবরাহীম, ১৫-১৭ আয়াত।

[138] সূরা: ২৯ আনকাবূত, ৪০ আয়াত।

ওয়ায-উপদেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: "তুমি বল তো, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দেই, এবং পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সাবধান করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগ বিলাস তাদের কোনো কাজে আসবে কি?"[139]

আল্লাহর গুণবর্ণনায় বলা হয়েছে: "আল্লাহ অবগত আছেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ূতে যা কিছু কমে ও বাড়ে এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত। তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।"[140]

(ছ) সপ্তম দিক: বিষয় পরিবর্তন ও সাহিত্যিকতা

মানবীয় কথায়, গল্পে, কাব্যে বা আলোচনায় যখন বিষয় পরিবর্তন করা হয় বা অনেক বিষয় আলোচনা করা হয় তখন বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষা কঠিন হয়। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে গমনের ক্ষেত্রে ভাষার গতিশীলতা বা কাব্যের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়। এতে সাহিত্যকর্মের সাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক মান ক্ষুণ্ণ হয়।

কুরআনে অতি সীমিত পরিসরে বহু বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এক কাহিনী থেকে অন্য কাহিনী বা এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে যাওয়া হয়েছে। আদেশ, নিষেধ, সংবাদ, জিজ্ঞাসা, সুসংবাদ,

---

[139] সূরা: ২৬ শু'আরা, ২০৫-২০৭ আয়াত।

[140] সূরা: ১৩ রা'দ, ৮-৯ আয়াত।

শাস্তির সংবাদ, নবুয়ত প্রমাণ, আল্লাহর একত্ব প্রমাণ, আল্লাহর গুণাবলির একত্ব আলোচনা, উদ্দীপনা প্রদান, ভয় প্রদর্শন, উদাহরণ উল্লেখ, কাহিনী বর্ণনা ইত্যাদি অনেক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এগুলির মধ্যে ভাষাশৈলীর ধারাবাহিকতা ও সর্বোচ্চ সাহিত্য ও আলঙ্কারিক মান রক্ষা করা হয়েছে। আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ যা দেখে হতবাক হয়ে যায়।

(জ) অষ্টম দিক: সংক্ষেপায়িত ব্যাপকতা

অধিকাংশ স্থানে কুরআনের বাক্যাবলি অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে। শ্রুতিমধুর সুন্দর কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে ব্যাপক অর্থ ও ভাবের আবহ তৈরি করা হয়। নমুনা হিসেবে আমি পাঠককে কুরআনের ৩৮ নং সূরা, সূরা 'সাদ' পাঠ করতে অনুরোধ করছি। সূরাটির শুরুতেই অবিশ্বাসীদের সংবাদ, তাদের চরিত্র, আচরণ, অবিশ্বাসের কারণে পূর্ববর্তী জাতিগুলির ধ্বংসের সংবাদ, আরবের কাফিরগণ কর্তৃক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবিশ্বাস করার কথা, তাঁর প্রচারিত একত্ববাদের বিষয়ে তাদের বিস্ময় প্রকাশ, অবিশ্বাসের বিষয়ে তাদের ঐকমত্যের কথা, তাদের কথায় হিংসার প্রকাশ, তাদের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার কথা, পৃথিবীতে ও পুনরুত্থানের পরে তাদের লাঞ্ছনার আগাম সংবাদ, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে অবিশ্বাসের প্রবণতা, আল্লাহ কর্তৃক অবিশ্বাসীদের শাস্তি প্রদান, কুরাইশ ও অন্যান্য অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে অনুরূপ

পরিণতির ভীতি প্রদর্শন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ধৈর্য ধারণে উৎসাহ প্রদান, পূর্বের বিষয়গুলির মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান... ইত্যাদি অনেক বিষয় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষণীয় সুন্দর কয়েকটি মাত্র বাক্যে বিদ্ধৃত হয়েছে। এরপর দাঊদ, সুলাইমান (শলোমন), ইবরাহীম (অবরাহাম), ইয়াকূব (যাকোব) ও অন্যান্য পূর্ববর্তী নবীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। আর সবকিছুই সম্পন্ন করা হয়েছে ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত কিছু বাক্যের মাধ্যমে।

কুরআনের একটি বাক্য লক্ষ্য করুন: "কিসাসের মধ্যে (হত্যার অপরাধে মৃত্যুদন্ডের বিধানে) তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে।"[141]

এ বাক্যটির মধ্যে সামান্য কয়েকটি শব্দ রয়েছে। কিন্তু এর অর্থ ব্যাপক। ব্যাপক অর্থবোধক ও সাহিত্যিক মানসম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে এই বাক্যে রয়েছে শাব্দিক অলঙ্করণ, যাতে মৃত্যু ও জীবনকে একটি ছোট্ট বাক্যে পরস্পরের মুখোমুখি রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, যে মৃত্যু হলো জীবনের পরিসমাপ্তি, সেই মৃত্যুর মধ্যে জীবন নিহিত থাকার কথা বলে এর অর্থের মধ্যে আকর্ষণীতা ও নতুনত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে।

---

[141] সূরা: ২ বাকারা, ১৭৯ আয়াত।

আরবদের মধ্যে এই অর্থে অনেক বাক্য প্রবাদরূপে প্রচলিত ছিল। কুরআনের এই বাক্যটি শব্দে ও অর্থে সেগুলির চেয়ে অনেক সুন্দর ও উন্নত। এই অর্থে আরবরা বলত: “কিছু মানুষের হত্যা সকল মানুষের জীবনদান”, “বেশি করে হত্যা কর যেন হত্যা কমে যায়”, “হত্যা হত্যা রোধে অধিক কার্যকর” ইত্যাদি। আরবদের মধ্যে প্রচলিত এই তিনটি বাক্যের মধ্যে শেষ বাক্যটিই অর্থ প্রকাশের দিক থেকে সবচেয়ে সুন্দর। আর কুরআনে বাক্যটি এই বাক্যটির চেয়েও অনেক পরিশীলিত ও অধিকতর অর্থজ্ঞাপক। নিম্নের ছয়টি দিক থেকে আমরা দুইটি বাক্যের তুলনা বুঝতে পারব:

(১) উপরের চারটি বাক্যের মধ্যে কুরআনের বাক্যটিই সংক্ষিপ্ততম। বাক্যের শুরুতে (তোমাদের জন্য) কথাটি থাকলেও, মূল অর্থ মাত্র তিনটি শব্দে প্রকাশ করা হয়েছে: “মৃত্যুদন্ডের মধ্যে জীবন”। “তোমাদের জন্য” কথাটি অন্যান্য বাক্যের মধ্যেও অর্থের দিক থেকে সংযুক্ত ও উহ্য রয়েছে। এ ছাড়াও অন্যান্য বাক্যে কুরআনের বাক্যের চেয়ে এক বা একাধিক শব্দ বেশি রয়েছে।

(২) ‘হত্যা হত্যা রোধে অধিক কার্যকর’ বাক্যটি দ্বারা বাহ্যত বুঝা যায় যে, উভয় হত্যাই সমান বা যে কোনো হত্যাই হত্যা রোধ করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে কুরআনের বাক্যে রোধকারী হত্যা ও রোধকৃত হত্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে। শুধু বিশেষ

প্রকারের হত্যা, অর্থাৎ বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মৃত্যুদন্ড প্রদানই হত্যা রোধ করে।

(৩) আরবদের মধ্যে প্রচলিত বাক্য তিনটির মধ্যে সর্বোত্তম বাক্যে 'হত্যা' শব্দটি পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআনে তা করা হয় নি। ফলে শব্দ ব্যবহারে আলঙ্কারিক মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৪) আরবদের বাক্যটি থেকে বুঝা যায় যে, হত্যা শুধু হত্যাই রোধ করে। পক্ষান্তরে কুরআনের বাক্যটি থেকে বুঝা যায় যে, কিসাস হত্যা, আঘাত ইত্যাদি জীবনের জন্য ক্ষতিকর সকল কর্মই রোধ করে। এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআনের বাক্যটির অর্থ ব্যাপকতর।

(৫) হত্যা রোধের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হলো, জীবন রক্ষা করা। আরবীয় বাক্যটি থেকে জীবন রক্ষার বিষয়টি সরাসরি বুঝা যায় না, বরং শুধু হত্যা রোধ করার বিষয়টিই বুঝা যায়। পক্ষান্তরে কুরআনের বাক্যটি থেকে জীবন রক্ষার বিষয়টি সরাসরি বুঝা যায়।

(৬) আরবীয় বাক্যটির অর্থ বিভ্রান্তিকর। বাক্যটি থেকে মনে হতে পারে যে, যে কোনো হত্যা হত্যা রোধ করে। যুলূম, অন্যায় বা বিনা বিচারে হত্যাকেও 'হত্যা' বলা হয়। এরূপ হত্যা কখনোই হত্যা রোধ করে না, বরং হত্যার প্রসার ঘটায়। আরবীয় বাক্যটি ভাল অর্থে বলা হলেও বাক্যটি থেকে ভুল বুঝার বা ভুল অর্থে ব্যবহারের সমূহ

সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআনের বাক্যটি পরিপূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক অর্থ জ্ঞাপক।

(ঝ) নবম দিক: গাম্ভীর্য, শ্রুতিমধুরতা ও বিনম্রতার সমন্বয়

শব্দের গাম্ভীর্য-দৃঢ়তা এবং তার শ্রুতিমধুরতা ও বিনম্রতা মূলত দুটি পরস্পর বিরোধী গুণ। মানবীয় সাহিত্যকর্মে দুটি দিক একত্রিত করা কষ্টকর। বিশেষত কথা লম্বা হলে তাতে ব্যবহৃত সকল শব্দের ক্ষেত্রে এই দুটিগুণ সর্বদা রক্ষা করা মানবীয় অভ্যাসের ঊর্ধ্বে। কুরআনের সকল ক্ষেত্রে এ দুটি গুণ সমানভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনে সাহিত্য মান অলৌকিক।

(ঞ) দশম দিক: আরবী ভাষালঙ্কারের সামগ্রিক প্রয়োগ

কুরআনে অলঙ্কারশাস্ত্রের সকল শিল্প প্রয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বায়ন, রূপক, তুলনা, উৎপ্রেক্ষা, রূপালঙ্কার, শুরুর সৌন্দর্য, সমাপ্তির সৌন্দর্য, বাক্যশেষের সৌন্দর্য, অগ্রবর্তীকরণ, স্থানান্তরকরণ, প্রয়োজন অনুসারে বাক্যসমূহের সংযোজন, বিভাজন ইত্যাদি সকল আলঙ্কারিক শিল্প কুরআনের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। দুর্বল, শ্রুতিকটু, অপ্রচলিত, ব্যবহারের অনুপযুক্ত বা বাজে শব্দ থেকে তা পরিপূর্ণ মুক্ত। কোনো ভাষার যাদুকর আরব সাহিত্যিকও সবগুলি বিষয় একত্রিত করতে পারবেন না। বরং তার সাহিত্য কর্মে হয়ত দুএকটি শিল্প তিনি প্রয়োগ করতে পারবেন। কেউ যদি কোনো বড় সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মে এগুলির সন্ধান করেন তবে সামান্য

কিছু শৈল্পিক বিষয় তিনি খুঁজে পাবেন। পক্ষান্তরে কুরআনে সব বিষয়ই রয়েছে।

উপরে দশটি বিষয় উল্লেখ করলাম। এ বিষয়গুলি প্রমাণ করে যে, কুরআন সর্বোচ্চ পর্যায়ের শৈল্পিক ও সাহিত্যিক মান সংরক্ষণ করেছে, যা মানুষের জন্য অস্বাভাবিক ও অলৌকিক। আরবী সাহিত্যিকগণ তাদের স্বভাবজাত বিচারবুদ্ধি দিয়ে তা বুঝতে পারেন। অন্যান্য ধর্মের পণ্ডিতগণও ভাষার অলঙ্কার ও সাহিত্যে তাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে তা অনুধাবন করতে পারেন। আরবী ভাষা, সাহিত্য, অলঙ্কারশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে যার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যত বেশি হবে, তিনি তত বেশি কুরআনের অলৌকিক ভাষা শৈলী অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

৩. ১. ১. ২. অত্যাশ্চার্য কাব্যিক গদ্য ও বিন্যাস

কুরআন কোনো মানুষের রচিত বাণী নয়, বরং তা আল্লাহর বাণী একথার দ্বিতীয় প্রমাণ হলো বিন্যাস। এ বিষয়টিও ভাষা কেন্দ্রিক। কুরআনে ভাষার সর্বোচ্চ সাহিত্যমান ও অলঙ্কার সংরক্ষণ ছাড়াও এর 'কাব্যিক গদ্য' আরবী ভাষায় এক অত্যাশ্চার্য ও অতুলনীয় বিষয়। এর বাক্য বিন্যাস, প্রতি বাক্যের শেষের মিল ও ছন্দ, অভ্যন্তরীণ অর্থ ও অর্থের আবহ ইত্যাদি বিষয় আরবের ভাষাবিদ কাবি-সাহিত্যিকদের হতবাক করে দিয়েছে। এই অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণ হলো, কোনো কুরআন বিরোধী গায়ের জোরেও যেন বলতে না পারে

যে, অমুক বা তমুক সাহিত্যিক, কবি বা লেখকের লেখা থেকে এ কথাগুলি বা এ বিন্যাস চুরি করা হয়েছে। এভাবে কুরআন সকল মানবীয় কাব্য ও সাহিত্যের উপরে নিজের স্থান নিশ্চিত করেছে।

একজন কবি বা সাহিত্যিক তার গদ্য বা পদ্যে যত চেষ্টাই করুন, সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন না এবং তার পুরো সাহিত্যকর্মকে নির্ভুল করতে পারবেন না। এজন্য কবি-সাহিত্যিকগণকে তাদের সাহিত্যের জন্য যেমন প্রশংসা করা হয়েছে, তেমনি তাদের ভুলভ্রান্তি বা দুর্বলতার জন্য তাদের নিন্দাও করা হয়েছে। সকল জাঁদরেল কবি ও সাহিত্যিকের সাহিত্য কর্মের মধ্যে ভুলভ্রান্তি ধরা পড়েছে। আরবের সম্ভ্রান্ত গোত্রপতিগণ আরবী ভাষায় তাদের পরিপূর্ণ দখল এবং ইসলামের প্রতি তাদের কঠিনতম শত্রুতা সত্ত্বেও তারা কুরআনের সাহিত্যিক, আলঙ্কারিক ও বিন্যাসের মানের ক্ষেত্রে কোনো সমালোচনার সুযোগ পান নি। তারা এ বিষয়ে কুরআনের কোনো সমালোচনা করতে সক্ষম হন নি।

তারা স্বীকার করেন যে, কুরআন আরবীয় সাহিত্যিকদের গদ্য সাহিত্য বা কবিদের কবিতা কোনোটির সাথেই তুলনীয় নয়। এর যাদুকরী আকর্ষণীতায় অবাক হয়ে কখনো তারা একে ‘যাদু’ বলে

অভিহিত করেছেন।[142] কখনো তারা বলেছেন, এগুলি পূর্ববর্তী যুগের গল্প-কাহিনী[143] এবং বানোয়াট কথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বানিয়েছেন[144]। কখনো তারা তাদের অনুসারী ও সাথীদেরকে বলেছেন: "তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।"[145]

এগুলি সবই কথার যুদ্ধে পরাজিত হতবাক শত্রুর আচরণ। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন তার অলঙ্কার, সর্বোচ্চ সাহিত্যমান ও সর্বোত্তম বিন্যাস পদ্ধতিতে অননুকরণীয় ও অলৌকিক।

আর একথা কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, ভাষার যাদুকর স্বভাব-কবি আরবগণ যারা সংখ্যায় মরুভূমির বালুকা ও পাহাড়ি প্রান্তরের কাঁকরের মত অগণিত, যাদের জাহিলী অপ্রতিরোধ্য উগ্র ধর্মান্ধতা ও উৎকট জাত্যাভিমান, প্রতিপক্ষের বিরোধিতায় ও মর্যাদা রক্ষার প্রতিযোগিতায় তাদের আত্মত্যাগের চূড়ান্ত অনুভূতি সুপ্রসিদ্ধ, তারা

---

[142] নিম্নের আয়াতগুলি দেখুন: সূরা আনআম: ৭, ইউনূস: ২, হূদ: ৭, হিজর: ১৫, ইসরা: ৪৭, আনবিয়া: ৩, ফুরকান: ৮, সাবা: ৪৩, সাফ্ফাত: ১৫, সাদ: ৪, যুখরুফ: ৩০, আহকাফ: ৭, কামার: ২, মুদ্দাস্‌সির: ২৪ আয়াত।

[143] নিম্নের আয়াতগুলি দেখুন: সূরা আনআম: ২৫, আনফাল: ৩১, নাহল: ২৪, মুমিনূন: ৮৩, ফুরকান: ৫, নামল: ৬৮, আহকাফ: ১৭, কালাম: ১৫, মুতাফ্ফিফীন: ১৩ আয়াত।

[144] নিম্নের আয়াতগুলি দেখুন: সূরা ফুরকান; ৪, সাবা: ৪৩, আহকাফ ১১ আয়াত।

[145] সূরা : ৪১ ফুসসিলাত (হা-মীম-আস্সাজদা): ২৬ আয়াত।

জন্মভূমি পরিত্যাগ, রক্তপাত, জীবন ত্যাগ করার পথ বেছে নিল, তাদের সন্তানসন্ততি ও পরিবার পরিজন যুদ্ধবন্দী হলো, তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হলো। অথচ তাদের প্রতিপক্ষ সকল মানুষের সামনে তাদেরকে একটিমাত্র চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন।

তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা করছেন: "আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর। যদি তোমরা তা করতে না পার- আর কখনোই তা করতে তোমরা পারবে না- তবে সেই নরকাগ্নিকে ভয় কর, মানুষ এবং পাথর যার ইন্ধন, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।"[146]

আরো বলেছেন: "তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাকে পার আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"[147]

অন্যত্র বলছেন: "বল, যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে

---

[146] সূরা: ২ বাকারা, ২৩-২৪ আয়াত।

[147] সূরা : ১০ ইউনূস, ৩৮ আয়াত।

সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কিছু আনয়ন করতে পারবে না।"[148]

তারা যদি মনে করত যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কারো সহযোগিতায় কুরআন রচনা করেছেন, তবে তাদের জন্যও অনুরূপ সহযোগিতা গ্রহণ খুবই সহজ ছিল। ভাষাজ্ঞানে এবং অন্য কারো সহযোগিতা গ্রহণের সুযোগের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তাদের মতই ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর কোনো বিশেষ সুবিধা ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা প্রতিযোগিতার পরিবর্তে যুদ্ধকেই বেছে নিয়েছিল। কথার যুদ্ধের পরিবর্তে তরবারীর যুদ্ধ গ্রহণ করেছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের সর্বোচ্চ সাহিত্য ও আলঙ্কারিক মান তারা স্বীকার করে নিয়েছিল। এর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার বা এর বিপরীতে কোনো সাহিত্যকর্ম পেশ করার ক্ষমতা তাদের ছিল না।[149]

---

[148] সূরা: ১৭ ইসরা (বানী ইসরাঈল), ৮৮ আয়াত।

[149] নবুয়তের শুরু থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার এই একটি চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে ছুঁড়ে দিয়েছেন। আমরা বুঝতে পারি যে, অবিশ্বাসী আরবদের যদি ক্ষমতা থাকত তবে সহজেই হাজার হাজার মানুষকে জমায়েত করে কুরআনের ছোট্ট সূরার অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে শুনিয়ে মুহাম্মাদের সকল বক্তব্য স্তব্ধ করে দিতে পারত। কাব্যিক যুদ্ধ ও সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা তাদের মধ্যে সুপরিচিত ছিল। তা সত্ত্বেও তারা কুরআনের ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে সাহস পায় নি। কারণ তারা কুরআনের

এজন্য তাদের কেউ কুরআনের সত্যতা ও অলৌকিকত্ব মেনে নিয়েছে এবং কুরআন ও তার প্রেরণকারীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। কেউ তার অলৌকিক সাহিত্যিক মান দেখে হতবাক হয়েছে। কিন্তু কেউই এর সাহিত্য মান অস্বীকার করতে পারেনি। এ বিষয়ে ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা, উতবা ইবনু রাবীয়াহ প্রমুখ আরবীয়

অলৌকিকত্ব খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল। তারা বুঝেছিল যে, যদি এরূপ কোনো বড় জমায়েত করে সেখানে তাদের তৈরি কোনো কাব্য বা সাহিত্যকর্মকে কুরআনের বিপরীতে চ্যালেঞ্জের জবাব হিসেবে পেশ করা হয় তবে উপস্থিত আরবগণ তাদের স্বভাবজাত ভাষা জ্ঞান ও রুচির মাধ্যমে কুরআনের অলৌকিকত্বই গ্রহণ করবে এবং তাদের কর্মকে প্রত্যাখ্যান করবে। এতে তাদের পরাজয় ও ইসলামের প্রসার নিশ্চিত হবে। এজন্যই তারা এরূপ কোনো প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার পথে না যেয়ে কঠিন পথই বেছে নিয়েছিল। আমরা জানি যে, সাহিত্যিক বা কথার প্রতিযোগিতায় জয় পরাজয় কিছুটা অস্পষ্ট থাকে। দুটি সাহিত্যকর্ম যদি কাছাকাছি হয় তবে উভয় পক্ষের মানুষই জয়লাভের দাবি করতে পারে। বিতর্ক বা বহসে অহরহ এরূপ ঘটে। কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়কে কেউ বিজয় দাবি করতে পারে না। আরবের কাফির নেতৃবৃন্দ যদি কুরআনের কাছাকাছি কিছু পেশ করার আশা করতে পারত তবে তারা অবশ্যই তা পেশ করত এবং তাদের অনুসারীরা তাদের বিজয় দাবি করত। কিন্তু তারা পরাজয়ের বিষয়ে এতই নিশ্চিত ছিল যে, এ পথে যাওয়ার সাহস তাদের হয় নি। ফলে যাদু, মিথ্যা কাহিনী, অন্যরা তাকে বানিয়ে দিয়েছে ইত্যাদি বলে জনগণকে তা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করত।

কাফির নেতার স্বীকারোক্তি ও মন্তব্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, যা বিষয়টি নিশ্চিত করে।

৩. ১. ১. ৩. ভবিষ্যতের সংবাদ

তৃতীয় যে বিষয়টি প্রমাণ করে যে, কুরআন আল্লাহর বাণী তা হলো কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ। কুরআনের মধ্যে অনেক আগাম খবর দেওয়া হয়েছে, যেগুলি পরবর্তীকালে ঠিক সংবাদ অনুযায়ীই সংঘটিত হয়েছে। এ সকল আগাম খবরের মধ্যে রয়েছে:

(১) মহান আল্লাহ বলেছেন: "আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মাস্জিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, কেউ কেউ মস্তক মুন্ডিত করবে এবং কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোনো ভয় থাকবে না।"[150]

(২) মহান আল্লাহ বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত-ক্ষমতাধর করবেন, যেভাবে তিনি ক্ষমতা দিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে, এবং অব্যশই তিনি তাদের জন্য সুদৃঢ়-সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্য

---

[150] সূরা: ৪৮ ফাৎহ, ২৭ আয়াত। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করা হয় পরে তা বাস্তবায়িত হয়।

তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরীক করবে না..."।[151]

এখানে আল্লাহ ওয়াদা করলেন মুমিনদেরকে যে, তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাধর করবেন, খলীফা বা শাসক তাদের মধ্য থেকেই হবেন, তাদের মনোনীত দীন সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, তাদের ভয়-ভীতির অবস্থা পরিবর্তন করে নিরাপত্তা প্রদান করবেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পুরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশাতেই আল্লাহ তাঁদেরকে ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা দান করেন। আবূ বাক্র সিদ্দীকের (রা) সময়ে এই বিজয়, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তার অবয়ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। উমার ফারূকের (রা) সময়ে তা আরো প্রসারিত হয়। উসমান ইবনু আফ্ফানের (রা) সময়ে ক্ষমতা ও নিরাপত্তার চাদর আরো প্রসারিত হয়। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের মাত্র ২৫ বৎসরের মধ্যে মুসলিমগণ তৎকালীন পরিচিত বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র প্রায় পুরোটুকুই অধিকার করেন। এভাবে আল্লাহর মনোনীত দীন এ সকল দেশের সকল দীনের উপর বিজয় লাভ করে। ফলে মুসলিমগণ নিরাপদে ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহর ইবাদত করতে পারেন।

---

[151] সূরা : ২৪ নূর, ৫৫ আয়াত।

(৩) মহান আল্লাহ বলেছেন: "অচিরেই তোমরা আহূত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পন করে"।[152]

এ ভবিষ্যদ্বাণীও যথাযথভাবে সংঘটিত হয়েছে।[153]

(৪) মহান আল্লাহ বলেন: "যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে দেখবে।"[154]

---

[152] সূরা: ৪৮ ফাৎহ, ১৬ আয়াত।

[153] ৬ষ্ঠ হিজরী সনে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় রাওয়ানা দেন। মদীনার মুনাফিকগণ এতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে এবং মনে করে যে, মক্কার কাফিরগণ মুসলিমদেরকে নির্মুল করবে। তাদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মুসলিমগণ হুদাইবিয়ার সন্ধি শেষে নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন। তখন মহান আল্লাহ সূরা ফাতহে নির্দেশ দেন, যে সকল মুনাফিক এ যাত্রা থেকে বিরত ছিল তারা পরবর্তী যুদ্ধেও অংশগ্রহণের অনুমতি পাবে না। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরে প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধের জন্য তাদেরকে আহবান করা হবে। খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রোমান ও পারসিয়ান রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিকভাবে কার্যকর হয়েছে।

[154] সূরা : ১১০ নাস্র, ১-২ আয়াত।

মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এই ওয়াদাও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এবং মক্কা বিজয়ের পরে মানুষ দলে দলে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করেছে।

(৫) আল্লাহ বলেন: "আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন।"[155]

এ ভবিষ্যদ্বাণীও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। অগণিত মানুষ তাঁকে হত্যা করার ও তাঁকে ধরার বুক থেমে মুছে দেওয়ার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করা সত্ত্বেও কেউই তার ক্ষতি করতে সক্ষম হয় নি। তিনি আল্লাহর হেফাযতে থেকে পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করে পৃথিবীর আবাসস্থল পরিত্যাগ করে পরকালীন মহান আবাসস্থলে গমন করেন।

(৬) আল্লাহ বলেন: "আলিফ-লাম-মীম। রোমকগণ (বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী) পরাজিত হয়েছে। নিকটবর্তী অঞ্চলে (আরব দেশের সীমানায়)। কিন্তু তারা (রোমকগণ) তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে। কয়েক (তিন থেকে দশ) বৎসরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। আর সে দিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। এ আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তাঁর

---

[155] সূরা: ৫ মায়িদা, ৬৭ আয়াত।

প্রতিশ্রুতি ব্যতিক্রম করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে তারা অমনোযোগী।"[156]

পারস্য সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল অগ্নি উপাসক আর রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা ছিল খৃস্টান। এই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ আগে থেকেই চলছিল। ৬১৮/৬১৯ খৃস্টাব্দের দিকে (নবুয়তের ৮/৯ম বৎসরের দিকে, হিজরতের ৩/4 বৎসর পূর্বে) পারস্য-বাহিনীর নিকট রোমান বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।[157] কিছু সময়ের মধ্যে এই পরাজয়ের সংবাদ মক্কাতেও পৌঁছে যায়। রোমকদের উপর পারস্যবাসীদের বিজয়ের সংবাদ মক্কায় পৌঁছালে মক্কার কাফিরগণ আনন্দিত হন। তারা বলে, তোমরা মুসলিমগণ এবং খৃস্টানগণ ঐশ্বরিক গ্রন্থ বা আসমানী কিতাবের অনুসারী বলে দাবি কর। আর পারস্যবাসীগণ আমাদেরই মত কোনো কিতাব মানে

---

[156] সূরা : ৩০, রূম, ১-৭ আয়াত।

[157] পারস্য সম্রাটের সেনাদল মিসর অধিকার পূর্বক উত্তর আফ্রিকার বিখ্যাত কার্থেজ নগর আক্রমন করে। অপর একদল পারসিক সেনা এসিয়া মাইনর পুরোটাই রোমানদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিজয়ী বেশে বস্ফোরাস প্রণালীর তীরে উপনীত হয়। দুর্দান্ত স্লাভ জাতির আক্রমনে রাজধানী কন্সটান্টিনোপল আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় ব্যতিব্যস্ত থাকার কারণে রোমক সম্রাট পারসিক সেনাদলের গতিরোধ করতে অক্ষম হন। মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৪১।

না। আমাদের ভ্রাতাগণ তোমাদের ভ্রাতাগণের উপর বিজয় লাভ করেছেন। এভাবে আমরাও শীঘ্রই তোমাদের উপরে বিজয় লাভ করব এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী যথাসময়ে বাস্তবায়িত হয়। পরাজয়ের প্রায় ৭ বৎসর পরে ৬২৭ খৃস্টাব্দে (৬ হি) রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পারস্য সম্রাটের বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে হৃত এলাকাসমূহ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।[158]

(৭) মহান আল্লাহ বলেছেন, "আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তা সংরক্ষণ করব।"[159]

এভাবে আল্লাহ কুরআন নাযিলের শুরুতেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তিনি এই কুরআনকে সকল প্রকার বিকৃতি, সংযোজন ও বিয়োজন থেকে সংরক্ষণ করবেন। আর বাস্তবেও তা প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বের সকল পণ্ডিত তা জানেন। এ মহান নেয়ামতের জন্য প্রশংসা মহান আল্লাহর।

(৮) ইয়াহূদীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, "বল, (হে ইয়াহূদীগণ,) 'যদি আল্লাহর নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয় তবে তোমরা মৃত্যু

---

[158] মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৪৭।

[159] সূরা : ১৫ হিজ্র, ৯ আয়াত।

কামনা কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু তাদের কৃতকর্মের কারণে কখনোই (যতক্ষণ জীবন আছে) তারা তা কামনা করবে না। এবং আল্লাহ যালিমদের বিষয়ে অবাহিত।”[160]

এ বিষয়ে সূরা জুমুআয় আবারো বলেছেন: “বল, হে ইয়াহূদীগণ, তোমরা যদি বিশ্বাস করে থাক যে, তোমরা আল্লাহর প্রিয়জন, অন্য কোনো মানবগোষ্ঠী নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও। কিন্তু তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা তা কামনা করবে না। এবং আল্লাহ যালিমদের বিষয়ে অবহিত।”[161]

এ ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিকভবে পরিপূর্ণ হয়েছে। ইয়াহূদীগণ তাঁর কঠিনতম শত্রু ছিলেন। তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণ করার বিষয়ে তাদের আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। ইয়াহূদীরা তাঁর সাথে শত্রুতার কারণে যুদ্ধ ও দেশান্তর বেছে নিয়েছেন, কিন্তু কখনো কোনো ইয়াহূদী তাঁর এ দাবির অসারতা প্রমাণ করতে জনসমক্ষে মৃত্যু কামনা করতে এগিয়ে আসেন নি।

(৯) আল্লাহ বলেছেন, “আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোনো সূরা আনয়ন কর এবং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহবান কর।

---

[160] সূরা: ২ বাকারা, ৯৪-৯৫ আয়াত।

[161] সূরা: (৬২) জুমু‘আ ৬-৭ আয়াত।

যদি তোমরা তা আনয়ন করতে না পার- এবং কখনোই তা করতে পারবে না- তবে সেই আগুনকে ভয় কর, মানুষ এবং পাথর যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।"[162]

এ ভবিষ্যদ্বাণী যথাযথভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সময়কালে সকল সময়ে ও যুগেই ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর শত্রুগণ সক্রিয় ছিলেন ও রয়েছেন। ইসলামের দুর্ণাম করতে তাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনায় কখনো ভাটা পড়ে নি বা প্রচারাভিযানও কখনো ক্ষান্ত হয় নি। তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কখনোই কুরআনের মুকাবিলা করার ঘটনা ঘটে নি।

উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী ও কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বাণী। কারণ আল্লাহর রীতি হলো, কেউ যদি নবূয়ত দাবি করে এবং আল্লাহর নামে মিথ্যা কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করে, তবে সে কথা সত্য হয় না।

৩. ১. ১. ৪. অতীতের সংবাদ

চতুর্থ যে বিষয়টি প্রমাণ করে যে, কুরআন আল্লাহর অলৌকিক বাণী, তা হলো কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান পূর্ববর্তী জাতি সমূহের

---

[162] সূরা : ২ বাকারা, ২৩-২৪ আয়াত।

সংবাদাদি। কুরআনে পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলি ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের বিভিন্ন সংবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। এ কথা সর্বজন পরিজ্ঞাত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন নিরক্ষর মানুষ ছিলেন। তিনি কখনো লেখাপড়া করেন নি। আলিমদের সাথে উঠাবসা বা জ্ঞানীদেরে থেকে শিক্ষালাভ করার সুযোগও তার হয় নি। বরং তিনি এমন একটি জাতির মধ্যে বেড়ে উঠেন যে জাতি মূর্তিপূজা করত এবং লেখাপড়া জানত না। বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকেও তারা দূরে ছিল। তিনি কখনো দীর্ঘ সময়ের জন্য তার নিজ জাতিকে ছেড়ে দূরে গমন করেন নি, যে সময়ে তিনি অন্য দেশের পণ্ডিতদের থেকে এ সকল বিষয় শিক্ষা লাভ করতে পারেন।[163] এরূপ একজন মানুষ কর্তৃক পূর্ববর্তী জাতি, ধর্ম ও ইতিহাস থেকে বিভিন্ন খুঁটিনাটি তথ্য প্রদান করা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমেই তিনি তা লাভ করেন।[164]

---

[163] নবুয়তের পূর্বে পূর্ববর্তী ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ বা পূর্ববর্তী জাতিদের সম্পর্কে তাঁর কোনোরূপ আগ্রহ ছিল বলে কেউ দাবি করতে পারবেন না। তিনি কখনো অন্য ধর্মের পন্ডিতদের নিকট যেয়ে এ সকল বিষয়ে তাদেরকে কোনো প্রশ্ন করেন নি বা আলোচনা করেন নি। চলতি পথে কোনো ব্যক্তি তাকে কিছু বললেও তা নিয়ে পরে চিন্তা গবেষণাও করেন নি।

[164] যীশুখৃস্ট প্রাতিষ্ঠানিক শাস্ত্রপাঠ করেছেন বলে জানা যায় না, তবে তিনি ইহূদী সমাজে ইহূদী পন্ডিতদের মধ্যে বড় হয়েছেন, স্বভাবতই ইহূদী ধর্মের ও ধর্মগ্রন্থের বিষয়গুলি তিনি সমাজ ও পন্ডিতদের থেকে জেনেছেন। তারপরও

এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় লক্ষণীয় বিষয় হলো, পূর্ববর্তী জাতি বা ঘটনাসমূহের সংবাদ দানের ক্ষেত্রে কুরআনে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত অনেক বিষয়ের বিরোধিতা করা হয়েছে। তিনি যদি তার তথ্য সংগ্রহে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত গালগল্পের উপর নির্ভর করতেন, তবে এ সকল বিষয়ে তাদের বিরোধিতা করতেন না।[165] খৃস্টের ক্রুসেবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ ও অন্যান্য বিষয়ে কুরআন

যখন তিনি শরীয়ত বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলেন তখন ইহূদীরা আশ্চার্য হয়। বাইবেলে একে যীশুর অলৌকিকত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যোহন ৭/১৫-১৬: "তাহাতে যিহূদীরা আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া কহিল, এ ব্যক্তি শিক্ষা না করিয়া কি প্রকারে শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া উঠিল? যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিয়া কহিলেন, আমার উপদেশ আমার নহে, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাহার। ...

[165] প্রসিদ্ধ ফরাসী চিকিৎসক ও গবেষক ড. মরিস বুকাইলি রচিত 'The Bible, The Qur'an and Science' (বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান) পুস্তকটি পাঠ করলে পাঠক দেখবেন যে, বাইবেলের অগণিত অবৈজ্ঞানিক, আজগুবি ও অবাস্তব গল্প-কাহিনী কুরআনে সতর্কতার সাথে পরিহার করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় বাইবেলের অতিরঞ্জনও কুরআনে পরিহার করা হয়েছে। বিশ্ব সৃষ্টির সন, তারিখ, বিশ্বের বয়স ইত্যাদি বিষয়ে বাইবেলের প্রসিদ্ধ তথ্যাদি সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছে। তিনি যদি ইহূদী খৃস্টানদের থেকেই এ সকল গল্প কাহিনী গ্রহণ করতেন তবে তিনি এগুলি বাদ দিলেন কেন? বিশেষত, যে যুগে মানুষ এ সব সন, তারিখ, ইতহিাস ও অবাস্তব কাহিনীগুলি শোনার জন্য পাগল ছিল, এগুলিকেই অলৌকিকত্ব মনে করত, এবং এ সকল গল্প দিয়ে সহজেই মানুষের

প্রচলিত বাইবেলের বিরোধিতা করেছে। এ বিরোধিতা ইচ্ছাকৃত। কারণ প্রচলিত বাইবেলের এ সকল পুস্তক বিশুদ্ধ নয়, অথবা তা ঐশ্বরিক প্রেরণা-নির্ভর নয়। কুরআনের বাণীই প্রমাণ করে যে, কুরআন ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের মধ্যে প্রচলিত ভুলভ্রান্তি অপনোদনের জন্য তা করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে: "ইস্রায়েল সন্তানগণ যে সকল বিষয়ে মতভেদ করে এই কুরআন সেগুলির অধিকাংশ তাদের নিকট বিবৃত করে।"[166]

৩. ১. ১. ৫. মুনাফিকদের গোপন খবর

কুরআনের অলৌকিকত্বের পঞ্চম বিষয় হলো, কুরআনে মুনাফিকদের গোপন চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপগুলি প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে। তারা গোপনে বিভিন্ন রকমের ষড়যন্ত্র ও ফন্দি আঁটতো। আল্লাহ তাঁর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যথাসময়ে একের পর এক সে সকল গোপন ষড়যন্ত্র ও সলাপরামর্শের কথা জানিয়ে দিতেন। প্রত্যেক ঘটনায় বিস্তারিতভাবে তাদের কথাবার্তা, পরিকল্পনা ও কর্মের কথা জানানো হয়েছে।

হৃদয় প্রভাবিত করা যেত, সে যুগে তিনি এগুলি পরিহার করলেন কেন? আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ইতিহাস ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় কুরআনের বর্ণনাই সঠিক এবং বাইবেলের বর্ণনা অতিরঞ্জন, মিথ্যা বা অবৈজ্ঞানিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

[166] সূরা : ২৭ নাম্ল, ৭৬ আয়াত।

প্রত্যেক বারেই তা সত্য বলে পাওয়া গিয়েছে। অনুরূপভাবে ইয়াহূদীদের অবস্থা, তাদের মনের কথা ও ষড়যন্ত্রও কুরআনে বিবৃত করা হয়েছে।

৩. ১. ১. ৬. জ্ঞান-বিজ্ঞানের অজানা তথ্য

কুরআনের অলৌকিত্বের ষষ্ঠ বিষয় হলো, কুরআনে এমন সব জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বিষয়াবলি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলি ব্যক্তিগতভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না এবং সাধারণভাবে আরবগণও জানত না। বিশেষত, শরীয়তের বিধিবিধান, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ ও যুক্তি, ইতিহাস, উপদেশ-ওয়ায, প্রজ্ঞাময় বাণী, পরকালীন জগতের সংবাদ, উন্নত আচরণ ও মহান চরিত্রের প্রশংসা ইত্যাদি। কুরআন কারীম থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রসারিত হয়েছে, এগুলির মধ্যে রয়েছে, ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাস বিষয়ক জ্ঞান-শাস্ত্র, ফিকহ ও বিধিবিধান বিষয়ক জ্ঞান-শাস্ত্র, আচরণ, চরিত্র ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-শাস্ত্র ইত্যাদি।[167]

৩. ১. ১. ৭. বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা বিমুক্তি

---

[167] আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রমাণ করেছে যে, কুরআন এমন সব বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রদান করেছে যা শতবর্ষ পূর্বেও কোনো বৈজ্ঞানিক জানতেন না। বিস্তারিত জানতে দেখুন: Maurice Bucaille, The Bible, The Qur'an and Science; A. Ibrahim & others, A Brief Guide To Understanding Islam.

কুরআনের অলৌকিকত্ব ও আল্লাহর বাণী হওয়ার **(Divinity)** সপ্তম প্রমাণ স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য থেকে বিমুক্তি।[168] কুরআন একটি বৃহৎ গ্রন্থ যাতে অনেক জ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষত, একবারে তা প্রদত্ত হয় নি; বরং সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ও পরিস্থিতিতে এর বিভিন্ন অংশ অবতরণ করা হয় এবং বিভিন্ন সূরার মধ্যে সংযুক্ত হয়। এরূপ একটি গ্রন্থ যদি আল্লাহর বাণী না হয়ে কোনো মানুষের রচিত হতো, তবে নিঃসন্দেহে তাতে বিভিন্ন স্ববিরোধিতা ও বৈপরীত্য দেখা যেত। সুদীর্ঘ সময়ে অবতীর্ণ এরূপ একটি বৃহদাকার গ্রন্থ বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হতে পারে না। কুরআনে এরূপ স্ববিরোধিতা, বৈপরীত্য ও অসংগতি না থাকা প্রমাণ করে যে, তা আল্লাহর বাণী। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন: "তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না? তা

---

[168] বাইবেলে কোথাও আমরা দেখতে পাই যে, যীশু অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল মানুষ। আবার কোথাও দেখতে পাই যে, তাকে অস্বাভাবিক বদরাগি ও কঠোর মানুষরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এমনকি অস্বাভাবিক ক্রোধে তিনি নিরপরাধ বৃক্ষকে অভিশাপ দিয়ে মেরে ফেলছেন, নিজের প্রিয়তম শিষ্যকে গালিগালাজ করছেন। নিঃসন্দেহে এই চিত্রায়ণ স্ববিরোধী। পক্ষান্তরে ২৩ বৎসরের দীর্ঘ সময়ে অবতীর্ণ কুরআনে এক্ষেত্রে অলৌকিক সুসামঞ্জস্যতা দেখতে পাই। ঈসা (আ)-কে সর্বদা সংবেদনশীল, ক্ষমাশীল ও দয়ালু রূপে দেখতে পাই। মূসা (আ)-কে দৃঢ়চেতা, দ্রুত উত্তেজিত ও দ্রুত সংযত দেখতে পাই।

যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে আসত তবে তারা তাতে অনেক অসংগতি পেত।"[169]

উপর্যুক্ত ৭টি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন: "এ গ্রন্থ তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন, তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"[170]

অর্থাৎ আকারে এত বড় হওয়া সত্ত্বেও সর্বত্র এরূপ অত্যাশ্চার্য উচ্চাঙ্গের সাহিত্যমান, অলঙ্কার ও রচনাশৈলী সংরক্ষণ করা, এভাবে ভবিষ্যদ্বাণী, অদৃশ্য বিষয়ে সংবাদ প্রদান করা, বিভিন্ন জ্ঞানের সমন্বয় করা এবং স্ববিরোধিতা থেকে বিমুক্ত থাকা কোনো মানুষের রচিত গ্রন্থে হতে পারে না। আসমান-যমিনের অণু-পরমাণু পর্যন্ত সকল রহস্য যিনি জ্ঞাত আছেন তার অবতীর্ণ গ্রন্থই এরূপ হতে পারে।

৩. ১. ১. ৮. চিরন্তন অলৌকিকত্ব

কুরআনের অলৌকিকত্বের অষ্টম দিক হলো, তা তার অলৌকিকরূপেই সংরক্ষিত রয়েছে, সেভাবেই তা সর্বত্র পঠিত হচ্ছে। অন্য কোনো নবী-ভাববাদীর অলৌকিক চিহ্ন সেরূপ নয়। তাদের তিরোধানের সাথে সাথে সেগুলি চলে গিয়েছে এবং অতীত সংবাদে পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআন তার অবতারণের সময় থেকে আজ পর্যন্ত অবিকল তার অলৌকিক সত্ত্বায় সংরক্ষিত রয়েছে।

---

[169] সূরা : ৪ নিসা, ৮২ আয়াত।

[170] সূরা : ২৫ ফুরকান, ৬ আয়াত।

সকল যুগে সকল দেশে ও জনপদে ভাষাবিদ ও কবিসাহিত্যিকগণ বিদ্যমান ছিলেন ও আছেন। তাদের মধ্যে ইসলাম বিরোধী মানুষেরও অভাব নেই। ইসলামের বিপক্ষে কঠোর অবস্থান গ্রহণকারীর সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু কেউই এখন পর্যন্ত কুরআনের অলৌকিকত্ব খণ্ডন করতে বা এর মুকাবিলা করতে সক্ষম হন নি। কিয়ামত পর্যন্ত এভাহে তার অলৌকিকত্ব চিরঞ্জীব থাকবে।[171]

৩. ১. ১. ৯. ক্লান্তিহীন প্রেমের স্থায়ী উৎস

কুরআনের অলৌকিত্বের নবম দিক হলো, এর পাঠক বিরক্ত হন না এবং শ্রোতা ক্লান্ত হন না। বারংবার পাঠের বা শ্রবণের ফলে ক্লান্তির পরিবর্তে ভালবাসাই বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য গ্রন্থ বা রচনা যত উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক মানেরই হোক না কেন, বারংবার পড়তে পড়তে বা শুনতে শুনতে ক্লান্তি ও বিরক্তি এসে যায়। কিন্তু কুরআন এক অপার্থিব প্রশান্তি এনে দেয় পাঠক ও শ্রোতার হৃদয়ে। এমনকি যে

---

[171] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে যেমন কুরআন শুনে বা পড়ে সকলেই হতবাক হয়েছেন, কেউ জিদ বা স্বার্থের কারণে বিভিন্ন ব্যাখ্যা করে সত্যকে এড়িয়ে গিয়েছেন এবং কেউ সত্যকে স্বীকার করে ঈমান গ্রহণ করেছেন, বর্তমান যুগেও ঠিক একই অবস্থা বিদ্যমান। কুরআন পড়ে ঈমান গ্রহণকারী বা অন্তত এর অলৌকিকত্ব স্বীকারকারী বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, সমাজবিদ, ঐতিহাসিক, ধর্মগুরু, পাদরি ও সাধারণ মানুষের সংখ্যা বর্তমান যুগেও অগণিত। শত বিরোধিতা ও অপপ্রচারের পরেও প্রতি বৎসরই হাজার হাজার মানুষ কুরআনের অলৌকিকত্বে ইসলাম গ্রহণ করছেন।

পাঠক বা শ্রোতা এর অর্থ বুঝতে পারছেন না তিনিও যদি একটু আবেগ ও মনোযোগ দিয়ে তা পাঠ বা শ্রবণ করেন তবে তিনি হৃদয়ে এক অপূর্ব-অপার্থিব তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করেন।

৩. ১. ১. ১০. হৃদয়ঙ্গম ও মুখস্ত করা সহজ

কুরআনের অলৌকিকত্বের অন্যতম দিক হলো, শিক্ষার্থীর জন্য তা অতি সহজ হয়ে যায়। সহজেই তা মুখস্থ করা যায়। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য?"[172] এমনকি ছোট্ট ছোট্ট শিশুরাও অল্প সময়ের মধ্যে সহজেই এ বৃহৎ গ্রন্থটি মুখস্থ করে ফেলে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ থেকে সকল যুগে, এবং বর্তমান যুগে প্রতিটি মুসলিম সমাজ বা জনপদে অগণিত হাফিযে কুরআন বিদ্যমান, যারা পূর্ণ কুরআন মুখস্থ রেখেছেন। যাদের যে কোনো একজনের স্মৃতির উপর নির্ভর করে কুরআন কারীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ বিশুদ্ধভাবে লিখে নেওয়া যায়। শব্দের পরিবর্তন বা ভুল তো দূরের কথা, স্বরচিহ্ন, বিভক্তিচিহ্ন বা যের-যবর-পেশ ইত্যাদি হারাকাতেও সামান্যতম ভুল হবে না।

[172] সূরা: ৫৪ কামার, ১৭, ২২, ৩২, ৪০ আয়াত।

পক্ষান্তরে বিশ্বের কোথাও একজন খৃস্টানও পাওয়া যাবে না যিনি পুরো বাইবেল মুখস্ত রেখেছেন। পুরো বাইবেল বা পুরাতন ও নতুন নিয়মের সকল পুস্তক মুখস্ত করা তো অনেক দূরের কথা, শুধু নতুন নিয়ম বা সুসমাচারগুলি মুখস্ত করেছেন এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না। এটি ইয়াহূদী-খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ ও ইসলামের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একটি সহজবোধগম্য পার্থক্য ও কুরআন কারীমের অলৌকিকত্বের প্রশ্নাতীত একটি প্রমাণ, যে কোনো বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষও তা অনুভব করতে পারেন।

৩. ১. ২. কুরআন বিষয়ক তিনটি প্রশ্ন

৩. ১. ২. ১. সাহিত্যিক অলৌকিকতব

প্রথম প্রশ্ন হলো, সাহিত্য ও আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যকে আমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অলৌকিক চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করা হলো কেন?

বিভিন্ন যুগে নবীদেরকে তাদের যুগের চাহিদা অনুসারে অলৌকিক চিহ্নাদি প্রদান করা হয়। যুগের মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও উন্নতি বেশি সে যুগের নবীকে সেই জাতীয় অলৌকিক নিদর্শন প্রদান করা হয়। মানুষেরা তাদের মানবীয় বুদ্ধি ও যোগ্যতা দিয়ে উক্ত বিষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে অনুভব করতে পারে যে, তাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান অনুসারে কোনো মানুষের পক্ষে উক্ত পর্যায় অতিক্রম করা সম্ভব নয়। যখন সেই পর্যায় ও সীমা অতিক্রান্ত

কোনো বিষয় তারা দেখতে পান তখন সহজেই সে বিষয়ের অলৌকিকত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। তারা বুঝতে পারেন যে, বিষয়টি মানবীয় নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত।

মূসা আলাইহিস সালাম-এর সময়ে মিশরীয়দের মধ্যে যাদুর চর্চা ছিল খুবই বেশি। এ বিদ্যায় তারা বিশেষ অগ্রগতি ও পূর্ণতা লাভ করে। এ সকল শীর্ষস্থানীয় যাদুকর যখন দেখলেন যে, মূসার লাঠির প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে সত্যিকারে সাপে পরিণত হলো এবং তাদের লাঠিগুলি প্রকৃতপক্ষেই গলাধঃকরণ করল তখন তারা বুঝতে পারল যে, মূসার কর্ম যাদু নয়, বরং যাদুর সর্বোচ্চ সীমার উর্দ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত অলৌকিক একটি বিষয়। একারণে তারা ঈমান গ্রহণ করে।

ঈসা আলাইহিস সালাম-এর যুগে চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি ঘটে। মানুষ এতে আগের চেয়ে অধিক যোগ্যতা অর্জন করে। তারা যখন দেখল যে, তিনি মৃতকে জীবিত করছেন, জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করছেন, তখন তারা বুঝতে পারল যে, মানবীয় চিকিৎসা বিদ্যা দিয়ে তা কখনোই সম্ভব নয়, কাজেই তা মানবীয় নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত অলৌকিক চিহ্ন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের মানুষেরা কাব্য, সাহিত্য ও সাহিত্যিক অলঙ্কারের ক্ষেত্রে উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করে। এ সকল বিষয়ে অহঙ্কার ও প্রতিযোগিতা তাদের

মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মধ্যে তাঁর অলৌকিক চিহ্ন হিসেবে কুরআনকে উপস্থাপন করলেন এবং কবি-সাহিত্যিকগণ এর মুকাবিলা ও প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম হলেন, তখন সকলেই বুঝতে পারলেন যে, তা নিশ্চিতরূপেই আল্লাহর বাণী।[173]

---

[173] সাহিত্য ও অলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কুরআনকে কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম অলৌকিক চিহ্ন হিসেবে দেওয়া হলো, এর ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার যা বলেছেন তা তৎকালীন যুগের প্রেক্ষাপটে খুবই বাস্তব কথা। পাশাপাশি আমরা একথাও অনুভব করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশ্বনবী ও সর্বকালের সকল মানুষের জন্য প্রেরিত রাসূল হওয়ার জন্য এটি ছিল অত্যন্ত জরুরী বিষয়। এক্ষেত্রে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমত, পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের অলৌকিক চিহ্ন (miracle) ছিল তাদের সমসাময়িকদের জন্য। তারা যেমন শুধু তাদের যুগের মানুষদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তেমনি তাদের অলৌকিক চিহ্নও ছিল শুধু তাদের যুগের মানুষদের জন্য। তাদের তিরোধানের পরে তা 'সংবাদে' পরিণত হয়েছে। একজন খৃস্টান দাবি করতে পারেন যে, যীশু মৃতকে জীবিত করতেন। কিন্তু খৃস্ট সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিকে তিনি তা দেখাতে পারবেন না। শুধু তার বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু 'সংবাদ' বলবেন। এমনকি এ সকল অলৌকিকত্বের পক্ষে ইতিহাস থেকেও কিছু তথ্য দিতে পারবেন না। ঐতিহাসিকভাবে যীশুর অস্তিত্বই প্রমাণিত নয়। যীশু নামে কোনো ব্যক্তি যিরূশালেমে ধর্মপ্রচার করেছেন এরূপ কোনো তথ্যই তাঁর সমসাময়িক কোনো ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন নি, তাঁর অলৌকিকত্বের স্বীকৃতি তো অনেক দূরের কথা। অন্যান্য নবীদের অলৌকিত্বের অবস্থাও একই। পক্ষান্তরে

৩. ১. ২. ২. ক্রমান্বয়ে অবতরণ

কুরআন জীবন্ত ও অনন্ত অলৌকিক চিহ্ন। যে কোনো যুগে যে কোনো মুসলিম ইসলাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী ব্যক্তির সামনে কুরআনকে অলৌকিক চিহ্ন হিসেবে পেশ করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, নবী-রাসূলদের অলৌকিক চিহ্ন বা মুজিযার উদ্দেশ্য হলো আগ্রহী ব্যক্তিকে বিশ্বাসের পথে অনুপ্রাণিত করা। যীশুর মৃতকে জীবিত করা, মোশির লাঠিকে সাপ বানানো ইত্যাদি কর্ম তৎকালীন কোনো কোনো মানুষকে বিশ্বাসের পথে অনুপ্রাণিত করলেও তাদের তিরোধানের পরে কেউ আর তা দেখে বিশ্বাসী হন না। পক্ষান্তরে কুরআনের অলৌকিকত্ব চিরস্থায়ী। সকল যুগেই এমন অনেক মানুষ পাওয়া যায় যারা কোনোরূপ প্রচার ছাড়াই শুধু কুরআন পাঠ করে তার অলৌকিকত্ব অনুধাবন করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অনেকে ইসলাম গ্রহণ না করলেও কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি পর্যালোচনা করে কুরআনের অলৌকিকত্ব স্বীকার করেছেন। তৃতীয়ত, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণকে যে সকল অলৌকিকত্ব বা মুজিযা প্রদান করা হয়েছিল সেগুলি ছিল মূর্ত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। পক্ষান্তরে কুরআনের অলৌকিকত্ব গ্রন্থভিত্তিক হওয়াতে তা বিমূর্ত ও জ্ঞানবুদ্ধিবৃত্তিক। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতশীল বিশ্বের সর্বজনীন ধর্মগ্রন্থ হওয়ার বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বিদ্যমান। চতুর্থত, সকল ধর্মের ভিত্তিই হলো 'আল্লাহর বাণী' বা ধর্মগ্রন্থ। বিশ্বজনীন ধর্মের ধর্মগ্রন্থের সংরক্ষণতা অত্যাবশ্যক। কুরআনের সাহিত্যিক অলৌকিকত্বের ফলে তা কখনো বিকৃত করা সম্ভব হয় নি। একদিকে যেমন অগণিত মানুষ সহজেই তা মুখস্থ রাখতে পেরেছে। অন্যদিকে কেউই এরমধ্যে কোনো সংযোগ করতে সক্ষম হয়নি। পঞ্চমত, কুরআনের ভাষা ও সাহিত্যগত অলৌকিকত্বের কারণে সকল মানুষের কাছে তা সহজপাঠ্য ও সহজবোধ্য। এ হলো তার বিশ্বজনীনতার বিশেষ দিক।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, কুরআন একবারে একত্রে অবর্তীণ না হয়ে অল্প অল্প করে বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হলো কেন?

এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে বলে বুঝা যায়:

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ও তার যুগের অধিকাংশ মানুষ ছিলেন উম্মী বা নিরক্ষর। একবারে পুরো কুরআন অবতীর্ণ হলে সে যুগের মানুষদের জন্য একবারে তা নির্ভুলভাবে মুখস্থ করা কষ্টকর হয়ে যেত। হয়তবা তারা মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করার ব্যাপারে ঢিলেমি করে লিখিত পাণ্ডুলিপির উপরেই বেশি নির্ভর করতেন। এতে কুরআনের নির্ভুল সংরক্ষণ ব্যাহত হতো। অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে সাহাবীগণ অতি সহজে পুরো কুরআন ক্রমান্বয়ে মুখস্থ করেছেন। পাশাপাশি তাঁরা তা লিখে রাখলেও সেই প্রথম যুগ থেকেই কুরআন হৃদয়ে ধারণ ও মুখস্থ করার রীতি মুসলিম জাতির মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

(২) কুরআনের অনেক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে বিশেষ প্রেক্ষাপটে, বিশেষ সমস্যার সমাধানে, বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে বা বিশেষ বিধান বর্ণনায়। যদি তা একবারে অবতীর্ণ হতো তাহলে এ সকল বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতের সম্পৃক্তি বা সংশ্লিষ্টতা অত সহজে বোধগম্য হতো না। ক্রমান্বয়ে অবর্তীণ হওয়াতে এর প্রভাব বেশি হয়েছে এবং অনুধাবন সহজতর হয়েছে।

(৩) কুরআন একবারে অবতীর্ণ হলে ইসলামের সকল বিধানই একত্রে অবতীর্ণ হতো, এতে ইসলামের বিধিবিধান পালন করা তৎকালীন সমাজের নওমুসলিমদের জন্য কষ্টকর হয়ে যেত। অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে, বিশেষত আদেশ নিষেধ ও কর্ম জাতীয় বিধানাবলি অল্প অল্প করে ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে তা পালন করা সহজ হয়।

(৪) এভাবে বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঝে মাঝেই জিবরীল আলাইহিস সালাম-কে দেখতে পেতেন। এতে তাঁর অন্তকরণ তৃপ্তি ও দৃঢ়তা লাভ করত। নবুয়তের দায়িত্ব পালনে ধৈর্যধারণের ও মানুষদের দেওয়া কষ্ট মেনে নেওয়ার প্রেরণা নবায়িত হতো।

(৫) কুরআন এভাবে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হওয়ায় কুরআনের অলৌকিকত্বের প্রমাণ আরো বেশি জোরদার হয়েছে। কুরআন অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রথম থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। প্রতিবারে অবতীর্ণ কুরআনই তাদের প্রতি নতুন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। প্রতিবারেই তারা অপারগ হয়েছে। এভাবে তাদের অসহায়ত্ব ও পরাজয় বারংবার প্রমাণিত হয়েছে। আরো প্রমাণিত হয়েছে যে,

প্রতিবারের ছোট্ট অংশের অনুকরণে যখন তারা অক্ষম হয়েছে, তখন পূর্ণ কুরআনের অনুকরণ তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়।[174]

৩. ১. ২. ৩. বিষবস্তুর পুনরাবৃত্তি

তৃতীয় প্রশ্ন, তাওহীদ বা একত্ববাদ, আখিরাত বা পরজগতের কথা, নবীগণের কাহিনী ইত্যাদি বিষয় কুরআনে বারংবার উল্লেখ করা হলো কেন?

(১) পুনরাবৃত্তি বিষয়ের গুরুত্ব বুঝায়। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলের জন্যই এ সকল বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবনে পুনরাবৃত্তির প্রভাব খুবই শক্তিশালী।

(২) কুরআনের অলৌকিকত্বের একটি দিক হলো সাহিত্যিক মান। এ সাহিত্যিক মানের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদেরকে কুরআনের অনুরূপ কোনো বাণী বা বক্তব্য পেশ করার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। এদিক থেকে কাহিনীসমূহের পুনরাবৃত্তি কুরআনের অলৌকিকত্ব সুনিশ্চিত করে। কারণ একই কাহিনী কুরআনে কখনোই একই শব্দে ও বাক্যে পুনরাবৃত্তি করা হয়

---

[174] একবারে লেখা একটি বইয়ের সাহিত্যিক মান ও তথ্যের সমন্বয় রক্ষা করা যেভাবে সম্ভব, দীর্ঘ সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে লেখা একটি বইয়ে তা সম্ভন নয়। কিন্তু কুরআন এভাবে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তার অলৌকিক ভাষাশৈলী ও তথ্যের সমন্বয় রক্ষিত হয়েছে। বিষয়টি তার অলৌকিকত্ব আরো জোরালোভাবে প্রমাণ করে।

নি। সাধারণত মানুষ একই বিষয় বিভিন্ন ভাবে বললে সকল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মান রক্ষা করতে পারে না, কিন্তু কুরআনে তা রক্ষা করা হয়েছে।

(৩) এরূপ পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কাফিরদের ওযরখাহির পথ রোধ করা হয়েছে। তারা বলতে পারত যে, যে বিষয়ে কুরআন আলোচনা করেছে সে বিষয়ের সবচেয়ে উন্নত শব্দ ও শৈলী কুরআন ব্যবহার করে ফেলেছে। এখন আমরা সে বিষয় অন্য শব্দে বললে একই মানের হবে না। অথবা তারা বলতে পারত যে, এক এক সাহিত্যিক একেক রচনাশৈলীতে অভ্যস্ত। কেউ দীর্ঘ বর্ণনায় অভ্যস্ত, কেউবা সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় অভ্যস্ত। কুরআন যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে সে পদ্ধতিতে আমরা অভ্যস্ত নই, বরং আমরা অন্য পদ্ধতিতে অভ্যস্ত। অথবা তারা বলতে পারত যে, গল্প-কাহিনী উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ভাষাশৈলী ও আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের সুযোগ সীমিত। সৌভাগ্যক্রমে একবার কুরআন তা করতে পেরেছে। কিন্তু কুরআনে একই বিষয় বিভিন্ন শব্দে, বিভিন্ন রচনাশৈলীতে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করার কারণে তাদের এ সকল ওযরখাহির পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

(৩) কাফির ও মুনাফিকগণ সদাসর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কষ্ট ও যাতনা প্রদান করত। এতে তিনি বেদনা অনুভব করতেন ও তাঁর অন্তর সংকুচিত হতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন: "আমি তো জানি, তারা যা বলে তাতে তোমার

অন্তর সংকুচিত হয়।”[175] এজন্য আল্লাহ তাঁর অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন সময়ে নবী-রাসূলদের কাহিনী বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁর নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করতেন। এতে তিনি প্রশান্তি ও প্রেরণা লাভ করতেন। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন: “রাসূলদের এ সকল বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণনা করছি, যদ্বারা আমি তোমার চিত্তকে দৃঢ় করি, এর মাধ্যমে তোমার নিকট এসেছে সত্য এবং মুমিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধান-বাণী।”

(৫) মুসলিমগণও এভাবে কাফির ও মুনাফিকগণ কর্তৃক যাতনা ও কষ্ট পেতেন। এছাড়া অনেকে নতুন ইসলাম গ্রহণ করতেন। অনেক সময় কাফিরদেরকে সতর্ক করার দরকার হতো। এ সকল কারণে বিভিন্ন সময়ে একই বিষয় বিভিন্ন আঙ্গিকে নাযিল করা হয়েছে। একই গল্পের মধ্যে অনেক বিষয় থাকে। কুরআনে একই কাহিনী যখন বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এভাবে প্রত্যেক স্থানের আলোচনায় নতুন শিক্ষা রয়েছে।[176]

---

[175] সূরা : ১৫ হিজর, ৯৭ আয়াত।

[176] কুরআন শুধু ধর্মগুরু বা তাত্ত্বিকদের জন্য ‘নিয়মপুস্তক’ নয়। উপরন্তু তা প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য সহজলভ্য আত্মিক প্রেরণার মূল উৎস। প্রত্যেক বিশ্বাসীই তা নিয়মিত পাঠ করবেন। সালাতের মধ্যে, সালাতের বাইরে, মুখস্থ অথবা দেখে দেখে তিনি পাঠ করবেন। যেখান থেকেই কিছুটা তিনি পাঠ করেন

৩. ১. ৩. কুরআন প্রসঙ্গে পাদরিগণের দুটি আপত্তি

৩. ১. ৩. ১. ভাষার উচ্চাঙ্গতা অলৌকিকত্বের অকাট্য প্রমাণ নয়

কুরআন প্রসঙ্গে খৃস্টান পাদরি ও প্রচারকগণ যে সকল আপত্তি ও বিভ্রান্তি প্রচার করেন তন্মধ্যে অন্যতম দুটি বিষয়। প্রথমটি হলো কুরআনের সাহিত্যিক উচ্চাঙ্গতাকে অলৌকিকতার প্রমাণ হিসেবে স্বীকার না করা।

তাঁরা বলেন: আমরা একথা স্বীকার করি না যে, কুরআনের ভাষা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সাহিত্য ও আলঙ্কারিক সুষমায় মন্ডিত যা স্বাভাবিক সাহিত্য মানের উর্দ্ধে। যদি তা আমরা স্বীকারও করি, তবে তা কুরআনের অলৌকিকত্বের জন্য পরিপূর্ণ প্রমাণ বলে গণ্য হবে না, বরং অসম্পূর্ণ প্রমাণ বলে গণ্য হবে। কারণ আরবী ভাষায় যাদের পরিপূর্ণ দখল আছে শুধু তারাই এ অলৌকিকত্ব বুঝতে পারবেন।

সেখানেই তিনি বিভিন্ন প্রকারের আত্মিক প্রেরণা ও শিক্ষা লাভ করেন। যদি প্রত্যেক ঘটনা বা বিষয় একবার মাত্র এক স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হতো, তবে সকল বিশ্বাসীর পক্ষে এভাবে বিভিন্ন প্রকার প্রেরণা লাভ করা সহজ হতো না। আর কুরআনে একই বিষয়ে একাধিকবার বলা হলে দুই স্থানে একই কথা বলা হয় নি, বরং শব্দ, বাক্য ও অর্থের ভিন্নতার মধ্য দিয়ে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্য যিনি পুরো কুরআন পাঠ করেন তিনিও হৃদয়ে নতুন নতুন প্রেরণা অনুভব করেন।

এছাড়া এতে প্রমাণিত হবে যে, গ্রীক, ল্যাটিন ও অন্যান্য ভাষায় সর্বোচ্চ সাহিত্যমানের গ্রন্থগুলি সবই আল্লাহ বাণী। সর্বোপরি অনেক সময় বাতিল, অন্যায় ও ঘৃণিত অর্থও সর্বোচ্চ সাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

আপত্তির পর্যালোচনা ও বিভ্রান্তির অপনোদন:

প্রথমত: পাদরিদের প্রথম কথা "আমরা একথা স্বীকার করি না যে, কুরআনের ভাষা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সাহিত্য ও আলঙ্কারিক সুষমায় মন্ডিত যা স্বাভাবিক সাহিত্য মানের উর্দ্ধে" ভিত্তিহীন গলাবাজি ও সুস্পষ্ট সত্যকে বুঝার পরেও গায়ের জোরে অস্বীকার করার চেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। পূর্বের আলোচনা থেকে পাঠক তা জানতে পেরেছেন।[177]

---

[177] খৃস্টানগণ, বিশেষত, আরব খৃস্টানগণ, যাদের সংখ্যা প্রায় দুই কোটি, কুরআনের ভাষার অভাবনীয় যাদুকরি প্রভাবের কথা খুব ভালভাবেই উপলব্ধি করেন। শুধু ভাষার সৌন্দর্য অর্জন ও হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য অনেক আরব খৃস্টান কুরআন পাঠ করেন। অনেকে কুরআনের অনেক অংশ মুখস্থও করেন। এজন্য আরবীয় খৃস্টান পন্ডিতগণ দীর্ঘ কয়েক যুগ চেষ্টা করে কুরআনের শব্দ, শব্দবিন্যাস, আয়াত বিন্যাস সব কিছু চুরি করে অবিকল কুরআনী শৈলীতে একটি আরবী বাইবেল লিখেছেন। এমনকি প্রত্যেক 'অধ্যায়ের' পূর্বে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখেছেন। বিভিন্ন খৃস্টান বেতার কেন্দ্র থেকে এই বাইবেল কুরআনের পদ্ধতিতে 'কারিয়ানা' তিলাওয়াত করা হয়। এত কিছুর পরেও যে কোনো সাধারণ আরব খৃস্টানও বুঝতে পারেন যে কুরআনের

দ্বিতীয়ত: তাদের দ্বিতীয় কথা "আরবী ভাষায় যাদের পরিপূর্ণ দখল আছে শুধু তারাই এই অলৌকিকত্ব বুঝতে পারবেন"- কথাটি ঠিক হলেও এতে প্রমাণিত হয় না যে, তা কুরআনের অলৌকিকত্বের অসম্পূর্ণ প্রমাণ।

বস্তুত, কুরআনের সাহিত্যিক ও অলঙ্কারিক অলৌকিকত্ব ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকদের নিকটেই সর্বোচ্চ পর্যায়ে উদ্ভাসিত। কুরআনের মুকাবিলায় তাদের অক্ষমতা, অপারগতা ও তাদের স্বীকারোক্তি তা প্রমাণ করেছে। আরবী ভাষাভাষী মানুষেরা নিজেদের স্বভাবজাত রুচি দিয়ে কুরআনের অলৌকিক ভাষাশৈলী অনুভব করেন। অন্যভাষার পণ্ডিতগণও আরবী ভাষার সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে পান্ডিত্য অর্জন করলে তা বুঝতে পারেন। আর সকল জাতি ও ধর্মের সাধারণ মানুষেরা হাজার হাজার আরবী ভাষী মানুষ ও অন্যান্য জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিতের সাক্ষ্য থেকে তা জানতে পারেন। এভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ ভাষাশৈলী কুরআনের অলৌকিক বৈশিষ্টের অসম্পূর্ণ প্রমাণ নয়, বরং একটি পরিপূর্ণ প্রমাণ। অনেক কিছুই

যাদুকরি প্রভাব এর মধ্যে নেই। কোনো আরব খৃস্টান আরবী ভাষার যোগ্যতা অর্জনের জন্য এ বাইবেল পাঠ করেন না, পড়ে মজাও পাওয়া যায় না। বরং এতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরআন সত্যই অলৌকিক এবং এর ভাষা ও শৈলী অননুকরণীয়। দেখুন, Ahmed Deedat, The Choice: Islam and Christiaanity, Vol-1, page 227-228.

প্রমাণ করে যে, কুরআন আল্লাহর বাণী। সেগুলির মধ্যে এটিও একটি।

মুসলিমগণ দাবি করেন না যে, শুধু সাহিত্যমানই কুরআনের অলৌকিকত্বের একমাত্র প্রমাণ। অনুরূপভাবে তাঁরা দাবি করেন না যে, শুধু কুরআনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একমাত্র অলৌকিক চিহ্ন। বরং মুসলিমগণ দাবি করেন যে, বহু বিষয় কুরআনের অলৌকিকত্ব প্রমাণ করে, যেগুলির একটি বিষয় হলো অলৌকিক সাহিত্যমান। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ বহুসংখ্যক অলৌকিক চিহ্ন প্রদান করেছিলেন, কুরআন সেগুলির একটি। এ অলৌকিকত্ব বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত। বিরোধীদের অক্ষমতাও প্রমাণিত। কুরআন অবতীর্ণ হওয়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কেউই এর মুকাবিলায় একটি ছোট্ট সূরাও পেশ করতে পারেন নি।

তৃতীয়ত: পাদরিগণ বলেছেন: “এতে প্রমাণিত হবে যে, গ্রীক, ল্যাটিন ও অন্যান্য ভাষায় সর্বোচ্চ সাহিত্যমানের গ্রন্থগুলি সবই আল্লাহ বাণী।” তাদের এ কথাটির মধ্যে অনেক ফাঁক রয়েছে। কারণ:

(১) পূর্ববর্তী আলোচনায় কুরআনের মধ্যে ভাষা ও সাহিত্যমানের যে বিভিন্ন দিক আমরা দেখেছি এরূপ বিভিন্নমুখি সাহিত্যমান গ্রীক,

ল্যাটিন বা অন্যান্য ভাষার কোনো পুস্তকের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই না।

(২) এ সকল পুস্তকের লেখকগণ তাদের নিজেদের ভাববাদিত্ব বা তাদের পুস্তকের অলৌকিকত্ব দাবি করেন নি।

(৩) এ সকল ভাষার অন্যান্য লেখক ও সাহিত্যিক সে সকল পুস্তকের অনুরূপ পুস্তক রচনা করতে অক্ষম হয়েছেন বলেও প্রমাণিত হয় নি।

যদি কেউ এ সকল পুস্তকের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বিষয় তিনটি দাবি করেন তবে তাকে তা প্রমাণ করতে হবে। তাকে গ্রীক, ল্যাটিন বা অন্য কোনো ভাষার কোনো একটি পুস্তক সম্পর্কে প্রমাণ করতে হবে যে, উক্ত পুস্তকটিতে বিভিন্নমুখি অলৌকিক সাহিত্যমান রয়েছে, উক্ত পুস্তকের লেখক তার অলৌকিকত্ব দাবি করেছিলেন এবং সে ভাষার সাহিত্যিকগণ তার চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় অক্ষম হয়েছিলেন। আর এ বিষয়গুলি প্রমাণ করতে না পারলে পাদরি সাহেবদের উপর্যুক্ত কথাটি ভিত্তিহীন ও অন্তসারশূন্য বাতিল কথা বলে গণ্য হবে।

আর এরূপ বিষয় দাবি ও প্রমাণ করতে হলে তাকে অবশ্যই কুরআনের ভাষায় ও দ্বিতীয় যে ভাষায় অনুরূপ গ্রন্থ বিদ্যমান বলে দাবি করছেন উভয় ভাষায় সুগভীর পান্ডিত্য অর্জন করতে হবে। আর প্রকৃতপক্ষে এরা কেউ নিজের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষার তেমন কিছুই জানেন না। অন্য ভাষার পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন ও

বহুবচনের মধ্যেও পার্থক্য করতে পারেন না। অন্য ভাষার বিভক্তি চিহ্নের পার্থক্যও করতে পারেন না। কাজেই কোনটি উচ্চমানের সাহিত্যকর্ম, কোনটি উচ্চতর তা তারা কিভাবে বুঝবেন!

তাঁদের ভাষাগত দুর্বলতার একটি নমুনা দেখুন। ভ্যাটিকানের পোপ অষ্টম উর্বানের (**Urban**)[178]-এর নির্দেশে সিরিয়ার প্রধান বিশপ সার্কিস হারূনী আরবী, গ্রীক, হিব্রু ও অন্যান্য ভাষায় অভিজ্ঞ বহুসংখ্যক পাদরি, সন্যাসী, পণ্ডিত ও ভাষাবিদকে একত্রিত করেন। তিনি তাদেরকে বাইবেলের আরবী অনুবাদটিকে পরিমার্জিত করতে দায়িত্ব দেন; কারণ আরবী অনুবাদটি অগণিত ভুলে ভরা ছিল। পোপের নির্দেশে ও বিশপের তত্ত্বাবধানে এ সকল পণ্ডিত প্রাণপন পরিশ্রম করে ১৬২৫ খৃস্টাব্দে বাইবেলের আরবী অনুবাদটি পরিমার্জন ও সংশোধন করে প্রকাশ করেন। কিন্তু এভাবে পরিপূর্ণ সংশোধন ও পরিমার্জনের পরেও এই অনুবাদের মধ্যে অগণিত ভুলভ্রান্তি থেকে যায়; কারণ ভুলভ্রান্তি খৃস্টীয় প্রকৃতির সাথে ওতপ্রোত জড়িত।

এজন্য তারা উপর্যুক্ত অনুবাদটির ভূমিকায় এ বিষয়ে ওযরখাহি পেশ করেন। তারা লিখেছেন: "অতঃপর আপনি এই অনুবাদের মধ্যে কিছু কথা এমন দেখবেন যা ভাষার নিয়মের বাইরে বরং

---

[178] পোপ অষ্টম উর্বান ১৫৬৮ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬২৩ খৃস্টাব্দে পোপ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৬৪৩/১৬৪৪ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ভাষার নিয়মনীতির উল্টো। কোথাও স্ত্রীলিঙ্গের স্থলে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে, কোথাও বহুবচনের স্থলে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে এবং কোথাও দ্বিবচনের স্থলে রয়েছে বহুবচন। কোথাও ভুল বিভক্তি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে: ইসমের মধ্যে যের বা যবরের স্থানে এবং ফি'লের মধ্যে জাযমের স্থলে পেশ ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও স্বরচিহ্নের স্থলে অতিরিক্ত বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া অনুরূপ অন্যান্য বিষয় দেখবেন। এর কারণ হলো খৃস্টানদের ভাষা সাদাসিদে। এজন্য এরূপ ভুলভ্রান্তি ভরা ভাষা তাদের বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়টি শুধু আরবী ভাষার ক্ষেত্রেই নয়, বরং ল্যাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ সকল ভাষাতেও ভাববাদী ও প্রেরিতগণ এবং পূর্ববর্তী ধর্মগুরুগণ ভাষার নিয়মনীতি বর্জন করতেন। কারণ, পবিত্র আত্মা ঐশ্বরিক শব্দের প্রশস্ততাকে ভাষার ব্যাকরণের সংকীর্ণ সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চান নি। এজন্য ভাষার বিশুদ্ধতা, সাহিত্যমান ও অলঙ্কার ছাড়াই তিনি ঐশ্বরিক রহস্যাবলি আমাদেরকে প্রদান করেছেন।"[179]

---

[179] মানব রচিত জাল গ্রন্থগুলির দুর্বলতা ও অক্ষমতা ঢাকতে কি অদ্ভুত যুক্তি!! কথাটির অর্থ হলো, পবিত্র আত্মা ঈশ্বর সৃষ্ট খাদ্যের প্রশস্ততাকে সুস্বাদু রান্নার মধ্যে সংকীর্ণ করতে চান নি। তাই তিনি কাঁচা খাদ্য গোবর মিষিয়ে পেশ করেছেন!! যেন খাদ্যের পুষ্টি পাওয়া যায় কিন্তু স্বাদের তৃপ্তি না মেলে!! খাদ্যের স্বাদ যেমন পুষ্টিকর খাদ্য সহজে ও তৃপ্তির সাথে গ্রহণ করতে সাহায্য করে,

চতুর্থত: পাদরিগণ বলেছেন, "অনেক সময় বাতিল, অন্যায় ও নিন্দনীয় অর্থও সর্বোচ্চ সাহিত্যিক ও আলঙ্কারিক ভাষায় প্রকাশ করা যায়"।

তাদের এ কথটি এখানে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। কুরআনের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনার কোনো অবকাশই নেই। কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কল্যাণময় ও প্রশংসনীয় কথায় পরিপূর্ণ। কুরআনের আলোচ্য বিষয়গুলি সবই প্রশংসিত ও কল্যাণময়। যেমন:

(১) আল্লাহর মহান গুণাবলি বর্ণনা করা এবং অক্ষমতা, অজ্ঞতা, অত্যাচার ইত্যাদি সকল ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা।

(২) বিশুদ্ধ একত্ববাদের প্রচার এবং সকল প্রকারের শিরক, বহু উপাস্য উপাসনা নিষেধ করা, এবং বিশেষ করে ত্রিত্ববাদ নিষেধ করা, যা শিরক ও বহু-ইশ্বরবাদিতার একটি প্রকাশ।

(৩) নবীগণের বা ভাববাদীগণের আলোচনা করা এবং মুর্তিপূজা, অবিশ্বাস ও অন্যান্য পাপ-অন্যায় থেকে তাঁদের পবিত্রতা বর্ণনা করা। নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রশংসা করা। নবীদেরকে যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের নিন্দা করা। সাধারণভাবে সকল নবীকে বিশ্বাস করার এবং বিশেষ করে যীশু খৃস্ট এবং মুহাম্মাদ

ভাষার বিশুদ্ধতা ও উচ্চাঙ্গতা তেমনি ঐশ্বরিক সত্যকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে সাহায্য করে। পবিত্র আত্মা কি সত্যকে দুঃসাধ্য করতে চান?

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর বিশ্বাস করার গুরুত্ব বর্ণনা করা।

(৪) চূড়ান্ত পরিণতিতে বিশ্বাসীগণ অবিশ্বাসীদের উপর বিজয়ী হবেন সে সম্পর্কে ওয়াদা করা।

(৫) পুনরুত্থান, পরকাল, পারলৌকিক জীবন, পুনরুত্থান দিবসে ধার্মিক ও অধার্মিকদের কর্মের ফলাফল প্রদান, জান্নাত- জাহান্নাম বা স্বর্গ ও নরকের কথা উল্লেখ করা। পার্থিব জগতের অস্থায়িত্ব ঘোষণা করা এবং জগৎমুখিতার নিন্দা করা। পারলৌকিক জীবনের প্রশংসা করা ও তার স্থায়িত্ব বর্ণনা করা।

(৬) ধর্মব্যবস্থার বৈধ ও অবৈধ, আদেশ নিষেধ ও পানাহার, ইবাদত-বন্দেগি, ব্যক্তিগত ও অন্যান্য সকল বিধিবিধান বর্ণনা করা।

(৭) আল্লাহর প্রেম ও আল্লাহর প্রিয় মানুষদের প্রেম অর্জনে উৎসাহ প্রদান। পাপী ও অধার্মিকদের সাহচর্য গ্রহণ থেকে নিষেধ করা।

(৮) সকল ক্ষেত্রে অন্তরের বিশুদ্ধতা ও শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দয়া লাভের জন্য কর্ম করার গুরুত্ব বর্ণনা করা। লোক দেখানো বা লোক শোনানো কর্ম বা মানুষের প্রশংসা লাভের জন্য কর্ম করার নিন্দা।

(৯) উত্তম আচরণ অর্জনের জন্য সাধারণভাবে ও বিস্তারিতভাবে উৎসাহ প্রদান করা, সদাচারণ ও উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির প্রশংসা করা। অসদাচারণ ও অসৎস্বভাবের নিন্দা করা।

(১০) আল্লাহর ভয়, আল্লাহর যিকর-স্মরণ ও ইবাদতের জন্য উৎসাহ ব্যঞ্জক উপদেশ ও আজ্ঞা প্রদান।

নিঃসন্দেহে জ্ঞান, বিবেক, যুক্তি ও সকল ধর্মের ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে এ বিষয়গুলি প্রশংসিত। এ সকল বিষয়ের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য এবং পাঠকের মনের গভীরে তাকে স্থায়ী আসন দেওয়ার জন্য কুরআনে এগুলি বারংবার বিভিন্ন আঙ্গিকে আলোচনা করা হয়েছে। এ সকল বিষয় যদি নিন্দনীয় হয়, তবে প্রশংসনীয় বিষয় কী হবে?

তবে লক্ষণীয় যে, ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেলের মধ্যে বহুল আলোচিত ও বারংবার বিভিন্ন আঙ্গিকে পুনরাবৃত্ত নিম্নোক্ত বিষয়গুলি কুরআনের মধ্যে পাওয়া যায় না:

(১) বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে যে, ভাববাদী লোট (লূ◌ুত আ) মদ পান করে মাতাল হয়ে তার কন্যাদ্বয়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। দেখুন: আদিপুস্তক ১৯/৩০-৩৮।

(২) বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র বা বড় ছেলে দায়ূদ উরিয়ের স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন এবং উরিয়কে কৌশলে হত্যা করেন। এরপর উক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করেন। দেখুন: ২ শমূয়েল ১১/১-২৭।

(৩) বাইবেলে আছে যে, হারোণ গোবৎসের প্রতিমা তৈরি করে তার পুজা করেন। দেখুন: যাত্রাপুস্তক ৩২/১-৬।

(৪) বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুলাইমান আলাইহিস সালাম শেষ জীবনে ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ্দ-মুশরিক হয়ে প্রতিমা পূজা করতে শুরু করেন এবং মুর্তিপূজার প্রচার প্রসারের জন্য মন্দিরাদি নির্মাণ করেন। দেখুন: ১ রাজাবলি ১১/১-১৩।

(৫) বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন ভাববাদী একান্তই হিংসাবশত অন্য একজন ভাববাদীকে ঈশ্বরের ভাববানী বা ওহীর নামে মিথ্যা কথা বলে ধোঁকা দেন এবং তার কথা বিশ্বাস করে প্রথম ভাববাদী ঈশ্বরের ক্রোধের মধ্যে নিপতিত হয়ে নিহত হন। দেখুন: ১ রাজাবলি ১৩/১-৩০।

(৬) ইস্রায়েল বা যাকোবকে (ইয়াকূব আ.) বাইবেলে ঈশ্বরের প্রথমজাত (**firstborn**) পুত্র বা বড় ছেলে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেলের সকল ভাববাদী বা সকল হিব্রু ভাববাদীর মূল পিতা তিনিই। বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বরের এ প্রথমজাত পুত্র বা বড় ছেলে ইস্রায়েল (ইয়াকূব আ)-এর পুত্র যিহূদা আপন পুত্রবধু তামর-এর সাথে ব্যভিচার করেন এবং এ ব্যভিচারের ফলে অবৈধ জারজ সন্তান 'পেরস' এর জন্ম হয়। দায়ূদ, শলোমন ও

যীশু- ঈশ্বরের এ তিন পুত্র[180] সকলেই এ যারজ সন্তানের বংশধর ছিলেন। দেখুন: আদিপুস্তক ৩৮/১২-৩০।

(৭) বাইবেলে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বরের এ প্রথমজাত পুত্র বা বড় ছেলে ইস্রায়েলের প্রথমজাত পুত্র বা বড় ছেলে পুত্র রূবেন তার পিতার 'বিলহা' নামের উপপত্নীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র ইস্রায়েল তার প্রথমজাত পুত্রের নিজ বিমাতার সাথে ব্যভিচার এবং চতুর্থ পুত্রের পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচারের সংবাদ জানার পরও তাদেরকে ঈশ্বরের বিধান অনুসারে শাস্তি প্রদান করেন নি। উপরন্তু ব্যভিচারী যিহূদাকে পরিপূর্ণ বরকত ও চিরস্থায়ী কল্যাণের জন্য আশীর্বাদ বা দুআ করেন। তিনি তাঁর পুত্রগণের মধ্যে এ যিহূদার জন্য সবচেয়ে বেশি দুআ করেন। যাত্রাপুস্তক ৪/২২-২৩; আদিপুস্তক ৩৫/২২, ৪৯/১-২৮।

(৮) আমরা দেখেছি যে, বাইবেলের বর্ণনানুসারে ঈশ্বরের আরেকজন প্রথমজাত পুত্র বা বড় ছেলে **(firstborn)** এবং জন্মদেওয়া পুত্র **(begotten son)** দায়ূদ আলাইহিস সালাম।

[180] ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি যে, বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে এরা তিনজনই ঈশ্বরের পুত্র, প্রথম জন ঈশ্বরের বড় ছেলে (firstborn) এবং স্বয়ং জন্মদেওয়া (begotten) ছেলে, দ্বিতীয় জন ঈশ্বরের ছেলে এবং তৃতীয়জন ঈশ্বরের একমাত্র জন্মদেওয়া ছেলে (only begotten son)। ঈশ্বরের এ তিন পুত্রই জারজ সন্তানের বংশধর।

বাইবেলের বর্ণনানুসারে তিনি নিজেই পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করতেন। এ ছাড়াও বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বরের এ বড় ছেলের (দায়ূদের) প্রিয় পুত্র তারই প্রিয় কন্যার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। ঈশ্বরের এ প্রথমজাত পুত্র তার পুত্র ও কন্যার ব্যভিচারের সংবাদ জানতে পারেন। মোশির ব্যবস্থা অনুসারে ব্যভিচারীর যে শাস্তি পাওনা সে শাস্তি তিনি তার পুত্র-কন্যাকে প্রদান করেন নি। দেখুন: গীতসংহিতা ২/৭, ৮৯/২৭, ২ শমূয়েল ১৩/১-৩৯।

(৯) খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে যীশু খৃস্টের ১২ জন প্রেরিতের মর্যাদা মোশি ও অন্য সকল ইস্রায়েলীয় ভাববাদীর চেয়েও বেশি। এ মহান মর্যাদার অধিকারী প্রেরিত শিষ্যদের একজন ছিলেন ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা (**Judas Iscariot**), যিনি অলৌকিক চিহ্নাদির অধিকারী প্রেরিত রাসূল ছিলেন[181]। এ মহান প্রেরিত একজন চোর ছিলেন। তার কাছে টাকার থলি থাকত এবং তাতে যা রাখা হতো তিনি তা চুরি করতেন।[182] এ মহান প্রেরিত শিষ্য মাত্র ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে তার ধর্ম বিক্রয় করে দেন। এ সামান্য অর্থের

---

[181] মথি ১০/১-৮; মার্ক ৩/১৪-১৫; লূক ৬/১৩।

[182] যোহন ১২/৬।

জন্য তিনি তার ঈশ্বরকে ইয়াহূদীদের হাতে তুলে দিতে রাযি হয়ে যান। ইয়াহূদীরা তার ঈশ্বরকে ধরে নিয়ে ক্রুশে বিদ্ধ করে।[183]

(১০) ইয়াহূদী মহাযাজক কায়াফা (**Caiaphas**) ঈশ্বরের একজন ভাববাদী (**prophet**) বা নবী ছিলেন বলে সুসমাচার লেখক যোহন সাক্ষ্য দিয়েছেন[184]। এ ভাববাদী যীশুকে মিথ্যাবাদী ও অবিশ্বাসী (কাফির) বলে ঘোষণা করেন, তাঁকে লাঞ্ছিত করেন এবং তাকে হত্যা করার রায় প্রদান করেন।[185] খৃস্টানদের বিশ্বাসানুসারে যীশুই ঈশ্বর (**God Incarnate**)। তাহলে কায়াফা ছিলেন যীশুরই একজন ভাববাদী। আর এ ভাববাদী স্বয়ং তার ঈশ্বরকে মিথ্যবাদী ও কাফির বলে ঘোষণা করলেন, তাকে লাঞ্ছিত করলেন এবং তাকে হত্যা করার রায় দিলেন!

এ ধরনের আরো অনেক নোংরা ও ঘৃণিত বিষয় বাইবেলের মধ্যে রয়েছে। খৃস্টান ধর্মগুরু, পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারকদের কাছে এগুলি সুপরিচিত। তাঁরা এ সকল কথা সঠিক, নির্ভুল ও ধর্মগ্রন্থের বাণী বলে বিশ্বাস করেন। এ সকল বিষয়কে তারা উচ্চাঙ্গের ভাবসম্পন্ন, সুন্দর, মহান, আত্মার খোরাক ও সুরুচিসম্পন্ন বিষয় বলে গণ্য করেন।

---

[183] মথি ২৬/১৪-১৬, ২৭/৩-৯; মার্ক ১৪/১০-১১; লূক ২২/৩-৬; যোহন ১৮/১-৫।

[184] যোহন ১১/৪৯-৫১।

[185] মথি ২৬/৫৭-৬৮; মার্ক ১৪/৫৩-৬৫; লূক ২২/৫৪-৭১; যোহন ১৮/১২-২৪।

সম্ভবত এ সকল “উচ্চাঙ্গের ভাবসম্পন্ন, সুন্দর ও মহান বিষয় (ব্যভিচার, অনাচার, অগম্য-গমন, মিথ্যা, ঈশ্বর ও ভাববাদীগণের নিন্দাজ্ঞাপক কথা, মূর্তিপূজা, বুদ্ধি বিরোধী কথা ইত্যাদি) যদি কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান থাকত তবে হয়ত খৃস্টান পাদরি ও যাজকগণ কুরআনকে ‘ঈশ্বরের বাণী’ **(God's Word)** বলে মেনে নিতেন। কিন্তু যেহেতু কুরআনের মধ্যে এ সকল ‘মহান’ বিষয় ও অনুরূপ বিষয়াদি আলোচিত হয় নি, সেহেতু তারা কুরআনকে ঈশ্বরের বাণী বলে মানতে পারছেন না।

৩. ১. ৩. ২. বাইবেল ও কুরআনের বৈপরীত্য

পাদরিগণ উত্থাপিত দ্বিতীয় আপত্তিতে তাঁরা বলেন: “অনেক স্থানে কুরআনের বক্তব্য পুরাতন ও নতুন নিয়মের বক্তব্যের বিরোধী, কাজেই কুরআন ঈশ্বরের বাণী হতে পারে না।”

আপত্তির পর্যালোচনা ও বিভ্রান্তির অপনোদন:

(ক) ইতোপূর্বে আমরা নিশ্চিতরূপে জেনেছি যে, পুরাতন ও নতুন নিয়মের এ সকল পুস্তক যে সকল ভাববাদী বা লেখকের নামে প্রচলিত সে সকল ভাববাদী বা লেখক থেকে অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরায় পুস্তকগুলি বর্ণিত ও প্রচারিত হয় নি। কাজেই এ সকল ভাববাদী বা লেখক যে সত্যিই এগুলি রচনা করেছেন তার কোনো প্রমাণ নেই। এ সকল পুস্তকের মধ্যে অনেক অনেক স্থানে বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা রয়েছে এবং এগুলি অগণিত ভুলভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। এ

কারণে বাইবেল দিয়ে কুরআন যাচাই করার কোনো উপায় নেই। কুরআনে যদি এ সকল পুস্তকের বিপরীত বা অতিরিক্ত কোনো তথ্য থাকে তাতে কুরআনের অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয় না, বরং এতে প্রমাণিত হয় যে বাইবেলের গ্রন্থাদিতে এ বিষয়ে কুরআন বিরোধী যে তথ্য রয়েছে তা মিথ্যা, ভুল বা বিকৃত। বাইবেলের পুস্তকাদিতে উল্লিখিত বা ইয়াহূদী-খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত তথ্য ও বিশ্বাসের বিভ্রান্তি ধরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কুরআনে এ সকল তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান বাইবেল বিরোধী তথ্যাদি দেখে কোনোভাবেই কল্পনা করার অবকাশ নেই যে, ভুলক্রমে বুঝি এই তথ্য কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। বরং এ সকল তথ্য কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে বাইবেলের বিভ্রান্তি প্রমাণ করার জন্য।

(খ) পাদরিগণের দাবি অনুসারে কুরআনের সাথে বাইবেলের পুস্তকাদির বৈপরীত্য তিন প্রকারের (১) রহিত বিধানাবলি সম্পর্কিত, (২) এমন কিছু বিষয় যেগুলি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু বাইবেলের পুরাতন বা নতুন নিয়মের কোনো পুস্তকে নেই এবং (৩) এমন কিছু বিষয় যা কুরআনে ও বাইবেলে রয়েছে, কিন্তু এগুলির বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা বাইবেলের বর্ণনার বিপরীত। এ তিন প্রকার বৈপরীত্যই পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে বিদ্যমান। কাজেই

এগুলির কোনোটিকেই কুরআনের ত্রুটি হিসেবে নির্দেশ করার অধিকার পাদরিগণের নেই।

প্রথমত, প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদে পাঠক দেখেছেন যে, রহিতকরণ শুধু কুরআনের বৈশিষ্ট্য নয়, বরং বাইবেলের মধ্যেও তা বিদ্যমান। কাজেই কুরআন যদি পূর্ববর্তী ধর্মের কিছু বিধান রহিত করে তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। পাঠক দেখেছেন যে, পুরাতন নিয়মের অনেক বিধান নতুন নিয়মে রহিত করা হয়েছে। কাজেই কোনো বুদ্ধিমান খৃস্টান নতুন বা পুরাতন নিয়মের কোনো বিধান রহিত করার কারণে কুরআনকে দোষ দিতে পারেন না। তাহলে তো প্রমাণিত হবে যে, নতুন নিয়মের পুস্তকাবলি 'ঈশ্বরের বাণী' নয়; কারণ তা পুরাতন নিয়মের বিধানাবলি রহিত করেছে। ইযহারুল হক্ক গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহর সাথে প্রকাশ্য বিতর্কে পাদরি ড. ফান্ডার স্বীকার করেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে নাসখ বা রহিতকরণ বিদ্যমান। কিন্তু বিতর্কের আগে তিনি তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে নাসখ বা রহিতকরণের বিদ্যমানতা কঠিনভাবে অস্বীকার করতেন।

দ্বিতীয়ত, বাইবেলে উল্লেখ করা নেই এরূপ কোনো তথ্য কুরআনে বিদ্যমান থাকলে তা কুরআনের কোনো ত্রুটি বলে গণ্য করা খৃস্টানদের পক্ষে সম্ভব নয়। পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে নেই এরূপ তথ্য পরবর্তী ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ করা যদি পরবর্তী গ্রন্থের ত্রুটি বলে গণ্য

করা হয় তবে তাতে নতুন নিয়ম ত্রুটিপূর্ণ বলে গণ্য হবে; কারণ বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদিতে উল্লেখ করা নেই এরূপ অনেক তথ্য নতুন নিয়মের পুস্তকাদিতে বিদ্যমান রয়েছে।[186] এখানে সামান্য কয়েকটি নমুনা পেশ করা হচ্ছে:

(১) যিহূদার পত্রের ৯ আয়াতে বলা হয়েছে: "কিন্তু প্রধান স্বর্গদূত মীখায়েল যখন মোশির দেহের বিষয়ে দিয়াবলের সহিত বাদানুবাদ করিলেন, তখন নিন্দাযুক্ত নিষ্পত্তি করিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু কহিলেন, প্রভু তোমাকে ভৎর্সনা করুন।"

মোশির দেহের বিষয়ে মীখায়েলের সাথে দিয়াবলের এই বাদানুবাদের কথা পুরাতন নিয়মের কোনো পুস্তকেই উল্লেখ নেই।

(২) ইব্রীয় ১২/২১ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "এবং সেই দর্শন এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, মোশি কহিলেন, 'আমি নিতানতই ভীত ও কম্পিত হইতেছি"।

এখানে পৌল মোশি, তাঁর সিনয় পর্বতে গমন ও তথায় মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি দর্শনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ

---

[186] বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকাদিতে উল্লেখ করা নেই এরূপ অনেক তথ্য নতুন নিয়মের পুস্তকাদিতে বিদ্যমান রয়েছে। আবার পুরাতন নিয়মের পূববর্তী পুস্তকে উল্লেখ নেই এমন অনেক তথ্য পরবর্তী পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার নতুন নিয়মের সুসমাচারগুলিতে উল্লেখ নেই এমন অনেক তথ্য প্রেরিতগণের পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যাত্রাপুস্তকের ১৯ অধ্যয়ে[187]।

কিন্তু সেখানে বা পুরাতন নিয়মের কোথাও মোশির এ কথা উল্লেখ করা হয় নি। "মোশি কহিলেন, 'আমি নিতানতই ভীত ও কম্পিত হইতেছি"-এ কথা কোথাও নেই।

(৩) ২ তিমথীয় ৩/৮: "আর যান্নি ও যাম্ব্রি যেমন মোশির প্রতিরোধ করিয়াছিল, তদ্রূপ ইহারা সত্যের প্রতিরোধ করিতেছে।"

ফরৌণের মন্ত্রবেত্তাগণ কর্তৃক মোশির প্রতিরোধের ঘটনা বিস্তারিত যাত্রাপুস্তকের ৭ম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই দুটি নামের উল্লেখ সেখানে নেই। যাত্রা পুস্তকের অন্য কোনো অধ্যায়ে বা পুরাতন নিয়মের অন্য কোনো পুস্তকের কোথাও এই নাম দুটির অস্তিত্ব নেই।

(৪) ১ করিন্থীয় ১৫/৬ শ্লোকে যীশুর কবর থেকে পুনরুত্থানের পরে বিভিন্ন শিষ্যকে সাক্ষাত দানের বিষয়ে বলা হয়েছে: "তাহার পরে একেবারে পাঁচ শতের অধিক ভ্রাতাকে দেখা দিলেন, তাহাদের অধিকাংশ লোক অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু কেহ কেহ নিদ্রাগত হইয়াছে।"

সুসমাচার চতুষ্ঠয়ে এবং প্রেরিতদের কার্যবিবরণের কোথাও এ পাঁচশতাধিক শিষ্যকে দেখা দেওয়ার বিষয়ের উল্লেখ নেই। এ

187 যাত্রাপুস্তক ১৯/১৪-২৫।

সকল বিষয় বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে লূকের আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল সবচেয়ে বেশি। অথচ তিনিও এ বিষয়ে কিছুই লিখেন নি।

(৫) নতুন নিয়মের সুসমাচারগুলিতে স্বর্গ, নরক, পুনরুত্থান, বিচার, কর্মের প্রতিদান ইত্যাদির কথা সংক্ষেপে হলেও উল্লেখ করা হয়েছে[188]। কিন্তু মোশির পাঁচটি পুস্তকে (**Torah or Pentateuch**) এ সকল বিষয়ের কোনোরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং সেগুলিতে শুধু জাগতিক লাভক্ষতির বিষয়ই উল্লেখ করা হয়েছে, পরকাল বা স্বর্গ-নরকের কথা কিছুই নেই। ঈশ্বর সদাপ্রভুর নির্দেশ যারা পালন করবে তাদের পৃথিবীতে কত প্রকারের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে এবং যারা ঈশ্বরের নির্দেশ না মানবে পার্থিব জীবনে তাদের কি কি শাস্তি বা কষ্ট দেওয়া হবে সেগুলিই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬) মথিলিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে যীশু খৃস্টের বংশাবলি পত্রে সরুববাবিলের পরে- সরুববাবিল ও যোষেফ-এর মধ্যে- নয়

---

[188] মথি ৫/২২, ১০/২৮, ২৩/১৫, ২৫/৪৬; মার্ক ৯/৪৩-৪৪; লূক ২৩/৪৩...।

ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছ; যাদের কারো কোনোরূপ উল্লেখ পুরাতন নিয়মের কোথাও নেই।[189]

এরূপ আরো অগণিত উদাহরণ বাইবেলের পুস্তকাদিতে রয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে নেই এমন কোনো তথ্য পরবর্তী ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ করা হলে তা কখনোই পরবর্তী গ্রন্থের ঐশ্বরিকত্বের দাবি মিথ্যা বলে প্রমাণ করে না। তাই যদি হয়, তবে প্রমাণিত হবে যে, ইঞ্জিল বা সুসমাচারগুলি মিথ্যা, কারণ এতে অনেক কথা আছে যা তোরাহ বা পুরাতন নিয়মের অন্য কোনো পুস্তকে নেই। বস্তুত, পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থে সবকিছুই উল্লেখ থাকা জরুরী নয়।

তৃতীয়ত, কুরআনের মধ্যে বাইবেলের পুস্তকাবলিতে উল্লিখিত তথ্যাদির বিপরীত বা বিরোধী তথ্য উল্লেখ করার কারণে কুরআনের প্রামাণ্যতা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ খৃস্টানদের নেই; কারণ এ জাতীয় বৈপরীত্য ও বিরোধিতা বাইবেলের মধ্যেই বিদ্যমান। এরূপ বৈপরীত্য ও বিরোধিতা বিদ্যমান রয়েছে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের এক পুস্তকের সাথে অন্য পুস্তকের, নতুন নিয়মের এক পুস্তকের সাথে অন্য পুস্তকের এবং নতুন নিয়মের সাথে পুরাতন নিয়মের।

---

[189] সরুববাবিল ও যোষেফ-এর মধ্যে নয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছ। তারা হলেন: অবীহূদ, ইলীয়াকীম, আসোর, সাদোক, আখীম, ইলীহূদ, ইলিয়াসর, মত্তন ও যাকোব। এদের কারো কোনোরূপ উল্লেখ পুরাতন নিয়মের কোথাও নেই।

প্রথম অধ্যায়ে পাঠক কিছু নমুনা দেখেছেন। তোরাহ-এর তিন সংস্করণ বা পাণ্ডুলিপি, অর্থাৎ হিব্রু, গ্রীক ও শমরীয় সংস্করণের মধ্যেও অনুরূপ কঠিন বৈপরীত্য ও বিরোধিতা রয়েছে। অনুরূপভাবে নতুন নিয়মের চার সুসমাচার: মথি, মার্ক, লূক ও যোহনের বর্ণণার মধ্যে রয়েছে ব্যাপক বৈপরীত্য। সামান্য ছোট্ট ছোট্ট বিষয়ের বর্ণনায় একেকজন একেক রকম বর্ণনা দিয়েছেন, যেগুলি অনেক সময় সাংঘর্ষিক।

খৃস্টান ধর্মগুরু ও প্রচারকগণ নিজেদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান অগণিত ব্যাখ্যাতীত বৈপরীত, অসামঞ্জস্য, ভুলভ্রান্তি দেখেও দেখেন না, কিন্তু সাধারণ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করতে কুরআন কারীমের বিষয়ে এ আপত্তি উত্থাপন করেন। আর প্রকৃত সত্য হলো, বাইবেলের পুরাতন বা নতুন নিয়মের কোনো তথ্যের সাথে কুরআনের কোনো তথ্যের বৈপরীত্যের কারণে কুরআনের ঐশ্বরিকতব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই; কারণ কুরআন সম্পূর্ণ পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ আসমানী পুস্তক যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। উপরন্তু বাইবেলের বিপরীতে কুরআন যে সকল তথ্য প্রদান করেছে তা কুরআনের সত্যতা ও বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান বিকৃতির অন্যতম প্রমাণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:

হাদীস বিষয়ে পাদরিগণের আপত্তি পর্যালোচনা

৩. ২. ১. হাদীস বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে বিভ্রান্তি

হাদীস বিষয়ে পাদরিগণ যে সকল বিভ্রান্তি ছড়ান সেগুলির অন্যতম হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর মিথ্যাচার।তারা বলেন: হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ, তাঁর আত্মীয়গণ এবং সহচরগণ। তাঁর পক্ষে এদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

আপত্তির পর্যালোচনা ও বিভ্রান্তির অপনোদন:

৩. ২. ১. ১. হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বনাম ইঞ্জিলের বর্ণনাকারীগণ

হাদীসের বিরুদ্ধে তাদের এ বক্তব্য সামান্য একটু পরিবর্তন করলেই তাদের বিরুদ্ধেই লাগবে। এক্ষেত্রে আমরা বলব যে, সুসমাচারগুলির মধ্যে যীশুখৃস্টের যে সকল কথা, কর্ম বা অবস্থা সংকলিত হয়েছে সেগুলি বর্ণনা করেছেন তাঁর মাতা, তাঁর কল্পিত পিতা যোষেফ এবং তাঁর শিষ্যগণ। যীশুর পক্ষে এদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়!!

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহচরগণ যে বস্তুনিষ্ঠার সাথে তার বাণী ও জীবনী

বর্ণনা করেছেন যীশুর সহচরগণ তা করেন নি। তাঁরা অতিকথন ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেন। যেমন চতুর্থ সুসমাচারের লেখক যোহন বলেছেন: "যীশু আরও অনেক কর্ম করিয়াছিলেন; সেই সকল যদি এক এক করিয়া লেখা যায়, তবে আমার বোধ হয়, লিখিতে লিখিতে এত গ্রন্থ হইয়া উঠিত যে, জগতেও তাহা ধরিত না।"[190]

নিঃসন্দেহে কথাটি একান্তই মিথ্যা এবং আপত্তিকর কাব্যিক অতিরঞ্জন। এরূপ কথা জ্ঞানীকে প্রভাবিত না করলেও সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে।

৩. ২. ১. ২. শিয়াগণের বিভ্রান্তি বনাম খৃস্টীয় বিভ্রান্ত সম্প্রদায়

হাদীসের গ্রহণযোগ্যতায় সন্দেহ সৃষ্টির জন্য পাদরিগণ সাহাবীগণের বিষয়ে দ্বাদশ ইমাম পন্থী শিয়াদের আপত্তিকর কথাবার্তা উদ্ধৃত করে সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করেন। এর উত্তরে প্রথমত আমরা বলব যে, শিয়াদের ভিত্তিহীন প্রমাণবিহীন কথাবার্তা যদি সাধারণ মুসলিমদের জন্য মান্য করা বাধ্যতামূলক হয়, তবে খৃস্টান ধর্মের বিভিন্ন বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের কথাবার্তাও সাধারণ খৃস্টানদের মান্য করা বাধ্যতামূলক হবে। আর সেক্ষেত্রে তাঁদের ধর্মের ভিত্তিই বাতিল বলে প্রমাণিত হবে।

---

[190] যোহন ২১/২৫।

প্রথম খৃস্টীয় শতক থেকে খৃস্টানদের মধ্যে অগণিত দল প্রকাশিত হয়েছে যারা এমন সব কথা বলেছেন ও ধর্মবিশ্বাস প্রচার করেছেন যা মূলধারার খৃস্টানগণ কুফরী ও বিভ্রান্তি বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন কোনো কোনো সম্প্রদায় দুজন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করত; একজন কল্যাণের স্রষ্টা এবং অন্যজন অকল্যাণের স্রষ্টা। তারা বিশ্বাস ও প্রচার করত যে, তোরাহ এবং পুরাতন নিয়মের অন্য সকল পুস্তক অকল্যাণের স্রষ্টা দ্বিতীয় ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত। মৃত্যুর পরে যীশুখৃস্ট নরকে গমন করেন। তিনি নরক থেকে (ভ্রাতৃহন্তা আদমপুত্র) কয়িনকে এবং (সমকামী) সদোমবাসীদেরকে মুক্ত করেন এবং (নিহত আদমপুত্র) হেবল, নোহ, আবরাহাম ও অন্য সকল প্রাচীন ভাববাদী ও সৎ মানুষকে নরকের মধ্যে রেখে আসেন। মোশিকে যিনি তোরাহ দিয়েছেন এবং অন্যান্য ইস্রায়েলীয় ভাববাদীদের সাথে যিনি কথা বলেছেন তিনি ঈশ্বর নন, বরং তিনি শয়তান বা দিয়াবল। ঈসার পূর্বে যত নবী-রাসূল বা ভাববাদী আগমন করেন তাঁরা সবাই চোর ও দস্যু ছিলেন।[191]

অনুরূপ অনেক সম্প্রদায়ের অনেক প্রকারের বিশ্বাস ছিল। নিঃসন্দেহে খৃস্টানগণ বলবেন যে, এগুলি সবই বাতিল ও কুফরী

---

[191] যোহনলিখিতি সুসমাচারের ১০/৮ শ্লোকে যীশু বলেন: "যাহারা আমার পূর্বে আসিয়াছিল, তাহারা সকলে চোর ও দস্যু।" খৃস্টের এই কথার ভিত্তিতেই তাঁরা এরূপ বলত।

বিশ্বাস ও ভিত্তিহীন কথা; মূলধারার খৃস্টানদের বিরুদ্ধে এ সকল কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করা যায় না। অনুরূপভাবে আমরাও বলব যে, এ সকল খৃস্টান সম্প্রদায়ের কথা যদি আপনাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা না যায় তাহলে মূল ধারার মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত মুসলিম সম্প্রদায়গুলির বক্তব্যকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যায় না।

বিশেষত সাহাবীদের বিরুদ্ধে তাদের এ সকল কথা কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলির বিরোধী এবং শিয়াদের পবিত্র ইমামগণের বক্তব্যেরও বিরোধী। কুরআন বারংবার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে, সাহবীরা কখনোই ঈমান বা ইসলামের পরিপন্থী কোনো কাজ করেন নি। এখানে আমি এ বিষয়ক কিছু আয়াত উল্লেখ করছি।

৩. ২. ১. ৩. সাহাবীগণের বিষয়ে কুরআনের সাক্ষ্য

(১) সূরা তাওবায় মহান আল্লাহ বলেন: "মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এই মহা-সাফল্য।"[192]

---

[192] সূরা তাওবা, ১০০ আয়াত।

এখানে আল্লাহ প্রথম অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারদের সম্পর্কে তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। নিঃসন্দেহে আবূ বাক্র সিদ্দীক, উমার ফারূক, উসমান যুন্নুরাইন- রাদিয়াল্লাহু আনহুম সকলেই প্রথম অগ্রগামী মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অনুরূপভাবে আলী (রা)-ও প্রথম অগ্রগামী মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এতে প্রমাণিত হলো যে, তাঁরা চারজনই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত এবং তাদের খিলাফতের বৈধতাও প্রমাণিত হলো। কাজেই চতুর্থজনের বিরুদ্ধে নিন্দা বা আপত্তি যেমন বাতিল, তেমনিভাবে প্রথম তিনজনের বিরুদ্ধে নিন্দা বা আপত্তিকর কথা এ আয়াতের ভিত্তিতে বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সাহাবীর বিষয়েও আপত্তি বা নিন্দা বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হবে; কারণ তাঁরা অগ্রগামী মুহাজির-আনসার বা তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারী।

(২) সূরা তাওবার মধ্যে অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন: "যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা আল্লাহ নিকট মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তারাই সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছেন, স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, যেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-

শান্তি। সেথায় তারা অনন্তকাল চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহর নিকটেই আছে মহা-পুরস্কার।”[193]

এখানে আল্লাহ হিজরতকারী এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুমিনদের জন্য চারটি বিষয় উল্লেখ করেছেন: (১) তাদের মর্যাদা অধিকতর, (২) তারা সফলকাম, (৩) তাদের জন্য আল্লাহর দয়া, সন্তোষ ও জান্নাতের সুসংবাদ ও (৪) চিরস্থায়ীভাবে অনন্তকাল তাদের জান্নাতে অবস্থানের সুসংবাদ। এই স্থায়িত্বের বিষয়টির গুরুত্ব বুঝাতে সমার্থক তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে: ‘স্থায়ী সুখ-শান্তি’, ‘চিরস্থায়ী’ ও ‘অনন্তকাল’।

নিঃসন্দেহে প্রথম চার খলীফা হিজরতকারী এবং আল্লাহর রাস্তায় জীবন ও সম্পদ দিয়ে জিহাদকারী মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কাজেই তাদের মর্যাদা, সফলতা, অনন্ত জান্নাতের সুসংবাদ ও তাঁদের খিলাফতের বৈধতা প্রমাণিত হলো। কাজেই তাঁদের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য মুহাজির মুজাহিদ সাহাবীর বিরুদ্ধে আপত্তি বা নিন্দাচারের কোনো সুযোগ নেই।

(৩) সূরা তাওবার অন্য স্থানে আল্লাহ বলেছেন: “কিন্তু রাসূল এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে; তাদের জন্যই কল্যাণ আছে

[193] সূরা তাওবা, ২০-২২ আয়াত।

এবং তারাই সফলকাম। আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্ন দেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তারা স্থায়ী হবে, এই মহা-সাফল্য।”[194]

এখানে আল্লাহ মুমিন মুজাহিদ সাহাবীগণ, যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন তাঁদের জন্য কল্যাণ, সফলতা ও অনন্ত জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে চার খলিফা মুমিন মুজাহিদদের অন্যতম ছিলেন। কাজেই তাঁদের জন্য কল্যাণ, সফলতা ও অনন্ত জান্নাত এবং তাদের খিলাফতের বৈধতাও প্রমাণিত হলো। তাঁদের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য মুমিন মুজাহিদ সাহাবীর বিরুদ্ধে আপত্তি বা নিন্দাচারের কোনো সুযোগ নেই।

(৪) আল্লাহ বলেন: “তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে ....। আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকার্যের নির্দেশ দিবে এবং অসৎকার্যে নিষেধ করবে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে।”[195]

এখানে ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত মুহাজিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠা প্রদান করলে তারা চারটি কাজ

---

[194] সূরা তাওবা, ৮৮-৮৯ আয়াত।

[195] সূরা হাজ্জ, ৪১ আয়াত।

করবেন: সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, সৎকার্যে আদেশ করা এবং অসৎকার্যে নিষেধ করা। আল্লাহ খলীফা চতুষ্টয়কে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন এবং তাঁদের সময়ে ইসলাম বিশ্বে প্রসারিত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তাঁরা এই চারটি কর্ম আঞ্জাম দিয়েছেন। আর এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা সত্যপন্থী ও সঠিক ছিলেন।

(৫) সূরা নূরে আল্লাহ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবেং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরীক করবে না, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারা তো সত্যত্যাগী।"[196]

এখানে 'তোমাদের মধ্য থেকে' কথা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে যে সকল মুমিন জীবিত ও বিদ্যমান ছিলেন

---

[196] সূরা নূর, ৫৫ আয়াত।

তাদের মধ্য থেকে কিছু মানুষকে আল্লাহ এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করছেন। তাঁরা সবাই নয়, বরং তাদের মধ্য থেকে কিছু মানুষ 'প্রতিনিধিত্ব' বা 'স্থলাভিষিক্তত্ব' লাভ করবেন।

এখানে আল্লাহ বললেন, তিনি এদেরকে 'খলীফা' অর্থাৎ 'প্রতিনিধি' বা 'স্থলাভিষিক্ত' বানাবেন। এথেকে জানা যায় যে, এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে; কারণ তার পরেই তো তাঁর প্রতিনিধি বা স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের প্রশ্ন আসে। আর এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, তাঁর পরে কোনো নবী আসবেন না, কাজেই তাঁর প্রতিনিধিত্ব বলতে এখানে 'নবুয়ত' বুঝানো হয় নি, বরং 'ইমামত' বুঝানো হয়েছে। এখানে 'তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন' থেকে ... 'তারা আমার কোনো শরিক করবে না' পর্যন্ত সবগুলি সর্বনাম বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাঁর নবীর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরে যাদেরকে এভাবে ইমামত বা খিলাফত প্রদান করবেন তারা তিনজনের কম হবেন না; কারণ আরবীতে তিনের কমকে বহুবচন করা হয় না।

আল্লাহ বলেছেন, ' তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে....' এখানে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাদেরকে শক্তি, ক্ষমতা ও বিশ্বব্যাপী প্রভাব প্রতিপত্তি প্রদান করবেন। এথেকে

জানা যায় যে, এ সকল ইমাম বা খলীফা শক্তি, ক্ষমতা ও বিশ্বব্যাপী প্রতিপত্তি অর্জন করবেন।

আল্লাহ বলেছেন, "তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন'। এ কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সকল ইমামের যুগে যে দীন প্রতিষ্ঠিত ও আচরিত হবে সে দীন আল্লাহর মনোনিত দীন।

আল্লাহ বলেছেন: "তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন"। এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের ইমামত, খিলাফত বা শাসনামলে তাঁরা শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে থাকবেন, তাঁরা কোনো ভয়-ভীতির মধ্যে থাকবেন না এবং 'তাকিয়্যাহ' আত্মরক্ষামূলক মিথ্যা কথা বলারও কোনো প্রয়োজন তাঁদের যুগে থাকবে না।

আল্লাহ বলেছেন: "তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোনো শরীক করবে না"। এ কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের খিলাফত বা শাসনামলে তাঁরা মুমিন থাকবেন, মুশরিক হবেন না।

এভাবে এই আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরের চার খলিফার ইমামত বা প্রতিনিধিত্ব প্রমাণিত হয়। বিশেষভাবে প্রথম তিন খলীফা: আবূ বাক্র সিদ্দীক, উমার ফারূক এবং উসমান যুন্নুরাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর ইমামত ও শাসন প্রমাণিত হয়। কেননা এই আয়াতে প্রতিশ্রুত 'সুদৃঢ় করণ' তাঁদের সময়ে বেশি প্রকাশিত হয়েছে। বড় বড় বিজয়, পরিপূর্ণ

ক্ষমতা ও প্রতাপ, দীনের বিজয় ও প্রকাশ এবং শান্তি ও নিরাপত্তা তাঁদের যুগে যেভাবে ছিল ৪র্থ খলীফা আলী (রা)-এর যুগে সেভাবে ছিল না। তাঁর পবিত্র যুগে তিনি বিদ্রোহী মুসলিমদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহ করতে বাধ্য হন। ফলে বিজয় ও নিরাপত্তার ধারা ব্যাহত হয়।

এভাবে এ আয়াত দ্বারা খলীফা চুতষ্টয়ের ইমামত প্রমাণিত হয়। কাজেই প্রথম তিন খলীফা ও অন্যান্য সাহাবীদের বিরুদ্ধে শিয়াদের ভিত্তিহীন কথাবার্তা এবং শেষ দুই খলীফা উসমান (রা) ও আলী (রা)-এর বিরুদ্ধে খারিজী সম্প্রদায়ের ভিত্তিহীন কথাবার্তা কুরআনের আলোকে বাতিল বলে প্রমাণিত হলো। তাদের এ সকল ভিত্তিহীন কথা দ্বারা মূলধারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করা যায় না।

(৬) হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যে সকল সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলেন, তাঁদের বিষয়ে সূরা ফাতহে আল্লাহ বলেন: "যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করত গোত্রীয় অহমিকা, অজ্ঞতা যুগের অহমিকা, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরকে স্বীয় প্রশান্তি দান করলেন, আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ়-স্থায়ী করলেন, এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন।"[197]

---

[197] সূরা ফাৎহ, ২৬ আয়াত।

সূরা ফাতহের মধ্যে অন্যত্র আল্লাহ বলেন: "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সাজদায় অবনত দেখবে। তাদের পরিচিতি চিহ্ন রয়েছে তাদের মুখমন্ডলে সাজদার প্রভাবে।"[198]

এভাবে আল্লাহ সাহাবীগণের বিষয়ে বললেন যে, তাঁরা মুমিন, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রশান্তি লাভে তাঁরা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে শরিক, তাকওয়ার বাক্য তাদের সাথে চিরস্থায়ীভাবে সম্পৃক্ত এবং এর জন্য তাঁরা ছিলেন অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ তাঁদের প্রশংসা করেছেন যে, তাঁরা কাফিরদের বিষয়ে কঠোর এবং নিজেরদের মধ্যে সহানুভূতিশীল এবং তাঁরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় রুকু-সাজদায় রত থাকেন।

নিঃসন্দেহে অন্যান্য সাহাবীদের সাথে চার খলিফা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহচর ছিলেন এবং এ সকল বিশেষণ সবই তাঁদের জন্য প্রযোজ্য। তাঁদের বিষয়ে বা কোনো সাহাবীর বিষয়ে কেউ যদি এর বিপরীত কোনো বিশ্বাস পোষণ করে তবে তার বিশ্বাস বাতিল ও কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক।

---

[198] সূরা ফাৎহ, ২৯ আয়াত।

(৭) সূরা হুজুরাতে আল্লাহ বলেন, "কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তাকে তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী।"[199]

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, সাহাবীগণ ঈমান ভালবাসতেন এবং কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতা ঘৃণা করতেন এবং তাঁরা সৎপথ অবলম্বনকারী ছিলেন। সাহাবীদের বিষয়ে এর বিপরীত কোনো বিশ্বাস পোষণ করা কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা বিভ্রান্তি বলে প্রমাণিত হলো।

(৮) সূরা হাশরে আল্লাহ বলেন: "অভাবগ্রস্ত মুহাজিরগণের জন্য, যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যপরায়ণ। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে তারা মুহাজিদরদেকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপরে অগ্রাধিকার দেয়, নিজেরা অভাগগ্রস্ত হলেও; যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।"[200]

---

[199] সূরা হুজুরাত, ৭ আয়াত।

[200] সূরা হাশর, ৮-৯ আয়াত।

এই আয়াতে আল্লাহ মুহাজিরদের প্রশংসায় বলেছেন যে, তাঁদের হিজরত বা দেশত্যাগ জাগতিক কোনো স্বার্থে বা উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনাতেই তাঁরা হিজরত করেন, তাঁরা আল্লাহর দীন ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহায্যকারী ছিলেন এবং তাঁরা কথা-কর্মে সত্যপরায়ণ ও সত্যবাদী ছিলেন। আর আনসারগণের প্রশংসায় আল্লাহ বলেছেন যে, আনসারগণ মুহাজিরদের ভালবাসতেন; মুহাজিরগণ কোনো কিছু লাভ করলে আনসারগণ খুশি হতেন এবং আনসারগণ নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও মুহাজিরদেরকে নিজেদের চেয়েও অগ্রাধিকার প্রদান করতেন।

নিঃসন্দেহে এ সকল গুণ ঈমানের পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। এ সকল দরিদ্র মুহাজির আবূ বাক্র (রা)-কে বলতেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা। আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, এ সকল মুহাজির সত্যবাদী ছিলেন। কাজেই আবূ বাকরের এই উপাধিও সত্য হওয়া জরুরী। আর এমতাবস্থায় আবূ বাক্রের ইমামতে সন্দেহ পোষণের কোনো সুযোগ থাকে না। মুহাজির ও আনসারগণের বিষয়ে এর ব্যতিক্রম বা বিপরীত কোনো আকীদা বা ধারণা পোষণকারী নিঃসন্দেহে কুরআন অমান্যকারী।

(৯) সূরা আল-ইমরানে আল্লাহ বলেন: "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকার্যের

নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।"[201]

এখানে আল্লাহ সাহাবীগণের প্রশংসায় বলেছেন যে, তাঁরা শ্রেষ্ঠ উম্মাত, তাঁরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করতেন এবং অসৎকার্যে নিষেধ করতেন এবং তাঁরা মুমিন ছিলেন। নিঃসন্দেহে চার খলিফা এ প্রশংসিত উম্মাতের অন্যতম ছিলেন। তাঁদের বিষয়ে এর ব্যতিক্রম ধারণা বা বিশ্বাস কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক ও বাতিল।

৩. ২. ১. ৪. সাহাবীগণের বিষয়ে শিয়া ইমামগণের বক্তব্য

শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা আলী (রা) ও তাঁর বংশের যে সকল মহান ব্যক্তিকে ইমাম বলে বিশ্বাস করেন তাঁরা সকলেই সাহাবীগণের সততা ও ধার্মিকতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এখন আমি -শিয়াদের 'পাঁচ-পবিত্র'-র সংখ্যানুসারে শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামগণ থেকে ৫টি বক্তব্য উদ্ধৃত করব।

(১) 'নাহজুল বালাগা' নামক গ্রন্থটি শিয়া সম্প্রদায়ের নিকট নির্ভরযোগ্য পুস্তক।[202] এ পুস্তকে আলীর (রা) নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত

---

[201] সূরা আল-ইমরান, ১১০ আয়াত।

[202] হিজরী পঞ্চম শতকে 'আলীর (রা) বক্তৃতা-সংকলন'-রূপে এই পুস্তকটি প্রকাশ পায়। বইটির সংকলক কে তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে মনে করা হয় যে, বাগদাদের প্রসিদ্ধ শিয়া নেতা আলী ইবনুল হুসাইন শরীফ মুরতাযা (৩৫৫-৪৩৬হি) আলীর (রা) বক্তৃতার সংকলন হিসেবে বইটি প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন।

করা হয়েছে: "আল্লাহ পুরস্কৃত করুন 'অমুককে'। তিনি (১) বক্রতাকে সোজা করেছেন, (২) মনের রোগব্যাধির চিকিৎসা করেছেন, (৩) সুন্নাত (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশুদ্ধ রীতি) প্রতিষ্ঠা করেছেন, (৪) বিদ'আত (ইসলামের মধ্যে নব-উদ্ভাবিত বিভ্রান্তিকর মত বা কর্ম) পশ্চাতে রেখেছেন, (৫) পরিচ্ছন্ন পোশাকে প্রস্থান করেছেন, (৬) অতি অল্প ভুলত্রুটিতে আক্রান্ত হয়েছেন, (৭) কল্যাণ অর্জন করেছেন, (৮) অকল্যাণ থেকে বিমুক্ত থেকেছেন, (৯) আল্লাহর আনুগত্য আদায় করেছেন, (১০) সত্যিকারভাবে আল্লাহকে ভয় করেছেন এবং তিনি প্রস্থান করেছেন জাতিকে বহুমুখি পথের সামনে রেখে, যেখানে বিভ্রান্ত পথ পায় না কিন্তু সুপথপ্রাপ্ত নিশ্চিত হতে পারে।"

প্রসিদ্ধ শিয়া পণ্ডিত ও 'নাহজুল বালাগা' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার মাইসাম ইবনু আলী আল-বাহরানী (৬৮১হি/১২৮২খৃ) এবং 'নাহজুল বালাগা' গ্রন্থের অন্যান্য অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারের মতে এখানে 'অমুক' বলতে আবূ বাক্র (রা)-কে বুঝানো হয়েছে। আর কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার মনে করেন যে, 'অমুক' বলতে এখানে 'উমার' (রা)-কে

কেউ কেউ মনে করেন যে, মুরতাযার ভাই মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন শরীফ রাযী (৩৫৯-৪০৬হি) বইটি সংকলন করেন।

বুঝানো হয়েছে।[203] এখানে আলী (রা) আবূ বাক্র (রা) বা উমারের (রা) ১০টি গুণ উল্লেখ করেছেন। এগুলি অবশ্যই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আবূ বাক্র (রা) বা উমারের (রা) মৃত্যুর পরেই আলী (রা) এ সকল গুণের কথা বলেছেন। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যু পর্যন্ত তাঁরা এরূপই ছিলেন এবং আলীর স্বীকৃতি অনুসারে তাঁরা সন্দেহাতীতভাবে সত্যপরায়ণ ও সঠিক ইমাম ও খলীফা ছিলেন।

'নাহজুল বালাগা' গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, আলী (রা) এক পত্রে আবূ বাকর (রা) ও উমার (রা) সম্পর্কে লিখেছেন, "আল্লাহর শপথ, ইসলামে তাঁদের দুজনের মর্যাদা অত্যন্ত মহান। তাদের সম্পর্কে আপত্তিকর কথা বলা ইসলামের জন্য বড় কঠিন আঘাত। আল্লাহ তাঁদের উভয়কে তাঁদের মহান কর্মগুলির জন্য পুরস্কার প্রদান করুন।"

(২) আলী ইবনু ঈসা আল-আরদাবীলী (৬৯২হি/১২৯৩খৃ) একজন প্রসিদ্ধ দ্বাদশইমাম-পন্থী শিয়া ধর্মগুরু ও পণ্ডিত ছিলেন। দ্বাদশ-ইমামপন্থী শিয়াগণ তাকে একজন নির্ভরযোগ্য পণ্ডিত বলে গণ্য

[203] আবূ বাকর (রা) ও উমারের (রা) বিরুদ্ধে পরবর্তী যুগের শিয়াদের ঘৃণা এত বেশি ছিল যে, তাঁদের নাম নেওয়াকেও তাঁরা পাপ ও অপবিত্র কাজ বলে মনে করত। এজন্য আলীর (রা) এই বক্তব্য থেকে মূল নামটি তারা মুছে ফেলে সেখানে 'অমুক' শব্দ উল্লেখ করেছে। এভাবেই সংকলক বক্তৃতাটি সংকলন করেছেন। এজন্য শব্দটির ব্যাখ্যা করতে হয়েছে।

করেন। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ "কাশফুল গুম্মাহ ফী মা'রিফাতিল আইম্মাহ" (ইমামদের পরিচয়ে অন্ধকারের অপসারণ)। এ পুস্তকে তিনি উল্লেখ করেছেন: "ইমাম আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ আল-বাকির[204]-কে তরবারীতে কারুকার্য করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, হ্যাঁ, তা করা যায়; কারণ আবূ বাকর সিদ্দীক নিজের তরবারী কারুকার্য করাতেন। তখন বর্ণনাকারী বলেন, আপনি এভাবে আবূ বাকরকে 'সিদ্দীক' (মহা-সত্যপরায়ণ ও সর্বোচ্চ ধার্মিক) উপাধিতে ভূষিত করছেন? তখন ইমাম বাকির নিজ আসন থেকে উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি সিদ্দীক, অবশ্যই তিনি সিদ্দীক, অবশ্যই তিনি সিদ্দীক। যে ব্যক্তি তাঁকে সিদ্দীক বলবে না আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার কোনো কথাই সত্য বলে গ্রহণ করবেন না।"

মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-হুর্র আল-আমিলী (১১০৪হি/১৬৯৩খৃ) হিজরী একাদশ শতকের প্রসিদ্ধতম দ্বাদশ-ইমাম

---

[204] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইনের পৌত্র মুহাম্মাদ আল-বাকির ইবনু আলী যাইনুল আবেদীন (৫৭-১১৪ হি/৬৭৬-৭৩২খৃ)। শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুসারে তিনি ছিলেন নিষ্পাপ ইমামগণের পঞ্চম ইমাম। পূর্ববর্তী চার জন: (১) আলী (রা), (২) আলীর পুত্র হাসান (রা), (৩) আলীর পুত্র হুসাইন (রা) এবং (৪) হুসাইনের পুত্র (বাকিরের পিতা) আলী যাইনুল আবেদীন (রাহ)।

পন্থী শিয়া পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "আল-ফুসূল আল-মুহিম্মাহ ফী উসূলিল আইম্মাহ" (ইমামগণের মূলনীতির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহ)। এ গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ বাকির (১১৪হি) কিছু মানুষকে দেখতে পান যে, তারা আবূ বাকর উমার ও উসমানের (ﷺ) সমালোচনা করছেন। তিনি তাদেরকে বলেন, (কুরআনে মুমিনদেরকে তিন দলে বিভক্ত করা হয়েছে, মুহাজির, আনসার ও পরবর্তী মুমিন যারা মুহাজির ও আনসারদের জন্য দু'আ করেন ও তাঁদের ভালবাসেন) তোমরা (এ তিন দলের) কোন্ দলের তা আমাকে বল। তোমরা কি মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন: "মুহাজিরগণ যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে, তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে"[205]? তারা বলেন: না, আমরা তা নই।

তখন তিনি বলেন, তাহলে তোমরা কি আনসারদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন: "মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে এবং ঈমান এনেছে তারা মুহাজিদরদেকে ভালবাসে"[206]? তারা বলে, না আমার তাও নই।

---

[205] সূরা হাশর, ৮ আয়াত।

[206] সূরা হাশর, ৯ আয়াত।

তখন তিনি বলেন, তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দিলে যে, কুরআনে উল্লিখিত এই দুই দলের সাথে তোমাদের কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। আর আমি তোমাদের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কুরআনে উল্লিখিত তৃতীয় দলের সাথেও তোমাদের সম্পর্ক নেই, যাদের বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন: "যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। আর আপনি আমাদের অন্তরে মুমিনগণের বিরুদ্ধে কোনো হিংসা, বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আপনি পরম দয়ার্দ্র ও মহা করুণাময়।"[207]

এখানে ইমাম মুহাম্মাদ বাকিরের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) সত্যিকার 'সিদ্দীক' বা মহা-সত্যপরায়ণ ও সর্বোচ্চ ধার্মিক ছিলেন। যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে সে দুনিয়াতে ও আখিরাতে মিথ্যাবাদী। যে ব্যক্তি আবূ বাকর সিদ্দীক (রা), উমার ফারূক (রা) বা উসমান যুন্নুরাইন (রা)-এর বিষয়ে সমালোচনা বা আপত্তিকর কথা বলবে সে কুরআন প্রশংসিত তিন দলের বহির্ভুত বিভ্রান্ত বলে গণ্য হবে।

---

[207] সূরা হাশর, ১০ আয়াত।

আল্লাহ আমাদেরকে সাহাবীগণের (ﷺ) বিষয়ে কুধারণা পোষণ থেকে রক্ষা করুন এবং তাঁদের প্রতি ভালবাসার উপর আমাদের মৃত্যু দান করুন।

৩. ২. ২. হাদীস সংকলন সম্পর্কে বিভ্রান্তি

পাদরিগণ বলেন: হাদীসের সংকলকগণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা ও অলৌকিক কার্যাবলি স্বচক্ষে দেখেন নি এবং তাঁর কথাবার্তাও সরাসরি শুনেন নি। বরং মুহাম্মাদের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর ১০০ বা ২০০ বৎসর পরে বহুমুখে লোকপরম্পরায় বর্ণিত এ সকল কথা শ্রবণ করেছেন এবং সংকলন করেছেন এবং তারা এরূপ বর্ণনার অর্ধেকই অগ্রহণযোগ্যতার কারণে বাতিল করে দিয়েছেন।

আপত্তির পর্যালোচনা ও বিভ্রান্তির অপনোদন

এ আপত্তির পর্যালোচনায় আমরা প্রথমে ইয়াহূদী ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভরতার বিষয় আলোচনা করব। এরপর হাদীস সংকলনে মুসলিম উম্মাহর মূলনীতি আলোচনা করব। অতীতকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সকল যুগে প্রায় সকল ইয়াহূদী ও খৃস্টান লিখিত ধর্মগ্রন্থের (বাইবেলের) মতই অলিখিত মৌখিক বর্ণনার (**tradition**) উপর নির্ভর করেছেন। উপরন্তু ইয়াহূদীরা লিখিত ধর্মগ্রন্থ বা বাইবেলের চেয়েও অধিকতর নির্ভর করেন অলিখিত মৌখিক বর্ণনার উপর। ক্যাথলিক খৃস্টানগণ লিখিত

ধর্মগ্রন্থ বা বাইবেল ও অলিখিত মৌখিক বর্ণনা উভয়কেই সমান গ্রহণযোগ্য বলে বিশ্বাস করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, উভয় প্রকারের বর্ণনাই সমানভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে উভয়ের উপরেই সমানভাবে নির্ভর করতে হবে।

৩. ২. ২. ১. ইয়াহূদী ধর্মে হাদীস বা মৌখিক বর্ণনা

ইয়াহূদীগণ তাদের ধর্মীয় বিধান বা শরীয়ত **(Law)** দুই ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম ভাগ লিখিত শরীয়ত **(scriptural laws),** যাকে তারা তোরাহ বলত এবং দ্বিতীয় ভাগ মৌখিক শরীয়ত **(oral laws),** যেগুলি ধর্মগুরু ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের **(elders)** মাধ্যমে যুগ পরম্পরায় তাদের নিকট পৌঁছেছে। তারা দাবি করেন যে, সদাপ্রভু ঈশ্বর মোশিকে সিনাই পর্বতে এ দু প্রকার বিধানই প্রদান করেন। আমাদের নিকট এক প্রকারের বিধান লিখিতভাবে পৌঁছেছে এবং দ্বিতীয় প্রকারের বিধান ধর্মগুরুদের মাধ্যমে মৌখিকভাবে পৌঁছেছে। এজন্য তারা বিশ্বাস করেন যে, উভয় প্রকারের বিধানই সমান গুরুত্বপূর্ণ, উভয়ই ঈশ্বরের পক্ষ থেকে এবং উভয়কেই গ্রহণ করতে হবে। বরং তারা দ্বিতীয় প্রকার বিধান বা অলিখিত মৌখিকভাবে বর্ণিত বিধানকেই অধিকতর গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করেন। তারা বলেন, লিখিত বিধান **(scriptural laws)** অনেক স্থানেই অসম্পূর্ণ ও অবোধগম্য। কাজেই মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর না করে কেবলমাত্র লিখিত বিধান পরিপূর্ণভাবে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি হতে

পারে না। মৌখিক বর্ণনাগুলি সুস্পষ্ট ও পূর্ণতর। সেগুলি লিখিত বিধানের ব্যাখ্যা করে এবং পূর্ণতা প্রদান করে। একারণে লিখিত বিধানের বা তাওরাতের কোনো অর্থ মৌখিক বিধান, অর্থাৎ **tradition** বা হাদীসের বিপরীত হলে ইয়াহূদীগণ তা প্রত্যাখ্যান করেন।

ইয়াহূদীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ যে, ইয়াহূদীদের থেকে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন, তা লিখিত বিধান পালনের জন্য নয়, বরং এ সকল মৌখিক লোখমুখে প্রচারিত বিধিবিধানের জন্য। এভাবে তারা প্রকৃতপক্ষে লিখিত বিধান বা তোরাহকে বাতিল বলে পরিত্যাগ করেন এবং অলিখিত বা মৌখিকভাবে প্রচলিত বিধানগুলিকেই তাদের ধর্মের ও বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। এ সকল মৌখিক বর্ণনার ভিত্তিতেই ইয়াহূদীগণ ঈশ্বরের বাণীর ব্যাখ্যা করেন, যদিও অনেক স্থানেই এ সকল মৌখিক বর্ণনার অর্থ লিখিত কিতাব বা তাওরাতের সাথে সাংঘর্ষিক।

যীশু খৃস্টের সময়ে এ বিষয়ে তাদের অবস্থা সীমালঙ্ঘনের পর্যায়ে পৌঁছায়। এ সময়ে তারা লিখিত তাওরাতের চেয়ে মৌখিক বর্ণনা ও জনশ্রুতিকে অনেক বেশি মর্যাদা দিতেন। যীশু তাদেরকে মৌখিক বর্ণনার ভিত্তিতে ঈশ্বরের বাণী বাতিল করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। যীশুর যুগের পরে তারা মৌখিক বর্ণনার বিষয়ে আরো বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে থাকেন। ইয়াহূদীদের গ্রন্থাবলিতে তারা উল্লেখ

করেন যে, মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রাপ্ত ধর্মগুরুগণের বা আলিমগণের বাণী তোরাহ-এর বাণীর চেয়েও বেশি প্রিয়। তোরাহ-এর বাণী কোনোটি সুন্দর ও কোনোটি অসুন্দর। আর পণ্ডিতগণ বা ধর্মগুরুদের বাণী সবই সুন্দর। ধর্মগুরুগণের বাণী ভাববাদীগণের বাণীর চেয়েও সুন্দরতর।

এরূপ আরো অনেক কথা তাদের পুস্তকাদিতে রয়েছে, যেগুলি থেকে জানা যায় যে, তারা লিখিত তোরাহ-এর চেয়ে অলিখিত মৌখিক বর্ণনাগুলিকে বেশি মর্যাদা প্রদান করেন। এ সকল মৌখিক বর্ণনা যেভাবে ব্যাখ্যা করে, তারা সেভাবেই ঈশ্বরের বাণীর ব্যাখ্যা করেন। এভাবে মনে হয় যে, তাদের বিশ্বাসে লিখিত তোরাহ প্রাণহীন দেহের মত, আর মৌখিক বর্ণনাসমূহ আত্মার মত, যদ্বারা তোরাহ প্রাণলাভ করে।

ইয়াহূদীরা বলেন, সদাপ্রভু ঈশ্বর যখন মোশিকে তোরাহ প্রদান করেন, তখন তোরাহ-এর অর্থও তাঁকে প্রদান করেন। তিনি প্রথমটিকে লিখে রাখতে নির্দেশ দেন। আর দ্বিতীয়টির বিষয়ে নির্দেশ দেন যে, তা মুখস্থ রাখতে হবে এবং একমাত্র মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমেই তা সবাইকে জানাতে হবে।

মোশি উভয় প্রকারের বিধান নিয়ে পর্বত থেকে ফিরে আসেন। ইস্রায়েল সন্তানগণকে তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি পর্বত থেকে ফিরে এসে হারোণ ও তার পুত্রদ্বয় ইলীয়াসর **(Eleazar)** ও ঈথামর

(Ithamar) ও ৭০ জন ধর্মগুরু বা গোত্রপতিকে উভয় প্রকারের বিধান শিক্ষা দেন। তারা সকল ইস্রায়েল সন্তানকে এ বিষয়ে জানান। এভাবে তারা লিখিত বিধানকে লিখিতভাবে ও মৌখিক বিধানকে মৌখিকভাবে পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা দেন। এভাবে পরবর্তী প্রায় দেড় হাজার বৎসর যাবৎ তা মৌখিকভাবে প্রচারিত হয়। অবশেষে ১৫০ খৃস্টাব্দের দিকে পবিত্র যিহূদা বা যিহূদা হা-কাদোশ **(Judah ha-Nasi/ Judah ha-qadosh: 135-220AD)** এ সকল মৌখিক বর্ণনা গ্রন্থাকারে সংকলন করতে শুরু করেন। প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি এগুলি গ্রন্থাকারে সংকলন করেন এবং গ্রন্থের নামকরণ করেন 'মিশনা' **(Mishna)।"** মূসা আলাইহিস সালাম থেকে প্রায় ১৭০০ বৎসর যাবৎ শুধুমাত্র লোকমুখে প্রচলিত ও প্রচারিত এ সকল মৌখিক বর্ণনার সমষ্টি এ মিশনা **(Mishna)** গ্রন্থ।

এই পুস্তকটি 'মিশনা' রচিত হওয়ার পর থেকে ইয়াহূদীদের মধ্যে তা অত্যন্ত প্রসিদ্ধি ও প্রচলন লাভ করে। তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তা শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান করতে থাকেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, এর মধ্যে যা কিছু আছে সবই লিখিত তাওরাতের মতই আল্লাহর নিকট থেকে পাওয়া এবং তা মান্য করা অত্যাবশ্যক।

বড় বড় ইয়াহূদী পণ্ডিত এই পুস্তকটির দুটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন। একটি তৃতীয় খৃস্টীয় শতকে (অন্য মতে পঞ্চম শতকে)

যিরূশালেমে রচিত। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাগ্রন্থটি খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাবিলনে রচিত হয়। প্রত্যেক ব্যাখ্যাগ্রন্থকেই ‘জেমারা’ **(Gemara)|** জেমারার আভিধানিক অর্থ ‘পূর্ণতা’। তাদের ধারণায় এই দুই ব্যাখ্যার মাধ্যমে ‘মিশনা’ গ্রন্থটির অর্থ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। এজন্য এগুলিকে ‘জেমারা’ বলা হয়। মিশনার মূল পাঠ ও ব্যাখ্যাকে একত্রে ‘তালমূদ’ **(study or learning)** বলা হয়। উভয় ব্যাখ্যাকে পৃথক করার জন্য প্রথমটিকে বলা হয় ‘যিরূশালেমীয় তালমূদ’ বা ‘ফিলিস্তিনী তালমূদ’ **(Palestinian Talmud/Talmud Yerushalmi)** এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় ‘ব্যাবিলনীয় তালমূদ **(Babylonian Talmud/Talmud Bavli)|**

মিশনার ব্যাখ্যা জেমারাগুলি অবাস্তব ভিত্তিহীন কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তবে ইয়াহূদীদের নিকট তা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও পবিত্র। এগুলির পঠন ও পাঠন তাদের মধ্যে অতি প্রচলিত। সকল সমস্যায় তারা এগুলির স্মরণাপন্ন হন। তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এই পুস্তকই তাদের পথের দিশারী।

বর্তমানে ইয়াহূদীদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচারের ভিত্তি মূলত এ দুই তালমূদের উপরে, যেগুলি তাওরাত ও পুরাতন নিয়মের অন্যান্য পুস্তক থেকে অনেক দূরবর্তী। তারা যিরুশালেমের তালমূদের চেয়ে ব্যাবেলনীয় তালমূদকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইয়াহূদীগণ ১৭০০ বৎসর যাবৎ শুধুমাত্র মৌখিকভাবে প্রচলিত ও প্রচারিত বর্ণনার উপরে নির্ভর করেন এবং লিখিত তাওরাত ও পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলির চেয়ে এগুলিকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিশ্বাস করেন। আমরা দেখেছি যে, এ ১৭০০ বৎসরের মধ্যে তারা অনেকবার ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞ, গণহত্যা, গণবন্দীদশা ও গণবিতাড়ণের শিকার হন। যে সকল ঘটনায় তাদের লিখিত ধর্মগ্রন্থই বিলুপ্ত হয়ে যায়, কাজেই মৌখিক বর্ণনার সূত্র আর থাকে কোথায়? আর এরূপ মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভরকরিগণ কিভাবে মুসলিমদের মৌখিক বর্ণনার বিষয়ে আপত্তি করেন? মুসলিমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের মাত্র দুই শতাব্দীর মধ্যে মৌখিক বর্ণনাগুলি সংকলন করেছেন। এ দুশ বৎসরও তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি লিখে রেখেছেন, এগুলির সূত্র রক্ষা করেছেন এবং এগুলির বিশুদ্ধতা বিচারে বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।

৩. ২. ২. ২. খৃস্টধর্মে হাদীস বা মৌখিক বর্ণনা

অলিখিত মৌখিক বর্ণনা বা শ্রুতির উপরে নির্ভর করার ক্ষেত্রে ইয়াহূদীদের অবস্থা আমরা জানতে পারলাম। এবার আসুন এ বিষয়ে প্রাচীন খৃস্টানদের অবস্থা পর্যালোচনা করি। খৃস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের প্রসিদ্ধতম খৃস্টান ধর্মযাজক ও ঐতিহাসিক ইউসিবিয়াস প্যাম্ফিলাস (**Eusebius Pamphilus**) (২৬৩-৩৩৯খৃ)। তাঁর রচিত

'যাজকীয় ইতিহাস' (**Ecclesisatical History**) প্রথম তিন শতকের খৃস্টান ধর্মের ইতিহাস জানার জন্য একটি মৌলিক গ্রন্থ। ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরাই পুস্তকটিকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত বলে গ্রহণ করেছেন। ইউসিবিস তার এ গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম তিন শতাব্দীর খৃস্টান ধর্মগুরুগণ মূলত মৌখিক বর্ণনার উপরেই নির্ভর করতেন। তাঁরা খৃস্টীয় ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় শিক্ষা ও নসীহতের ক্ষেত্রে লিখিত গ্রন্থ, সুসমাচার, পত্র ইত্যাদির চেয়ে মৌখিক বর্ণনা বা শ্রুতির উপরেই বেশি নির্ভর করতেন। এ বিষয়ে তিনি অনেক উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এখানে সামান্য কয়েকটি উল্লেখ করছি।

তৃতীয় শতকের প্রসিদ্ধতম ধর্মগুর ক্লিমেন্টের (**Clement of Alexadria**) আলোচনা প্রসঙ্গে ইউসিবিস বলেন, যীশুর প্রেরিত শিষ্য যাকোব (**James**)-এর বর্ণনায় ক্লিমেন্ট পিতা-পিতামহদের বা পূর্ববর্তীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত মৌখিক বর্ণনা (**tradition**)-এর নির্ভর করে অনেক তথ্য লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি এ সকল তথ্য যাদের থেকে শিখেছেন তাদের একজন ছিলেন সিরিয়, যিনি গ্রীসে বসবাস করতেন। আরেকজন ছিলেন আসিরিয়। আরেকজন ছিলেন ফিলিস্তিনে বসবাসরত হিব্রু পণ্ডিত। তবে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছেন তিনি একজন গুরুর উপর যিনি মিসরে আত্মগোপন করে

ছিলেন। তিনিই ছিলেন তার শিক্ষকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর পরে তিনি আর কোনো শিক্ষক সন্ধান করেন নি। পিতর **(Peter),** যাকোব **(James),** যোহন **(John)** এবং পৌল **(Paul)** থেকে যে সকল শিক্ষা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে তাদের নিকট পৌঁছেছে, সে সকল বর্ণনা তাঁরা মুখস্থ করেছেন।

দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত খৃস্টান ধর্মগুরু আরিনাউস **(Irenaeus)** থেকে ইউসিবিস উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি মূলত মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করতেন। তিনি তার মৌখিক বর্ণনা পোলিকার্পের **(St. Polycarp, Bishop of Smyrna c. 69-155)** ও অন্যান্যদের মুখ থেকে সংগ্রহ করেন। আরিয়ানুস গৌরব করে বলতেন যে, কোনো কিছু কাগজে লিখে রাখার বদ-অভ্যাস তার ছিল না। প্রথম থেকেই তার অভ্যাস ছিল সব কিছু শুনে হৃদয়ে লিপিবদ্ধ করে রাখা। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এন্টিয়কের দ্বিতীয় বিশপ ইগনাটিয়াস **(Ignatius)**[208] এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন চার্চমন্ডলীকে উজ্জীবিত করেন এবং তাদেরকে মৌখিক বর্ণনাগুলি অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে গ্রহণ করতে ও সেগুলির উপর নির্ভর করতে উপদেশ দেন।

---

[208] এন্টিয়কের (Antioch) দ্বিতীয় বিশপ। ১০৭ খৃস্টাব্দে নিহত হন। Eusebius Pamphilus, The Ecclesiastical History, page 104, 476.

ইউসিবিস লিখেছেন যে, প্যাপিয়াস (**Papias**)[209] তার পুস্তকের[210] ভূমিকায় লিখেছেন যে, পূর্ববর্তী গুরুগণ (**elders**) থেকে তার নিকট যা কিছু পৌঁছেছে তা সবকিছু তিনি মুখস্থ ও সংকলন করেছেন। তিনি আরো লিখেছেন যে, মানুষদের মুখ থেকে শ্রুত বা মৌখিক বর্ণনা থেকে তিনি যে কল্যাণ লাভ করেছেন সেরূপ কল্যাণ লিখিত পুস্তক (সুসমাচারগুলি) থেকে লাভ করতে পারেন নি।

ইউসিবিস আরো লিখেছেন যে, হেজিসিপাস (**Hegesippus**)[211] চার্চের ইতিহাস রচনায় একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ছিলেন। তার রচনাবলি থেকে অনেক তথ্যই পরবর্তীরা গ্রহণ করেছেন। তিনি এগুলি মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন। মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রেরিতগণের যে সকল নীতিমালা (**Apostolic Doctrine**) তিনি পেয়েছিলেন, সেগুলিকে সহজ ভাষায় তিনি পাঁচটি পুস্তকে সংকলিত করেছেন।

অন্যত্র তিনি লিখেছেন যে, বিভিন্ন চার্চের বিশপগণ সকলেই নিস্তারপর্ব (**Passover**) বিষয়ে বিভিন্ন মানুষের মাধ্যমে প্রাপ্ত মৌখিক

---

[209] দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু ও হেরাপোলিসের (Hierapolis) বিশপ।

[210] Explanation of the Sayings of the Lord/ Interpretation of our Lord's Declarations.

[211] দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতকের প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মগুরু ও ঐতিহাসিক, ১৮০ খৃস্টাব্দের দিকে মৃত্যুবরণ করেন।

বর্ণনার উপরেই নির্ভর করেছেন। আলেকজেন্ড্রীয় ক্লিমেন্ট **(Clement of Alexadria),** যিনি ছিলেন প্রেতিগণের শিষ্যদের শিষ্য, তিনি নিস্তারপর্ব **(Passover)** বিষয়ে যে পুস্তিকা রচনা করেন তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর বন্ধুগণ তাঁকে অনুরোধ করেন যে, তিনি মৌখিক যে সকল বর্ণনা পাদরি ও বিশপগণ থেকে শ্রবণ করেছেন সেগুলি লিপিবদ্ধ করতে, যেন পরবর্তী প্রজন্মের মানুষেরা তা থেকে উপকৃত হতে পারে।

ক্যাথলিক জন মিলনার ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত তার পুস্তকের ১০ম পত্রে- যে পত্রটি তিনি জেমস ব্রাউনের কাছে লিখেছিলেন- সেই পত্রে বলেন যে, ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস শুধু ঈশ্বরের লিখিত বাণী **(Scripture)**-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা আরো প্রশস্ত। লিখিত ও অলিখিত সকল বাণী, অর্থাৎ বাইবেলের পুস্তকাদি এবং মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রাপ্ত বাণীগুলিকে ক্যাথলিক চার্চ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে সেগুলি ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি। আরিনাউস লিখেছেন যে, সত্যের সন্ধানীদের জন্য এর চেয়ে সহজতর কোনো বিষয় আর নেই যে, তারা সকল চার্চে মৌখিক বর্ণনাগুলির অনুসন্ধান করবেন, বিভিন্ন জাতির ভাষা যদিও ভিন্ন, তবে অলিখিত মৌখিক বর্ণনা ও রীতি সকল স্থানেই একইরূপ। কারণ প্রেরিতগণ এগুলি মানুষদের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং মানুষেরা এগুলিকে ক্যাথলিক চার্চকে প্রদান করে।

জন মিলনার উক্ত পত্রে আরো বলেন, টার্টুলিয়ান **(Tertullian)**[212] লিখেছেন যে, ধর্মের মধ্যে নব-উদ্ভাবিত বিভ্রান্তি **(heresy)** সৃষ্টিকারী বিভ্রান্তদের **(heretics)** অভ্যাসই যে, তারা পবিত্র পুস্তক বাইবেল আঁকড়ে ধরে এবং বাইবেল থেকে প্রমাণাদি পেশ করে। তারা বলে, পবিত্র পুস্তক বা বাইবেল ছাড়া অন্য কোনো কিছুকেই ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না বা তার ভিত্তিতে কিছু বলা যাবে না। এভাবে তারা শক্তিমানদেরকে দুর্বল বানিয়ে ফেলে, দুর্বলদেরকে তাদের জালের মধ্যে আটকে ফেলে এবং মধ্যবর্তীদের অন্তরের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করে। এজন্য আমরা বলছি যে, এদেরকে বাইবেল দিয়ে বিতর্ক করতে সুযোগ দিবেন না। কারণ, মগজ ও পেট ব্যাথা করা ছাড়া বাইবেল দিয়ে বিতর্ক করে কোনো ফায়দা হবে না। এজন্য পবিত্র পুস্তক বা বাইবেলের উপর নির্ভর করার পন্থা ভুল; কারণ বাইবেলের পুস্তকাদি থেকে কিছু বের করা যায় না। যদি কিছু পাওয়া যায়ও তবে তা অসম্পূর্ণ। বস্তুত, খৃস্টধর্মের বিধিবিধান, ধর্মবিশ্বাস, যেগুলির ভিত্তিতে আমরা খৃস্টান হয়েছি এবং খৃস্টান ধর্মের সকল বিবরণ কেবলমাত্র মৌখিক বর্ণনার মধ্যেই পাওয়া যায়।

---

[212] খৃস্টীয় তৃতীয় শতকের অন্যতম প্রসিদ্ধ খৃস্টান ধর্মতত্ত্ববিদ আফ্রিকার কার্থেজে ১৫৫ খৃস্টব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ২২০ খৃস্টাব্দের পরে মৃত্যুবরণ করেন।

মিলনার আরো বলেন, ওরিগেন (**Origen**)[213] বলেছেন, যারা বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দেয় এ সকল মানুষকে গ্রহণ করা বা মূল্যায়ন করা আমাদের উচিত নয় এবং ঈশ্বরের চার্চমন্ডলীগুলি যুগ-পরম্পরার বর্ণনাধারার মাধ্যমে আমাদেরকে যে বর্ণনা প্রদান করেছেন তার বাইরে কোনো কিছু বিশ্বাস করা আমাদের উচিত নয়। আর ব্যাসিলাস লিখেছেন যে, চার্চের মধ্যে অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলি আলোচনা-উপদেশে ব্যবহার করা হয়। এগুলির কিছু পবিত্র বাইবেল থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আর কিছু মৌখিক বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়েছে। ধর্মের মধ্যে উভয় বিষয়ের গুরুত্ব ও শক্তি সমান। বিভ্রান্তদের (**heretics**) বিরুদ্ধে এপিফান্স যে পুস্তক রচনা করেন তার মধ্যে তিনি বলেন, আমাদেরকে অবশ্যই মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করতে হবে; কারণ বাইবেলের মধ্যে সব কিছু পাওয়া যায় না।

মিলনার বলেন, ক্রীযাস্টম (**John Chrysostom**) বলেছেন, প্রেরিতগণ সব কিছু লিখিতভাবে প্রচার করেন নি। বরং অনেক বিষয় তারা অলিখিতভাবে বা শুধু মৌখিকভাবে প্রচার করেছেন। লিখিত ও অলিখিত উভয় প্রকারের শিক্ষাই সমান গ্রহণযোগ্য। এজন্য আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, চার্চের বর্ণনাই ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি।

---

[213] তৃতীয় শতাব্দীর আলেকজেন্দ্রীয়ার খৃস্টীয় সম্প্রদায়ের প্রধান।

কোনো বিষয় যদি মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তবে সে বিষয়ে আমরা আর কিছু দাবি করি না। আর অগাস্টাইন (**St. Augustine**) লিখেছেন, অনেক ধর্মীয় বিষয়ের লিখিত কোনো প্রমাণ নেই, এ সকল বিষয়ে কেবল মৌখিক বর্ণনার উপরেই নির্ভর করতে হয়। সাধারণ চার্চ অনেক বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে যে, সেগুলি প্রেরিতগণের শিক্ষা, যদিও তা লিখিত নয়।

ইয়াহূদী পণ্ডিত রাববী মোশি কোদসী অনেক প্রমাণ উল্লেখ করেছেন যে, মৌখিক বর্ণনার সহযোগিতা গ্রহণ ছাড়া বাইবেলের বক্তব্য বুঝা সম্ভব নয়। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের গুরুগণ সর্বদা এ নীতি অনুসরণ করেছেন।

বস্তুত খৃস্টধর্মের মৌলিক ধর্মবিশ্বাসের অধিকাংশ বিষয়ই সুসমাচার থেকে পাওয়া যায় না, বরং একান্তভাবেই মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে এ সকল বিশ্বাস পোষণ করা হয়। যেমন, সারবস্তু ও মূলে (**Substance and essence**) পুত্র (যীশুখৃস্ট) পিতার (ঈশ্বরের) সমান, পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্র উভয়ের থেকে নির্গত, খৃস্টের একটি অস্তিত্ব এবং দুটি প্রকৃতি, খৃস্টের দুটি ইচ্ছা ছিল: মানবীয় ও ঐশ্বরিক, খৃস্ট মৃত্যুর পরে নরকে প্রবেশ করেন ইত্যাদি। অনুরূপ অনেক কাল্পনিক ‘ধর্মবিশ্বাস’ তাদের রয়েছে। এ সকল বিশ্বাস এরূপ বাক্যে বা শব্দে স্পষ্টত নতুন নিয়মের কোথাও নেই।

মৌখিক বিবরণ বা চার্চীয় প্রচলনই এ সকল বিশ্বাসের একমাত্র ভিত্তি।[214]

ড. ব্রেট বলেন, মুক্তির জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবকিছু লিখিত হয় নি। বরং প্রেরিতগণ কিছু বিষয় লিখিত প্রচার করেছেন এবং কিছু বিষয় মৌখিক প্রচার করেছেন। যারা উভয় প্রকারের বাণী সংরক্ষণ না করে তারা দুর্ভাগা। ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে মৌখিক বর্ণনাও

---

[214] এ ছাড়া মৌখিক বর্ণনা অস্বীকার করলে তাদেরকে বাইবেলের অনেক অংশ অস্বীকার করতে হবে। যেমন লূকলিখিত সুসমাচার, মার্কলিখিত সুসমাচার এবং প্রেরিতদের কার্য-বিবরণ-এর প্রথম থেকে ১৯টি অধ্যায় বাতিল বলে গণ্য করতে হবে। মার্ক ও লূক খৃস্টের শিষ্য ছিলেন না এবং এ সকল ঘটনা তারা প্রত্যক্ষ করেন নি। অপরদিকে তারা ভাববাদী বা প্রেরিত ছিলেন না, কাজেই ঐশ্বরিক প্রেরণার মাধ্যমে তারা লিখেন নি। একান্তই মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে তাঁরা এগুলি লিখেছেন। অনুরূপভাবে শলোমনের হিতোপদেশ (The Proverbs) পুস্তকের ২৫ অধ্যায় থেকে ২৯ অধ্যায় পর্যন্ত পাঁচটি অধ্যায় তাকে বাতিল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কারণ যিহূদা রাজ্যের রাজা হিষ্কিয় (Hezekiah)-এর যুগে সমাজে প্রচলিত মৌখিক বর্ণনার উপর নির্ভর করে এই অধ্যায়গুলি সংকলন করা হয়। শলোমনের মৃত্যুর ২৭০ বৎসর পরে এভাবে মৌখিক বর্ণনার উপরে নির্ভর করে এগুলি সংকলন করা হয়। এ পুস্তকের ২৫ অধ্যায়ের ১ম আয়াতটি নিম্নরূপ: "নিম্নলিখিত হিতোপদেশগুলিও শলোমনের; যিহূদা-রাজ হিষ্কিয়ের লোকেরা (men of Hezekiah) এইগুলি লিখিয়া লন।" এ থেকে জানা গেল যে সুলাইমান (আ) থেকে হিষ্কিয় রাজা পর্যন্ত কয়েক শত বৎসর এগুলি লোকমুখে প্রচলিত ছিল।

লিখিত বাণীর মত প্রামাণ্য। বিশপ মোনেক বলেন: প্রেরিতগণের মৌখিক বক্তব্য তাদের লিখিত বক্তব্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গ্লিন্ক ভিরতে বলেন, কোন্ সুসমাচার গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি অগ্রহণযোগ্য সে বিষয়ক বিতর্ক একমাত্র মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমেই নিষ্পত্তি হয়। মৌখিক বর্ণনাই সকল বিতর্কে সমাধানের ভিত্তি।

বিশপ মানিসিক সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, ঈশ্বর ধর্মের মধ্যে ৬০০ বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন এবং চার্চগুলিতে তা পালিত হয়। এগুলির একটি বিষয়েও বাইবেলের কোথাও কোনো বর্ণনা বা শিক্ষা নেই বলে স্বীকার করতে হবে। এগুলির বিষয়ে কেবলমাত্র মৌখিক বর্ণনার উপরই নির্ভর করা হয়েছে।

উইলিয়াম মূর বলেছেন: প্রাচীন খৃস্টানদের নিকট ধর্মবিশ্বাসের মূলনীতিসমূহের কোনো লিখিতরূপ ছিল না। মুক্তির জন্য যে বিশ্বাসের প্রয়োজন তার কোনো লিখিতরূপ ছিল না। শিশুদেরকে এবং যারা খৃস্টান ধর্মে দিক্ষিত হতেন তাদেরকে মৌখিকভাবে এগুলি শিক্ষা দেওয়া হতো।

৩. ২. ২. ৩. ইসলামী শরীয়তে হাদীস

উপরের আলোচনায় আমরা ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণের হাদীস নির্ভরতা বা মৌখিক বর্ণনার **(tradition)** উপর নির্ভরতার বিষয়ে জানতে পারলাম। এখন পাঠক চিন্তা করুন! যারা ১৭০০ বৎসর যাবৎ মৌখিকভাবে প্রচারিত বিষয়কে লিখিত তাওরাতের চেয়ে

অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করেন এবং যারা তিন-চার শত বৎসর যাবৎ মুখে মুখে প্রচারিত ও বর্ণিত বিষয়াবলিকে লিখিত ইঞ্জিলের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করেন এবং যারা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল ভিত্তি এরূপ বর্ণনার উপর স্থাপন করেন তাদের পক্ষে কি মুসলিমদের হাদীসের বিষয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপন করা চলে?

বিশেষত সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহ হাদীস বর্ণনা, মুখস্থকরণ, লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণে বিশেষ সতর্কতা ও বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা অবলম্বন করেছেন। এ বিষয়ে মুসলিমগণ অত্যন্ত কড়াকড়ি আরোপ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা আমার হাদীস বর্ণনা করা থেকে সতর্ক ও সাবধান থাকবে, শুধুমাত্র যা তোমরা নিশ্চিতরূপে জান তা ছাড়া কিছু বলবে না। কারণ, যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলবে তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম।"

এই হাদীসটি ইসলামী পরিভাষায় 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ের। যে হাদীস বহুসংখ্যক সাহাবী থেকে বহুসংখ্যক তাবিয়ী বর্ণনা করেছেন এবং এভাবে অগণিত সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তাকে 'মুতাওয়াতির' বলা হয়। এই হাদীসটি ৬২ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত। এদের মধ্যে ১০ জন প্রসিদ্ধ সাহাবী রয়েছেন যাঁদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের বিশেষ সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

এ কারণে প্রথম প্রজন্ম থেকেই 'হাদীস' বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ও শিক্ষা গ্রহণ ও মুখস্থ করার বিষয়ে মুসলিমগণ অত্যন্ত আগ্রহ ও সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। সকল যুগেই কুরআনের বিষয়ে মুসলিমদের আগ্রহ-উদ্দীপনা যেমন বাইবেলের বিষয়ে খৃস্টানদের আগ্রহ-উদ্দীপনা চেয়ে অনেক বেশি, ঠিক তেমনি সকল যুগেই হাদীসের বিষয়েও মুসলিমদের আগ্রহ-উদ্দীপনা খৃস্টধর্মীয় হাদীসের বিষয়ে খৃস্টানদের আগ্রহ-উদ্দীপনার চেয়ে অনেক বেশি।

সাহাবীগণ বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহচরগণ তাঁর মৌখিক নির্দেশাবলি, শিক্ষা, আচরণ ও উপদেশাবলি বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করেছেন ও প্রচার করেছেন, কেউ কেউ কিছু বিষয় লিখেও রেখেছেন, তবে তাঁরা তাঁদের যুগে সেগুলি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন নি। এর অন্যতম কারণ ছিল কুরআনের বিশুদ্ধ সংরক্ষণ; যেন লিখিত কোনো হাদীসকে কেউ ভুলক্রমে কুরআনের অংশ মনে করে বিভ্রান্ত না হয়।

তাবিয়ীগণ, অর্থাৎ সাহাবীগণের শিষ্যগণ বা দ্বিতীয় প্রজন্মের মুসলিমগণ হাদীসসমূহ গ্রন্থাকারে সংকলন শুরু করেন। তাঁরা প্রাথমিকভাবে তথ্যসূত্র ও বর্ণনাকারীর পরিচয়সহ তাঁদের সমসাময়িক সাহাবীগণ ও দ্বিতীয় প্রজন্মের তাবিয়ীগণ থেকে 'হাদীস' সংগ্রহ ও সংকলন করেন। কিন্তু তারা সংকলিত হাদীস কোনোরূপ

বিষয় বিন্যাস করে সাজান নি। তৃতীয় প্রজন্মের মানুষেরা এ সকল হাদীস বিষয়ভিত্তিক বিন্যাসের মাধ্যমে সংকলন করেন।

হাদীস সংকলন, যাচাই ও বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করেন। 'আসমাউর রিজাল' বা বর্ণনাকারীগণের নাম-পরিচয়' নামে হাদীস-বিজ্ঞানের পৃথক শাখায় (প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থে) তারা সকল বর্ণনাকারীর পরিচয়, তার ধার্মিকতা, হাদীস বর্ণনায় তার নির্ভুলতার অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সকল তথ্য সংকলন করেছেন।[215] 'সহীহ' হাদীসের সংকলনগণ প্রত্যেকটি হাদীস সনদ

---

[215] দ্বিতীয় প্রজন্ম বা তাবিয়গণের যুগ থেকে হাদীস শিক্ষা ও সংকলনে মুসলিম আলিমগণ বা মুহাদ্দিসগণ যাচাই ও নিরীক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। এক্ষেত্রে তাঁদের কার্যপদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ: (১) সংগ্রহ, (২) ব্যক্তি যাচাই, (৩) তথ্য যাচাই ও (৪) সংকলন। প্রথম পর্যায়ে তাঁরা মুসলিম বিশ্বের সকল শহর ও গ্রামে পরিভ্রমন করে তারা বর্ণনাকারী ব্যক্তি ও তার শিক্ষকদের নামসহ 'হাদীস' সংগ্রহ করতেন। বর্ণনাকারী ব্যক্তি ও তার শিক্ষকদের বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে তাদের বিশ্বস্ততা যাচাই করতেন। এরপর সংগৃহীত সকল 'হাদীস' তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে তথ্য যাচাই করতেন। যেমন কুফার একব্যক্তি একটি হাদীস বলেছেন এবং দামেশকের একব্যক্তি একটি হাদীস বলেছেন। তারা উভয় বর্ণনার তুলনার মাধ্যমে বর্ণনার নির্ভুলতা যাচাই করতেন, ঠিক যেভাবে ক্রস-একজামিনের মাধ্যমে কোর্টে প্রদত্ত তথ্য ও সাক্ষ্য যাচাই করেন আইনজীবি ও বিচারকগণ। এই প্রক্রিয়ার সংগৃহীত সকল হাদীস ও ব্যক্তি সম্পর্কীয় তথ্যাদি তারা গ্রন্থাকারে সংকলন করেছেন। অনেকে সংগৃহীত সকল হাদীস সনদ বা বর্ণনাকারীগণের পরিচয়-সহ সংকলন করেছেন। অনেকে যাচাই

বা বর্ণনাকারীদের নামধাম-সহ সংকলন করেছেন। গ্রন্থকার থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত কতজন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে তিনি হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন তা উল্লেখ করা হয়েছে। বুখারী সংকলিত হাদীস গ্রন্থের অনেক হাদীসই 'তিনব্যক্তির বর্ণিত', অর্থাৎ ইমাম বুখারী ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝে মাত্র তিন ব্যক্তি রয়েছেন।[216]

বাছাইয়ে বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হাদীসগুলিই সংকলন করেছেন। এছাড়া পৃথক গ্রন্থে বর্ণনাকারীদের পরিচয় এবং তাদের দেওয়া তথ্যের সাথে অন্যদের দেওয়া তথ্যের তুলনার মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যাদি সংকলন করেছেন। এভাবে রিজাল বিষয়ক গ্রন্থাদিতে প্রায় ৩০ হাজার মানুষের জন্ম, মৃত্যু, জীবন, কর্ম, তাদের বর্ণিত হাদীসের পরিসংখ্যান, তাদের বর্ণনার নির্ভুলতার মান ইত্যাদি বিষয়ক তথ্যাদি সংকলন করা হয়েছে। অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীরা ধর্মীয় তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এর শতভাগের একভাগ সতর্কতা, বস্তুনিষ্ঠা ও নিরীক্ষার প্রমাণ দেখাতে পারেন নি।

[216] তাবিয়ীগণ বা দ্বিতীয় প্রজন্ম থেকেই মুহাদ্দিসগণ লিখিত পাণ্ডুলিপির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতেন। তারা হাদীস শুনতেন এবং লিখতেন। শিক্ষাদানের সময় লিখিত পাণ্ডুলিপি ও মৌখিক পাঠ উভয়ের সমন্বয়ে শিক্ষা দিতেন। শুধু লিখিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে তা থেকে হাদীস শিক্ষা তারা অনুমোদন করতেন না। কারণ এতে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে পাণ্ডুলিপির অনুলিপিকরণে বা পঠে ভুল হতে পারে। এ কারণে তারা হাদীস বর্ণনার সময় 'হাদ্দাসানা' বা আমাদেরকে বলেছেন কথাটি বলতেন। হাদ্দাসানা অর্থ শুধু মৌখিক বর্ণনা নয়, বরং পাণ্ডুলিপি সামনে রেখে মৌখিক পাঠ শ্রবণ। বিস্তারিত প্রমাণাদির জন্য

বিশুদ্ধ বা সহীহ হাদীস[217] তিন প্রকারের: (১) মুতাওয়াতির (অতি প্রসিদ্ধ), (২) মাশহূর (প্রসিদ্ধ) ও (৩) খাবারুল ওয়াহিদ (একক বর্ণনা)।[218]

দেখুন. ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি (ঝিনাইদহ, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ, ২০০৬) পৃ. ৮৪-৯৬।

[217] মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় যে হাদীসের মধ্যে ৫টি শর্ত পূরণ হয়েছে তাকে সহীহ হাদীস বলা হয়: (১) 'আদালত': হাদীসের সকল রাবী (বর্ণনাকারী) পরিপূর্ণ সৎ ও বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত, (২) 'যাবত': তুলনামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে সকল রাবীর 'নির্ভুল বর্ণনার ক্ষমতা' পূর্ণরূপে বিদ্যমান বলে প্রমাণিত, (৩)'ইত্তিসাল': সনদের প্রত্যেক রাবী তাঁর ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে স্বকর্ণে হাদীসটি শুনেছেন বলে প্রমাণিত, (৪) 'শুযূয মুক্তি': হাদীসটি অন্যান্য প্রামাণ্য বর্ণনার বিপরীত নয় বলে প্রমাণিত এবং (৫) 'ইল্লাত মুক্তি': হাদীসটির মধ্যে সুক্ষ্ম কোনো সনদগত বা অর্থগত ত্রুটি নেই বলে প্রমাণিত। প্রথম তিনটি শর্ত সনদ কেন্দ্রিক ও শেষের দুইটি শর্ত মূলত অর্থ কেন্দ্রিক। সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রদত্ত সাক্ষ্য-প্রমাণাদির বিষয়ে যতটুকু নিশ্চয়তা অনুভব করলে একজন বিচারক মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিতে পারেন, বর্ণিত হাদীসটি সত্যিই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন বলে অনুরূপভাবে নিশ্চিত হতে পারলে মুহাদ্দিসগণ তাকে ''সহীহ'' বা বিশুদ্ধ হাদীস বলে গণ্য করেন। বিস্তারিত দেখুন: ইরাকী, আত-তাকয়ীদ, পৃ: ২৩-২৫; ফাতহুল মুগীস, পৃ: ৭-৮; সাখাবী, ফাতহুল মুগীস ১/২৫-৩১; সুয়ূতী, তাদরীবুর রাবী ১/৬৩-৭৪; মাহমূদ তাহ্হান, তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস, পৃ. ৩৪-৩৬, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি, পৃ. ৫৬-১২৩।

[218] প্রকৃত সত্য হলো, মুসলিম উম্মাহর নিকট সংরক্ষিত 'হাদীস' ইহূদী খৃস্টানদের নিকট সংরক্ষিত বাইবেলের সাথেই তুলনীয়। বরং 'হাদীসের' বিশুদ্ধতা' বাইবেলের বিশুদ্ধতার চেয়েও অধিক প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট। শুধু নতুন নিয়মের সাথে তুলনা করলে যে কোনো খৃস্টান গবেষককেও স্বীকার করতে হবে যে, মাকলিখিত সুসমাচার ও লূকলিখিত সুসমাচারের বিশুদ্ধতা স্বীকার করলে হাদীসের বিশুদ্ধতা স্বীকার করা ছাড়া উপায় থাকে না। এই দুই সমাচারের লেখক যীশুর প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তারা পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ। যীশুর তিরোধানের প্রায় শতবৎসর পরে মৌখিক বর্ণনার ভিত্তিতে এগুলি সংকলন করেছেন। হাদীসও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মৃত্যুর শতবর্ষ পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের মানুষেরা গ্রন্থাকারে সংকলন করেছেন। তবে বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতার মাপকাঠিতে এই দুই সুসমাচারের সাথে হাদীসের কিছু পার্থক্য রয়েছে:

প্রথমত, মার্ক ও লূক কার নিকট থেকে শুনে তা সংকলন করেছেন তা উল্লেখ করেন নি। তারা সব কথা যে যীশুর শিষ্যদের থেকে শুনেছেন তা মনে করার কোনো কারণ নেই। তাদের মত দ্বিতীয় প্রজন্মের অনেকের নিকট থেকেও তারা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বাহ্যত বুঝা যায় যে, লোকমুখে যা কিছু প্রচলিত হয়েছে, নির্বিচারে বা বিবেকবুদ্ধির বিচারের মাধ্যমে তারা তা গ্রহণ করেছেন। বর্ণনাকারীর বর্ণনার সত্যতা, বিশুদ্ধতা বা বিশ্বস্ততা যাচাই করেন নি। পক্ষান্তরে হাদীসের ক্ষেত্রে প্রতিটি হাদীস পৃথকভাবে কার নিকট থেকে শ্রবণ করা তা উল্লেখ করা হয়েছে। এখনো যে কোনো গবেষক যাচাই করতে পারবেন যে, কোন ঘটনা কত জন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত কতগুলি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে...।

দ্বিতীয়ত, মার্ক ও লূক তাদের গ্রন্থদ্বয় সংকলন করার পরে এগুলির কি অবস্থা ছিল তা মোটেও জানা যায় না। প্রায় ২০০ বৎসর এগুলির হালহকিকত কিছুই জানা

যায় না। তাঁদের নিকট থেকে কে বা কারা গ্রন্থদুটি গ্রহণ করেছিল? তারা কি লিখিত পুস্তক নিয়ে গিয়েছিল না পুরো বই লেখকের নিকট পড়ে বুঝে নিয়ে গিয়েছিল? তাদের নিকট থেকে কে বা কারা পুস্তকগুলি গ্রহণ করেছিল? কিছুই জানা যায় না। পক্ষান্তরে হাদীসের ক্ষেত্রে বিষয়টি অত্যন্ত প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট।

তৃতীয়ত, খৃস্টানগণ তাদের ধর্মগ্রন্থের অনুলিপিকরণে শুধু লিখিত পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করেছেন। এতে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছকৃত ভুলভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, যেগুলিকে তারা erratum ও Various readings বলে অভিহিত করেন বলে আমরা দেখেছি। পক্ষান্তরে মুহাদ্দিসগণ কখনোই শুধু লিখিত পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করেন নি। সর্বদা লিখিত পাণ্ডুলিপি মূল লেখকের নিকট পড়ে অথবা তার মুখ থেকে শুনে নেওয়া ছাড়া কোনো হাদীসের বর্ণনা তারা গ্রহণ করতেন না।

ইহূদী ও খৃস্টান ধর্মের মৌখিক বর্ণনা বা হাদীসের সাথে ইসলাম ধর্মের 'হাদীসে'-র মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইহূদী-খৃস্টান ধর্মের ট্রেডিশন বা মৌখিক বর্ণনা হাজার বছর ধরে মুখে মুখে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের হাদীস মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তিরোধানের দুই শতাব্দীর মধ্যে সংকলিত হয়েছে। ইহূদী-খৃস্টানগণের মৌখিক বর্ণনার কোনোরূপ সূত্র, বা তথ্য নির্দেশনা নেই। কে, কবে, কখন, কার নিকট থেকে কথাটি শুনেছেন, কে বলেছেন, তিনি কেমন মানুষ ছিলেন ইত্যাদি কিছুই জানা যায় না। এজন্য ভিত্তিহীন মিথ্যা, কাল্পনিক কাহিনী ও ধর্মীয় নির্দেশনা সব মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। কোন্টি বিশুদ্ধ ও কোন্টি বানোয়াট তা বিচার করার কোনো পথ নেই। পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মে প্রতিটি হাদীসের তথ্য সূত্র সংরক্ষিত রয়েছে। প্রত্যেক পর্যায়ে কজন ব্যক্তি তা বর্ণনা করেছেন, তা মুতাওয়াতির, মাশহূর না একক বর্ণনা তা নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্বোপরি সবকিছুই ডকুমেন্টারী, কোনো কিছুই কোনো ধর্মগুরু বা পন্ডিতের ব্যক্তিগত রুচি বা মতের উপর নির্ভরশীল

পাদরিগণ বলেন: "হাদীস সংকলকগণ এরূপ বর্ণনার অর্ধেকই অগ্রহণযোগ্যতার কারণে বাতিল করে দিয়েছেন।"

তাদের এ কথা ভুল। কারণ হাদীস সংকলক বা মুহাদ্দিসগণ কোনো নির্ভরযোগ্য হাদীস বাতিল করেন নি। তবে তারা সূত্র বিহীন দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর 'দুর্বল' বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা খুবই স্বাভাবিক বিষয়।[219]

নয়।। ইহূদী-খৃস্টান ধর্মে মূল ধর্মগ্রন্থকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় নি, বরং ট্রেডিশন বা হাদীসকেই ধর্মের মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মুক্তির মূল মন্ত্রটিও নাকি ধর্মগ্রন্থে নেই। পক্ষান্তরে ইসলামে কুরআনকেই ধর্মবিশ্বাসের মূল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মীয় আচার-আচরণ ও রীতি-নীতির ব্যাবহারিক ব্যাখ্যার জন্য হাদীস।

[219] খৃস্টান ধর্মগুরুগণও লিখিত সুসমাচার ও পত্র এবং মৌখিক বর্ণনার মধ্যে যাচাইয়ের চেষ্টা করেছেন এবং অনির্ভরযোগ্য বলে অনেক কিছু বাদ দিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর হাদীসের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিচার পদ্ধতি এবং খৃস্টানদের সুসমাচার ও পত্রাবলির বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা বিচার পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, খৃস্টান পন্ডিতগণ একান্তই মন-মর্জির উপরে নির্ভর করে কোনোটি সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন এবং কোনোটি বাতিল বা মিথ্যা বলে গণ্য করেছেন। একে তারা 'অর্থ বিচার' বা 'অর্থগত সমালোচনা' বলে দাবি করেন। অমুক 'সুসমাচার', 'পুস্তকটি' বা 'পত্রটি'র অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়, অর্থাৎ আমার পছন্দ বা মতের সাথে মিলে না, কাজেই তা বাতিল এবং অমুক সুসমাচার, পুস্তক বা পত্রটি অর্থ সঠিক কাজেই তা সঠিক। পক্ষান্তরে মুসলিম মুহাদ্দিসগণ প্রতিটি 'হাদীস' প্রথমে সূত্রগত নিরীক্ষা করেছেন এবং

এরপর অর্থগত নিরীক্ষা করেছেন। প্রথমেই তাঁরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে 'বক্তব্য'টির সূত্র বিচার করেছেন। বক্তব্যটি কে বর্ণনা করেছেন? তিনি কার নিকট থেকে শুনেছেন? অন্য কেউ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন কিনা? বর্ণনাকারীর সকল বর্ণনার তুলনামূলক নিরীক্ষায় তার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে কিনা? ইত্যাদি বিষয় তারা প্রথমে যাচাই করেছেন। যাচাইয়ে যদি বক্তব্যটির বিশুদ্ধতা প্রমাণিত না হয়, তবে তার অর্থ যত সুন্দর বা পছন্দসই হোক তারা তা গ্রহণ করেন নি। আর যাচাইয়ে যদি তার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা তার অর্থ বিচার করেছেন। দ্বিতীয়ত, মুহাদ্দিসগণ বিশুদ্ধ, দুর্বল বা মিথ্যা কোনো বর্ণনাই মুছে ফেলেন নি। সকল বর্ণনাই তারা সনদসহ সংকলন ও সংরক্ষণ করেছেন। কেউ কেউ শুধু বিশুদ্ধ হাদীস পৃথকভাবে সংকলন করেছেন, তবে কেউই দুর্বল বা মিথ্যা বর্ণনার 'অস্তিত্বের অধিকার' অস্বীকার করেন নি। পক্ষান্তরে খৃস্টান ধর্মগুরুগণ তাদের মন-মর্জি বা মতামতের বাইরে সকল বর্ণনার অস্তিত্বের অধিকার অস্বীকার করেছেন। সবকিছু পুড়িয়ে ফেলেছেন এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের পুড়িয়েছেন, হত্যা করেছেন বা অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছেন। তৃতীয়ত, মুহাদ্দিসগণ প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য সংরক্ষণ করেছেন। ফলে বর্তমান যুগেও যে কোনো হাদীসের বিষয়ে মুহাদ্দিসদের মতামত পুনরালোচনার সুযোগ রয়েছে। পক্ষান্তরে খৃস্টান ধর্মগুরুগণ প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যও বিনষ্ট করেছেন। ফলে বর্তমানে তাদের সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনার কোনো সুযোগ নেই। কিসের ভিত্তিতে তারা নতুন নিয়মের পুস্তক ও পত্রগুলি গ্রহণ করলেন এবং অন্যান্য অগণিত সুসমাচার বা পত্র বাতিল করলেন তার কোনো তথ্য সংরক্ষিত নেই।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা দেখছি যে, মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিশুদ্ধ সনদে সংরক্ষিত সহীহ হাদীসের বিষয়ে যে আপত্তি পাদরিগণ উত্থাপন করেন তা একেবারেই ভিত্তিহীন অপপ্রচার মাত্র।

খৃস্টান সম্প্রদায়ের অবস্থা ব্যাখ্যায় এখানে প্রসঙ্গত আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। জন মিলনার ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে মুদ্রিত তার পুস্তকে লিখেছেন: "বর্তমান সময়ের কিছু দিন আগে, জোয়ানা সুয়াতকূট[220] নামক এক মহিলা দাবি করেন যে, আমিই সেই নারী যার বিষয়ে আদিপুস্তকের ৩য় অধ্যায়ের ১৫ আয়াতে ঈশ্বর বলেছেন: "সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে **(it shall bruise thy head)"**, আমার বিষয়েই প্রকাশিত বাক্যের ১২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "১ আর স্বর্গমধ্যে এক মহৎ চিহ্ন দেখা গেল। এক জন স্ত্রীলোক ছিল, সূর্য তাহার পরিচ্ছদ, ও চন্দ্র তাহার পদতলে, এবং তাহার মস্তকের উপরে দ্বাদশ তারার এক মুকুট। ২ সে গর্ভবতী,

---

[220] আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবীর মূল "ইযহারুল হক্ক" গ্রন্থে এ মহিলার নাম এভাবেই লেখা হয়েছে। "মুখতাসারু ইযহারিল হাক্ক"-এর প্রণেতা প্রফেসর ড. মালকাবী লিখেছেন যে, এ মহিলার নাম জোয়ান ডি আর্ক (Jeanne d'Arc) বা ইংরেজিতে (Joan of Arc), যিনি ওরলিন্স-এর কুমারী (the Maid of Orléans) বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি ১৪১২ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জোয়ান ডি আর্ক অতিপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তিনি ফ্রান্স-ইংল্যান্ড যুদ্ধে ফ্রান্সের জাতীয় বীরে পরিণত হন। ইউরোপের প্রচলিত ইতিহাসে তাঁর বিষয়ে এ ঘটনা পাওয়া যায় না।

আর ব্যথিত হইয়া চেঁচাইতেছে, সনতান প্রসবের জন্য ব্যথা খাইতেছে", এবং আমি স্বয়ং যীশুর দ্বারা গর্ভবতী হয়েছি। অনেক খৃস্টান এই মহিলার অনুগামী হন। উক্ত নারীর যীশুকর্তৃক গর্ভবতী হওয়ার কারণে তাঁর অনুগামী খৃস্টানগণ অত্যন্ত আনন্দিত ও উল্লসিত হন। এ স্বর্গীয় শিশুকে অভ্যর্থনা করতে তারা স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার ও উপহারাদি তৈরি করেন।

আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী এ ঘটনার বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন, জন মিলনারের বর্ণনা থেকে আমরা কিছু বিষয় জানতে পারলাম না। উক্ত পবিত্র মহাসৌভাগ্যবান পুত্রও কি পিতার মত ঈশ্বরত্বের মর্যাদা লাভ করেছিলেন কি না? যদি তা করে থাকেন, তবে এতে তার অনুসারীদের ধর্ম বিশ্বাস কি 'ত্রিত্ব' থেকে 'চারত্বে' রূপান্তরিত হয়েছিল কি না? এছাড়া 'পিতা ঈশ্বর' **(God the Father)** এর উপাধি পরিবর্তন করে 'দাদা ঈশ্বর' করা হয়েছিল কি না?

তাহলে পাদরি মহোদয়দের সমগোত্রীয় ও স্ব-সম্প্রদায়ের মানুষদের কুসংস্কারের মাত্রা দেখুন! যাদের জ্ঞান-বুদ্ধির এ অবস্থা তাদের কি অধিকার আছে ইসলাম, ইসলামের পবিত্র-পুস্তক ও ইসলামের মহান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে কটুক্তি করার?

হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে ঈমান ও সুপথে পরিচালিত করুন এবং বিভ্রান্তি ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করুন।

চতুর্থ অধ্যায়: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াত

এ অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে:

প্রথম পরিচ্ছেদ: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম**)-এর নুবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ**

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম**) সম্পর্কে পূর্ববর্তী নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী**

প্রথম পরিচ্ছেদ:
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের প্রমাণ

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের সত্যতার বড় প্রমাণ কুরআন কারীম। এর অলৌকিকত্ব, ভবিষ্যদ্বাণী, বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সবই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের অকাট্য প্রমাণ। এ ছাড়াও তাঁর জীবনই তাঁর নুবুওয়াতের অকাট্য প্রমাণ। যে কোনো নিরপেক্ষ গবেষক তাঁর মহান জীবন বিশুদ্ধ সূত্র থেকে পাঠ করলে এ গবেষকের সামনে তাঁর নুবুওয়াতের সত্যতা প্রতিভাত হবেই। খৃস্টধর্মীয় পাদরি ও প্রচারকদের অপপ্রচারের প্রেক্ষাপটে আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের সত্যতার পক্ষে বিভিন্ন প্রমাণ পেশ করেছেন। এখানে অল্প কিছু বিষয়ের সার-সংক্ষেপ আলোচনা করা হলো:

৪. ১. ১. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অলৌকিক চিহ্ন-কার্য

পূর্ববর্তী নবীগণের ন্যায় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কেও মহান আল্লাহ অনেক মুজিযা বা অলৌকিক নিদর্শন ও চিহ্ন-কার্য প্রদান করেছেন। কুরআন ছাড়া বাকি মুজিযাকে দুভাগে ভাগ করা যায়:

৪. ১. ১. ১. অতীত ও ভবিষ্যতের অজানা সংবাদ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতীত ও ভবিষ্যতের অনেক অজানা বিষয় বলেছেন। অতীত বিষয়াবলির মধ্যে অন্যতম পূর্ববর্তী নবীগণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগণ বিষয়ক সংবাদাদি। তিনি কারো নিকট থেকে এগুলি শ্রবণ করেন নি। কোনো গ্রন্থ থেকে তিনি এগুলি পাঠ করেন নি। এ দিকে ইঙ্গিত করে কুরআনে আল্লাহ বলেছেন: "এ সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি, যা এর আগে তুমি জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানত না।"[221]

অতীত নবীগণ ও জাতিগণের বর্ণনায় বাইবেলের বিবরণের সাথে কুরআনের বিবরণের কিছু পার্থক্য রয়েছে। মহান আল্লাহ সত্যের প্রকাশ ও বাইবেলের বিকৃতি উদ্ঘাটনের জন্যই এ বিষয়গুলি প্রকাশ করেছেন।[222] এ বিষয়ে মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন: "ইস্রায়েল-

---

[221] সূরা হূদ, ৪৯ আয়াত।

[222] কুরআন ও বাইবেলের এ পার্থক্য সুনিশ্চিতরূপে কুরআনের ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অলৌকিকত্ব ও সত্যতা প্রমাণ করে। আমরা দেখেছি, আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সকল পার্থক্যের ক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনাই সঠিক ও বাইবেলের বর্ণনা ভুল। ডা. মরিস বুকাইলি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সন্তানগণ যে সকল বিষয়ে মতভেদ করে এ কুরআন তার অধিকাংশ তাদের নিকট বিবৃত করে।’’[223]

ভবিষ্যতের বিষয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সংবাদ প্রদান করেছেন, যেগুলি পরবর্তী সময়ে যথাযথভাবে সংঘটিত হয়ে তার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত করেছে। এ সকল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে রয়েছে:

(১) তিনি সাহাবীগণকে মক্কা, যিরূশালেম, ইয়েমন, সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, নিরাপত্তাহীনতা ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়ে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে, এমনকি একজন একাকী নারী উত্তর-পূর্ব আরবের হীরা শহর[224] থেকে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ পথ ভ্রমন করতে আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পাবে না। খাইবার বিজয়ের আগের দিন তিনি সংবাদ দেন যে, আগামীকাল আলীর (রা) হাতে খাইবারের পতন ঘটবে। তিনি সাহাবীগণকে জানান যে, তারা পারস্য সম্রাট ও রোমান (বাইজান্টাইন) সম্রাটের ধনভান্ডার বণ্টন করবেন এবং পারসীয়দের মেয়েরা তাঁদের খেদমত করবে।

---

[223] সূরা (২৭) নামল: ৭৬ আয়াত।

[224] বর্তমান ইরাকের কূফা শহরের প্রায় ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি প্রাচীন আরবীয় রাজ্য।

তিনি আরো বলেন, পারস্য সাম্রাজ্য একটি বা দুটি ধাক্কা, এরপর আর পারস্য সাম্রাজ্য থাকবে না। আর রোম অনেক শিঙ বিশিষ্ট, একটি শিঙ ধ্বংস হলে অন্য শিঙ তার স্থান দখল করবে। বহুদূর শেষ যুগ পর্যন্ত তারা পাথর ও সমূদ্রের অধিবাসী। এ হাদীসে পারস্য বলতে সাসানীয় সাম্রাজ্য ও রোম বলতে ইউরোপীয়গণকে বা পূর্ব ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যকে (Byzantine Empire & Holy Roman Empire) বুঝানো হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন তাই ঘটেছে।

(২) তিনি বলেন যে, উমার (রা) যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন অশান্তি-বিশৃঙ্খলা প্রকাশিত হবে না। অবস্থা তাই হয়েছিল। উমারের (রা) জীবদ্দশায় মুসলিম সমাজে অশান্তি প্রকাশিত হয় নি। তিনি অশান্তি-বিশৃঙ্খলার দরজা উন্মোচনের পথে বাঁধা ছিলেন।

(৩) তিনি বলেন, উসমান (রা) কুরআন পাঠরত অবস্থায় নিহত হবেন। আলীর (রা) দাড়িকে তাঁর মাথার রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করবে যে ব্যক্তি- অর্থাৎ আলীকে (রা) যে হত্যা করবে- সেই সবচেয়ে দুর্ভাগা। উসমান (রা) ও আলী (রা) উভয়েই- তিনি যেভাবে বলেছেন সেভাবেই- শহীদ হন।

(৪) তিনি বলেন, সাকীফ গোত্রের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন ধ্বংসকারী খুনির আবির্ভাব হবে। মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, এই মিথ্যাবাদী ব্যক্তি ছিল সাকীফ গোত্রের

মুখতার ইবনু আবূ উবাইদ (মৃত্যু ৬৭হি/৬৮৭খৃ), যে নিজেকে নবী বলে দাবি করে এবং বসরার আমীর মুসআব ইবনু যুবাইর তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন। আর ধ্বংসকারী খুনি ছিল হাজ্জাজ ইবন ইউসূফ (মৃত্যু ৯৫হি/৭১৪খৃ)।

(৫) ফিলিস্তিন বা যিরূশালেম বিজয়ের পরে মহামারী দেখা দেবে। তিনি যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই তা ঘটে। উমারের (রা) শাসনামলে ফিলিস্তিন বিজয়ের তিন বৎসর পরে যিরুশালেম থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে ইমওয়াস শহরে এ মহামারীর আবির্ভাব ঘটে। এখানে মুসলিম বাহিনীর সেনা ক্যাম্প ছিল। এ ছিল ইসলামের আগমনের পরে মুসলিম সমাজের প্রথম মহামারী। এতে তিন দিনের মধ্যে ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় প্রায় ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে।[225]

(৬) তিনি মহিলা সাহাবী উম্মু হারাম বিনতু মিলহান (রা)-কে বলেন যে, তিনি একদল মুসলিমের সাথে সমূদ্র পথে যুদ্ধে যাত্রা করবেন। ২৭ হি/৬৪৭ খৃ উসমান (রা)-এর শাসনামলে যখন মু'আবিয়া সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন, তখন উম্মু হারাম ও তাঁর স্বামী সিরিয়া থেকে মুসলিম যোদ্ধাদের সাথে সাইপ্রাস অভিযানে বের হন। সমূদ্র পার হয়ে সাইপ্রাসের উপকূলে অবতরণের পরে তাঁর বাহন থেকে পড়ে তিনি তথায় নিহত ও সমাধিস্থ হন।

---

[225] অন্য বর্ণনায় ২৫ হাজার মানুষ এই মহামারীতে মৃত্যুবরণ করেন, যাদের মধ্যে ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় অবস্থানরত অনেক মুসলিম যোদ্ধাও ছিলেন।

(৭) তিনি ইন্তেকালের আগে জানান যে, তাঁর বংশের মধ্যে সর্বপ্রথম ফাতিমাই (রা) তাঁর কাছে গমন করবেন। কার্যত তাই হয়। তাঁর মৃত্যুর ৬ মাস পরে ১১ হিজরীর রামাদান মাসে ফাতিমা (রা) মৃত্যুবরণ করেন।

(৮) তিনি বলেন যে, আমার এই সন্তান- অর্থাৎ হাসান ইবনু আলী (রা)- একজন মহান নেতা; আল্লাহ তার দ্বারা আমার উম্মতের দুটি বৃহৎ দলের মধ্যে শান্তি ও সন্ধি স্থাপন করবেন। কার্যত তাই হয়েছিল। ৪০ হিজরীর রামাদান মাসে আলী (রা)-এর শাহাদাতের পরে তিনি খলীফা হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করেন। ৬ মাস তিনি দায়িত্ব পালন করেন। এরপর মু'আবিয়া (রা)-এর নেতৃত্বাধীন সিরিয়ার মুসলিমগণ এবং হাসানের নেতৃত্বাধীন অন্যান্য এলাকার মুসলিমগণের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ঘটার উপক্রম হয়। তিনি মুসলিমদের পারস্পরিক যুদ্ধ অপছন্দ করতেন। এজন্য ৪১ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে তিনি মুআবিয়া (রা)-এর পক্ষে খিলাফত ত্যাগ করেন। এতে মুসলিম উম্মাহ গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা পায়। এ জন্য এ বৎসরকে 'আমুল জামাআত' বা ঐক্যের বৎসর বলা হয়।

(৯) তিনি বলেন যে, তাঁর দৌহিত্র হুসাইন ইবনু আলী (রা) তাফ্ফ নামক স্থানে শহীদ হবেন। ফুরাত নদীর তীরে কুফার নিকটবর্তী একটি এলাকার নাম তাফ্ফ। পরবর্তীকালে তা কারবালা

নামে খ্যাত। পরবর্তীকালে ৬১ হিজরীতে (৬৮০ খৃস্টাব্দে) হুসাইন তথায় শহীদ হন।

(১০) তিনি সুরাকা ইবনু জাশ'আমকে (রা) বলেন, তিনি কিসরার বালাগুলি পরিধান করবেন। পারস্য বিজয়ের পরে যখন কিসরার মহামূল্যবান মনিমুক্তখচিত বালাগুলি উমারের (রা) নিকট আনয়ন করা হয় তখন তিনি তা সুরাকাকে পরিধান করান এবং বলেন, প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এগুলিকে কিসরার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং সুরাকাকে পরিধান করিয়েছেন।

(১১) উত্তর আরবের দাওমাতুল জান্দালের শাসক উকাইদিরের নিকট খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে (রা) প্রেরণ করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদকে বলেন, তুমি যেয়ে দেখতে পাবে যে, সে মরুভূমিতে বন্যগরু শিকারে ব্যস্ত রয়েছে। খালিদ তথায় যেয়ে তাকে সে অবস্থাতেই পান।

(১২) তিনি বলেন যে, ভবিষ্যতে হিজাজ থেকে একটি অগ্নি নির্গত হবে যার আভায় সিরিয়ার বুসরা শহরের উটগুলির ঘাড় আলোকিত হয়ে যাবে। ৬৫৪ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে (১২৫৬খৃ) মদীনার নিটকবর্তী প্রান্তর থেকে একটি বিশাল আগুন প্রকাশিত হয়।[226]

---

[226] সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ সিরিয় ঐতিহাসিক আব্দুর রাহমান ইবনু ইসমাঈল আবূ শামা (৫৯৯-৬৬৫ হি/ ১২০২-১২৬৭ খৃ) এ বিষয়ে অসংখ্য অগণিত প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সাক্ষ্য ও লিখিত বিবরণ সংকলন করেন। সমসাময়িক অন্য প্রসিদ্ধ

ক্রমান্বয়ে অগ্নির প্রকম্পন ও আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। বারংবার ভূকম্পন হয়। লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আল্লাহর কাছে কাঁদাকাটা করতে থাকে। অগ্নির আন্দোলন অব্যাহত থাকে। মদীনাবাসীগণ নিশ্চিত হন যে, তাদের ধ্বংস সন্নিকটে। আগুনের শিখা উপরে উঠতে উঠতে এমন তীব্রতা ধারণ করে যে, মানুষের দৃষ্টি আবৃত করে ফেলে। মক্কা থেকে এবং সিরিয়ার বুসরা থেকেও এই অগ্নি দৃষ্ট হয়। প্রায় তিনমাস প্রজ্জ্বলিত থাকার পরে রজব মাসের ২৭ তারিখে, মেরাজের রাত্রিতে আগুন নিভে যায়।

ইতিহাসের গ্রন্থগুলিতে এ অগ্নির বিবরণ রয়েছে। এছাড়া এর বিবরণে পৃথক পুস্তক রচনা করা হয়েছে। এ অগ্নি প্রকাশিত হওয়ার ৪০০ বৎসর পূর্বে ইমাম বুখারী তাঁর সংকলিত হাদীসগ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করেছেন।

৪. ১. ১. ২. মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বারা সম্পাদিত অলৌকিক কর্মসমূহ

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক অলৌকিক কর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি। এগুলির মধ্যে রয়েছে:

মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ইয়াহইয়া ইবনু শারাফ নববী (৬৩১-৬৭৬হি) এবং অন্যান্য সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও আলিম এ বিষয়ে লিখেন। গ্রন্থকার তাদের বর্ণনার সারসংক্ষেপ এখানে উদ্ধৃত করেছেন।

(১) ইসরা ও মি'রাজ: অলৌকিকভাবে রাত্রিভ্রমন ও ঊর্ধ্বগমন

মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন: "পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রজনীযোগে ভ্রমন করিয়েছেন মসজিদুল হারাম (মক্কার মসজিদ) থেকে মসজিদুল আকসা (যিরূশালেমের মসজিদ) পর্যন্ত, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য।"[227]

এ আয়াত এবং বহুসংখ্যক সহীহ হাদীস প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মিরাজে গমন করেন। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে তা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত। উপরন্তু এই আয়াতটিও তা প্রমাণ করে। কারণ 'বান্দা' বলতে কুরআনে সর্বত্র আত্মা ও দেহের সমন্বিত মানুষকেই বুঝানো হয়েছে। এছাড়া আমরা জানি যে, কাফিরগণ ইসরা ও মি'রাজ (নৈশভ্রমন ও ঊর্ধ্বারোহ) অস্বীকার করে এবং একে অসম্ভব বলে দাবি করে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিরাজের কথা বললেন তখন কতিপয় দুর্বল ঈমান মুসলিম একে অসম্ভব মনে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তের বিষয়ে সন্দীহান হয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করে। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[227] সূরা ইসরা (বনী ইসরাঈল), ১ আয়াত।

জাগ্রত অবস্থায় দৈহিকভাবে মিরাজ সংঘটিত হওয়ার কথাই বলেছিলেন। নইলে কাফিরদের অস্বীকার করার ও দুর্বল ঈমান মুসলিমদের ঈমান হারানোর কোনো কারণই থাকে না। স্বপ্নে এরূপ নৈশভ্রমন বা স্বর্গারোহণ কোনো অসম্ভব বা অবাস্তব বিষয় নয় এবং এরূপ স্বপ্ন দেখার দাবি করলে তাতে অবাক হওয়ার মত কিছু থাকে না। যদি কেউ দাবি করে যে, ঘুমের মধ্যে সে একবার পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে এবং একবার পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে চলে গিয়েছে, তবে তার দেহ স্বস্থানেই রয়েছে এবং দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হয় নি, তবে কেউ তার এরূপ স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা অস্বীকার করবে না বা এতে অবাকও হবে না।

জ্ঞান, বিবেক বা মানবীয় বুদ্ধির দৃষ্টিতে এবং ধর্মগ্রন্থাবলির নির্দেশনার আলোকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরের এরূপ অলৌকিক নৈশভ্রমন ও ঊর্ধ্বারোহণ অসম্ভব নয়।

জ্ঞান, যুক্তি ও বিবেকের দৃষ্টিতে তা অসম্ভব নয় এজন্য যে, এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা সকল যৌক্তিক ও বিবেকগ্রাহ্য কাজ করতে সক্ষম। অতিদ্রুতগতিতে কোনো প্রাণী বা জড় পদার্থকে স্থানান্তর করা জ্ঞান-বিবেকের দৃষ্টিতে অসম্ভব নয়। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে স্থানান্তর করা একটি যৌক্তিক ও

সম্ভব বিষয় যা আল্লাহ করতে পারেন।[228] শুধু এতটুকু বলা যায় যে, বিষয়টি অসম্ভব নয়, তবে অস্বাভাবিক বা সাধারণ নিয়মের বাইরে। সকল অলৌকিক কর্মই অস্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক বলেই তো অলৌকিক চিহ্ন বলে গণ্য করা হয়।

ধর্মগ্রন্থাদির নির্দেশনার আলোকেও তা অসম্ভব নয়। ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, মানুষের জন্য সশরীরে বা জড় দেহ সহ ঊর্ধ্বলোকে বা স্বর্গে গমন সম্ভব।

(ক) আদিপুস্তক ৫/২৪: "হনোক (Enoch) ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন। পরে তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন (And Enoch walked with God: and he was not; for God took him)।" এভাবে বাইবেল সুস্পষ্টভাবে বলছে যে, হনোক ভাববাদী বা ইদরীস আলাইহিস সালাম-কে জীবিত অবস্থায় সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেন।

(খ) ২ রাজাবলির ২ অধ্যায়ে রয়েছে: "১ পরে যখন সদাপ্রভু এলিয়কে (Elijah) ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গে তুলিয়া লইতে উদ্যত হইলেন, তখন এলিয় ও ইলীশায় (Elisha) গিল্গল হইতে যাত্রা করিলেন। ... ১১ পরে এইরূপ ঘটিল; তাঁহারা যাইতে যাইতে কথা কহিতেছেন,

---

[228] গ্রন্থকারের যুগে আলোর গতি, সময় ও স্থান সম্পর্কে আধুনিক তথ্যাদি আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাকে শুধু সম্ভাবনার কথাই বলতে হয়েছে। পরবর্তী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার মিরাজের সত্যতা প্রমাণিত করেছে।

ইতিমধ্যে দেখ, অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্বগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে পৃথক করিল, এবং এলিয় ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গে উঠিয়া গেলেন।" এখানেও বাইবেল সুস্পষ্টভাবে বলছে যে, এলিয় জীবিত অবস্থায় স্বর্গে উত্থিত হয়েছেন।

এ দুটি বক্তব্য খৃস্টান পাদরীগণের নিকট ঈশ্বরের বাণী ও অভ্রান্ত সত্য হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়া তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, যীশু খৃস্ট ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার তিনদিন পরে পুনরুত্থিত হন এবং সশরীরে স্বর্গে গমন করেন এবং তার পিতার দক্ষিণে বসেন। কাজেই জ্ঞান, বিবেক, যুক্তি বা ধর্মের দোহাই দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মি'রাজ অস্বীকার করার কোনো সুযোগ পাদরিগণের নেই।

(২) চন্দ্র খন্ডিত করা

মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন: "কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা কোনো নিদর্শন (অলৌকিক চিহ্ন) দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এ তো চিরাচরিত যাদু।"[229]

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইঙ্গিতে চন্দ্র বিদীর্ণ ও খন্ডিত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[229] সূরা কামার, ১-২ আয়াত।

এ বিষয়ক হাদীসগুলি 'মুতাওয়াতির' বা অতি-প্রসিদ্ধ ভাবে বর্ণিত। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে হাদীসগুলি সংকলিত।[230]

কুরআনে উল্লিখিত ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এই অলৌকিক চিহ্ন পাদরিগণ অস্বীকার করতে চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তাদের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী বিভ্রান্তি হলো, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনাটি সত্যই ঘটতো, তবে পৃথিবীর কারো কাছেই তা অজ্ঞাত থাকত না এবং বিশ্বের ঐতিহাসিকগণ তা উল্লেখ করতেন।

এ বিভ্রান্তির অপনোদনে আমাদের বক্তব্য এই যে, পাদরিগণের এ মহাযুক্তি এবং সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণটি ধর্মগ্রন্থাদির নির্দেশনার আলোকে অত্যন্ত দুর্বল এবং জ্ঞান-বিবেক ও যুক্তির আলোকেও অত্যন্ত দুর্বল। নিম্নের বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন:

(ক) বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে নোহের জলপ্লাবন ছিল বিশ্বব্যাপী এবং অত্যন্ত বড় ঘটনা। আদিপুস্তকের ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে তা উল্লেখ

---

[230] বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য সহীহ হাদীসের গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা), আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রা), আনাস ইবনু মালিক (রা), জুবাইর ইবনু মুতয়িম (রা) ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এই ৬ জন সাহাবী থেকে প্রায় ২০টি পৃথক সনদে এ বিষয়ক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

করা হয়েছে।[231] অথচ ভারতী, পারসীয়, কালদীয় (Chaldeans) ও চীনা ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ এ ঘটনা কঠিনভাবে অস্বীকার করেন; কারণ তাদের ইতিহাসগ্রন্থে এর কোনোরূপ উল্লেখ নেই। পাদরিগণের স্বজাতি ইউরোপীয় নাস্তিকগণ এই মহাজলপ্লাবনের কথা অস্বীকার করেন এবং এ বিষয়ক বাইবেলীয় বর্ণনা নিয়ে উপহাস করেন।

খৃস্টান পাদরিগণ কি এসকল দেশের পণ্ডিতদের অস্বীকার বা ইউরোপীয় নাস্তিকদের উপহাসের কারণে নোহের প্লাবনের কথা অস্বীকার করবেন বা একে অবাস্তব ও অসম্ভব বলে মেনে নিতে রাজি হবেন?

(খ) যিহোশূয়ের পুস্তকের ১০ অধ্যায়ের ১২-১৩ শ্লোকে যিহোশূয় (Joshua) ভাববাদীর যুদ্ধ জয়ের জন্য পূর্ণ একদিন সূর্যকে মধ্যগগণে আটকে রাখার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। (আর আকাশের মধ্যস্থানে সূর্য স্থির থাকিল, অস্ত গমন করিতে প্রায় সম্পূর্ণ এক দিবস অপেক্ষা করিল (So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day)। ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিত ও বাইবেল ব্যাখ্যাকারগণ উল্লেখ করেছেন যে, পূর্ণ ২৪ ঘন্টা

---

[231] বাইবেলের বিবরণ অনুসারে ইহূদী-খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, এ মহাপ্লাবন এখন (২০০৯ সাল) থেকে মাত্র ৪ থেকে সাড়ে ৪ হাজার বৎসর পূর্বে সংঘটিত হয়।

সূর্য মধ্যগগণে থেমে থাকে। এ ঘটনাটি খুবই বড় ঘটনা। খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, খৃস্টের জন্মের ১,৪৫০ বৎসর পূর্বে এই ঘটনা ঘটে। যদি তা সত্যিই ঘটে থাকত, তবে বিশ্বের সকলের জন্যই তা প্রকাশ পেত। এ কথা তো স্পষ্ট যে, গভীর মেঘ থাকলেও এই ঘটনা কারো অজ্ঞাত থাকে না। আবার দূরত্বের কারণেও তা না জানার কোনো সুযোগ নেই। এ সময়ে যে সকল দেশে রাত ছিল সে সকল দেশের মানুষেরাও বিষয়টি নিশ্চিত জানতেন; কারণ কোথাও যদি ২৪ ঘন্টা রাত দীর্ঘায়িত হয় তবে তা তাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করবে এবং তারা সকলেই তা জানবেন। অথচ এত বড় ঘটনাটি ভারতের হিন্দুদের কোনো গ্রন্থে লিখিত হয় নি। চীন ও পারস্যের মানুষেরাও তা জানতে পারে নি। আমি ভারতীয় হিন্দু পণ্ডিতদেরকে এই বিষয়টি অস্বীকার করতে শুনেছি। তারা বলেন যে, ঘটনাটি নিঃসন্দেহে ভিত্তিহীন ও বাতুল। পাদরিগণের স্বজাতি ইউরোপীয় নাস্তিকগণ এই ঘটনা অস্বীকার করেন এবং এ নিয়ে উপহাস করেন। তারা এ বিষয়ক বাইবেলীয় বর্ণনার বিষয়ে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করেন।

এখন প্রশ্ন হলো, কোনো ইতিহাসে উল্লেখ না থাকা, বিশ্বের কোনো মানুষের না জানা, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের এ ঘটনাটি অস্বীকার করা এবং পাশ্চাত্য নাস্তিকদের উপহাস ও

আপত্তির কারণে কি এ ঘটনাকে অবাস্তব, মিথ্যা ও বাতুল বলে মানতে খৃস্টান পাদরিগণ রাজি হবেন?

(গ) মথিলিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ে রয়েছে: "৫১ আর দেখ, মন্দিরের তিরস্করিণী (veil) উপর হইতে নিচ পর্যনত চিরিয়া দুইখান হইল, ভূমিকম্প হইল, ও শৈল সকল বিদীর্ণ হইল, ৫২ এবং কবর সকল খুলিয়া গেল, আর অনেক নিদ্রাগত পবিত্র লোকের দেহ উত্থাপিত হইল (many bodies of the saints which slept arose), ৫৩ এবং তাঁহার পুনরুত্থানের পর তাঁহারা কবর হইতে বাহির হইয়া পবিত্র নগরে প্রবেশ করিলেন, আর অনেক লোককে দেখা দিলেন (And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many) [232]।

এখানে মন্দিরের গিলাফ বা পর্দা আগাগোড়া ছিড়ে যাওয়া, ভূমিকম্প হওয়া, পাথর বিদীর্ণ হওয়া, কবর খুলে যাওয়া, অনেক মৃত বুজুর্গের কবর থেকে জীবিত উঠে আসা, তাদের যিরূশালেমে প্রবেশ করা ইত্যাদি অনেক মহা আশ্চর্যকর মহান ঘটনার কথা উল্লেখ করা

---

[232] এ কথা থেকে বুঝা যায় যে, কবর থেকে উত্থিত হওয়ার পরে তিন দিবস তারা কবরের নিকটেই বসে ছিলেন। যীশুর পুনরুত্থানের পরে তারা দল বেঁধে যিরূশালেমে প্রবেশ করে মানুষদেরকে দেখা দেন। আর যীশু গোপনে শুধু তার শিষ্যদেরকে সাক্ষাত দেন!

হয়েছে। নিঃসন্দেহে মথির এ বর্ণনা মিথ্যা। তবে আমরা শুধু বলতে চাই যে, এ সকল ঘটনা কিছুই ইয়াহূদীদের ইতিহাসে ও রোমানদের ইতিহাসে উল্লেখ করা হয় নি। যোহনলিখিতি সুসমাচারেও এগুলির কোনো উল্লেখ নেই। মাক ও লূক শুধু পর্দা ছেড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। বাকি এত বড় অলৌকিক বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নি। অথচ তারা ক্রুশবিদ্ধ যীশুর কান্নাকাটি ও চিৎকারের কথা ও অনেক গুরুত্বহীন কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ মৃতদের দল ধরে কবর থেকে উঠে আসা, যিরুশালেমে যেয়ে জনগণের সাথে দেখাসাক্ষাত করা ইত্যাদি বিষয় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর পাথর ফেঁটে যাওয়া, কবর ফেঁটে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় ঘটার পরে তার চিহ্ন থেকে যায়।

অবাক বিষয় যে, এ সকল মৃত সাধু কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পরে কি করলেন তা কিছুই মথি লিখলেন না! [233] এ সকল

---

[233] খৃস্টানগণের দাবি অনুসারে পারলৌকিক মুক্তির জন্য কোনো কর্ম, সততা বা ধর্মপালন জরুরী নয়, বরং একটিমাত্র বিশ্বাস জরুরী, যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র, তিনি মানুষের পাপের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আর যীশুর আগমনের উদ্দেশ্যও ছিল এই উৎসর্গ। মুলত যীশু কোনো আদর্শ বা কর্ম শিক্ষা দিতে আসেন নি, বরং নিজেকে উৎসর্গ করে মানব জাতিকে মুক্তি দেওয়াই তার উদ্দেশ্য ছিল। যদি যীশু একটু কষ্ট করে পুনরুত্থানের পরে এ সকল মৃত সাধুদের সাথে যিরূশালেমের সকলকে, বিশেষত পীলাত ও ইহূদীগণের সাথে সাক্ষাত করতেন তাহলে তার উৎসর্গের বিষয়টি তারা নিশ্চিতরূপে জানতেন

সাধু বা পবিত্র মানুষ যিরূশালেমের মানুষদেরকে দেখা দেওয়ার পরে কি করলেন তা মথি লিখেন নি। তারা কি পুনরায় তাদের কবরে ফিরে গিয়েছিলেন? না কি তারা জীবিতই রয়ে গিয়েছিলেন? কোনো কোনো রসিক ব্যক্তি বলেন, সম্ভবত মথি একাই এ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঘুমন্ত অবস্থায়!

উল্লেখ্য যে, লূকের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, মন্দিরের তিরস্করিণী (veil) চিরে গিয়েছিল যীশুর মৃত্যুর পূর্বে। পক্ষান্তরে মথি ও মার্কের বিবরণ এর বিপরীত। এখন প্রশ্ন হলো, পাদরিগণ এ বিষয়গুলির কি উত্তর দিবেন?

(ঘ) মার্ক ১/১০-১১, মথি ৩/১৬-১৭ ও লূক ৩/২১-২২-এর যোহন বাপ্তাইজকের নিকট যীশুর বাপ্তাইজিত হওয়ার বিবরণে নিম্নের কাহিনীটি রয়েছে: "আর তৎক্ষণাৎ জলের মধ্য হইতে উঠিবার সময়ে দেখিলেন, আকাশ দুইভাগ হইল, এবং আত্মা কপোতের ন্যায় তাঁহার উপরে নামিয়া আসিতেছেন। আর স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, তুমিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।" এ মার্কের ভাষা, অন্যদের ভাষাও প্রায় একই।

এবং কোনোরূপ সন্দেহ ছাড়াই বিশ্বের সকলেই তা জানতে পারতেন। মানুষের মুক্তি নিশ্চিত হতো! কিন্তু তা না করে তাঁরা কাদের সাথে দেখা সাক্ষাত করলেন?

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রকাশ্য দিবালোকে আকাশ দুভাগ হয়ে গেল! কাজেই বিষয়টি বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের কাছেই অজানা থাকার কথা নয়। অনুরূপভাবে কপোতের নেমে আসা প্রত্যক্ষ করা এবং ঊর্ধ্বাকাশ থেকে আগত বাণী বা শব্দ শ্রবণ করাও কারো একক বিষয় নয়। অন্তত উপস্থিত সকলেই তা দেখবেন ও শুনবেন। অথচ সুসমাচার লেখকগণ ছাড়া বিশ্বের আর কেউই এ সকল বিষয়ে কিছই লিখেন নি! আর এজন্যই পাশ্চাত্যের নাস্তিকগণ এ ঘটনা সম্পর্কে উপহাস করে বলেন: মথি আমাদেরকে অত্যন্ত বড় সংবাদ থেকে বঞ্চিত করেছেন। যখন আকাশের দরজা খুলে গেল, তখন কি আকাশের বড় দরজাগুলি খুলেছিল? না মাঝারি দরজাগুলি? না ছোট দরজাগুলি? আর এই দরজাগুলি সূর্যের এদিকে ছিল না ওদিকে? মথির এই ভুলের কারণে আমাদের পাদরিগণ দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মাথা নাড়াতে থাকেন। মথি আমাদের এই কপোতের সংবাদও দিলেন না! কপোতটিকে কি কেউ ধরে খাঁচায় ভরেছিল? নাকি সেটিকে তারা আবার আকাশে ফিরে যেতে &&দখেছিলেন? যদি ফিরে যেতে দেখেন, তবে বুঝতে হবে যে, আকাশের দরজাগুলি এই দীর্ঘ সময় উন্মুক্তই ছিল। তাহলে কি তারা এ সময়ে আকাশের অভ্যন্তরভাগ ভাল করে দেখে নিয়েছিলেন? পাদরিগণ এ সকল প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন?

উপরের আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চন্দ্র বিদীর্ণ করার বিষয়ে পাদরিগণের আপত্তি ভিত্তিহীন ও বাতিল।

(৩) অলৌকিকভাবে পানি বৃদ্ধি করা

বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র আঙুলগুলির মধ্য থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছে। আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, "আসরের সালাতের সময় ঘনিয়ে আসল। লোকজন অনুসন্ধান করেও ওযূর জন্য কোনো পানি যোগাড় করতে পারলেন না। তখন আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একটি পাত্রে অল্প কিছু ওযূর পানি আনয়ন করা হলো। তিনি তার পবিত্র হস্ত সেই পাত্রের মধ্যে রাখেন এবং সকল মানুষকে নির্দেশ দেন সেখান থেকে ওযূ করার। তখন আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আঙ্গুলগুলির মধ্য দিয়ে ঝর্ণার মত পানি প্রবাহিত হচ্ছে। উপস্থিত মানুষেরা সেই পানি দিয়ে ওযূ করল। এমনকি সর্বশেষ মানুষটিও তা দিয়ে ওযূ করে নিলেন। এই মুজিযাটি সংঘটিত হয়েছিল মদীনার বাজারের নিকট যাওরা নামক স্থানে।

জাবির (রা) বলেন, হুদাইবিয়ার দিনে মানুষজন পিপাসার্ত হয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একটি ছোট্ট পাত্রে সামান্য কিছু পানি ছিল। তিনি সেই পানি দিয়ে ওযূ করলেন। তখন লোকজন তাঁর নিকট এসে বলেন, আপনার এই

পাত্রের পানিটুকু ছাড়া আমাদের নিকট আর কোনো পানি নেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হস্ত পাত্রটির মধ্যে রাখেন। এতে তাঁর আঙুলগুলির ফাঁক দিয়ে ঝর্ণার মত পানির ফোয়ারা বেরিয়ে আসতে লাগল। তখন উপস্থিত সকলেই সেই পানি পান করলেন এবং তা দিয়ে ওযূ করলেন। উপস্থিত মানুষদের সংখ্যা ছিল ১৪০০।

জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জাবির, তুমি ওযূর জন্য ঘোষণা দাও। তিনি বলেন শিবিরে কারো কাছে কোনো পানি ছিল না। অনুসন্ধান করে একটি চামড়ার পাত্রে তলানিতে এক ফোঁটা পানি পাওয়া গেল। এক ফোঁটা পানি সহ সেই পাত্রটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আনয়ন করা হয়। তিনি পাত্রের উপর হাত রাখলেন এবং কিছু কথা বললেন, যা আমি বুঝতে পারলাম না। এরপর তিনি বললেন, কাফেলার বড় পাত্রটি নিয়ে এস। তখন পাত্রটি এনে তাঁর সামনে রাখা হলো। তিনি তাঁর হাতটি পাত্রটির মধ্যে রাখলেন এবং আঙুলগুলি ফাঁক করলেন। জাবের তাঁর নির্দেশে এক ফোঁটা পানি তাঁর হাতের উপর ঢাললেন। তিনি বললেন, বিসমিল্লাহ। জাবির বলেন, তখন আমি দেখলাম যে, তাঁর আঙুলের মধ্য দিয়ে পানির ফোয়ারা বের হয়ে আসছে। পাত্রটি পানিতে ভরে গেল এবং পানি পাত্রের বাইরে প্রবাহিত হতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম সকল মানুষকে নির্দেশ দিলেন পানি পান করতে। তখন সকলেই তৃপ্তির সাথে পানি পান করলেন। যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে, শিবিরে আর কারোরই কোনো পানির প্রয়োজন নেই তখন তিনি পাত্রটির মধ্য থেকে তার হাত উঠিয়ে নিলেন। পাত্রটি তখনও পরিপূর্ণ ছিল। এ মুজিযাটি বুওয়াত যুদ্ধের সময় ঘটেছিল।

তাবূক যুদ্ধের বিবরণে মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, পানির জন্য তাঁরা তাবূকের একটি স্রোতস্বিনী বা মরুভূমির ছোট্ট ঝর্ণার (spring) নিকট গমন করেন। ঝর্ণাটি মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিল এবং এর তলায় পায়ের গোড়ালি পরিমাণ সামান্য পানির প্রবাহ ছিল। তখন তাঁরা হাত দিয়ে অল্প অল্প করে কিছু পানি একটি পাত্রে জমা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পানি দিয়ে তাঁর হাত ও মুখ ধৌত করে আবার তা উক্ত ঝর্ণার মধ্যে ফেরত দেন। তখন ঝর্ণাটি পানিতে ভরে যায়। শিবিরের সকল মানুষ সেই পানি পান করেন। ইবনু ইসহাকের বর্ণনায়, পানির গতি এমন বৃদ্ধি পেল যে, পানির মধ্য থেকে মেঘগর্জনের ন্যায় গর্জন শোনা গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মু'আয, তোমার আয়ু দীর্ঘ হলে হয়ত তুমি দেখতে পেতে যে, এই স্থানের সব কিছু গাছপালা ও ফল-ফসলের সবুজে ভরে গিয়েছে।[234]

---

[234] এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে তাবুকের এ সকল অঞ্চল ভবিষ্যতে সবুজে ভরে যাবে। দেড় হাজার বৎসর পরে

উমার (রা) বলেন, তাবূকের যুদ্ধে যাত্রার সময়ে পথিমধ্যে তাঁরা পানিসঙ্কটে নিপতিত হন। দীর্ঘ কয়েকদিন যাবৎ তাঁরা পানির কোনো সন্ধান না পাওয়াতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, কেউ কেউ তার নিজের উট জবাই করে তার পেটের নাড়ি ও গোবর চিপে তা পান করছিলেন। এই কঠিন বিপদের কথা জানিয়ে আবূ বাক্র (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুরোধ করেন প্রার্থনা করার জন্য। তখন তিনি তাঁর দুহাত তুলে প্রার্থনা করেন। তাঁর হস্তদ্বয় নামানোর পূর্বেই আকাশ মেঘে ভরে গেল। এরপর বৃষ্টি হলো এবং মানুষেরা নিজেদের পাত্রগুলিতে পানি ভরে নিল। এই বৃষ্টি মুসলিম সৈন্যদের শিবির অতিক্রম করে নি।

ইমরান ইবনু হুসাইয়িন (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন। তাঁর সঙ্গীগণ পানি সঙ্কটে নিপতিত হন ও পিপাসায় কষ্ট পেতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুজন সাহাবীকে বলেন, তোমরা অমুক স্থানে গমন কর। সেখানে দেখবে যে, একজন মহিলার সাথে একটি

বর্তমানে তার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে সংকলিত অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের আগে আরবদের দেশ ফল-ফসল ও নদী-ঝর্ণায় ভরে যাবে। বর্তমানে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। ক্রমান্বয়ে আরবদেশে কৃষিক্ষেত ও ফল-ফসলের বাগানে ভরে যাচ্ছে।

উট আছে এবং তার উপর দুটি পানির মশক (চামড়ার পাত্র) রয়েছে। তোমরা তাকে অনুরোধ করে এখানে নিয়ে আসবে। তাঁরা দুজন তথায় গমন করে বর্ণনানুসারে মহিলাকে দেখতে পান। তাঁরা তাকে অনেক অনুরোধ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিয়ে আসেন। তিনি তার মশকদ্বয় থেকে কিছু পানি একটি পাত্রে ঢালেন। এরপর আল্লাহর ইচ্ছানুসারে সেই পানিতে কিছু দু'আ পাঠ করেন। এরপর পানিটুকু পুনরায় মশকে ঢেলে দেন। এরপর মশক থেকে পানি ঢালার মুখ খুলে মানুষদেরকে নির্দেশ দেন যে, যার কাছে যত মশক বা পাত্র আছে সবাই যেন তা ভরে নেয়। মানুষেরা উক্ত মশকদ্বয় থেকে পানি নিয়ে তাদের সকলের মশক ও পাত্র ভরে নিলেন। এমনকি একটি পাত্রও খালি থাকল না। ইমরান ইবনু হুসাইন (রা) বলেন, মানুষেরা যখন তাদের মশক ও পাত্রগুলি উক্ত মশকদ্বয় থেকে পানি নিয়ে ভরছিল, তখন আমার মনে হচ্ছিল যে, উক্ত মশকদ্বয় যেন ক্রমেই পানিতে ভরে উঠছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে উক্ত মহিলার জন্য উপহার হিসেবে খাদ্য সংগ্রহ করা হলো। এমনকি সংগৃহীত খাদ্যে তার কাপড় ভরে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি এখন যেতে পার। আমরা তোমার মশকদ্বয় থেকে এক ফোঁটা পানিও গ্রহণ করি নি, কিন্তু আল্লাহই আমাদেরকে পানি দান করেছেন।”

(৪) অলৌকিকভাবে খাদ্য বৃদ্ধি করা

অলৌকিকভাবে খাদ্যবৃদ্ধির ঘটনাও তাঁর জীবনে অনেকবার ঘটেছে। কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি। জাবির (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করে খাদ্য প্রার্থনা করে। তিনি তাকে প্রায় অর্ধ ওয়াসাক (প্রায় দেড় মণ) যব প্রদান করেন। লোকটি যব নিয়ে বাড়িতে রাখে এবং নিজের পরিবার ও আত্মীয়-মেহমান-সহ তা ভক্ষণ করতে থাকে। অনেক দিন যাবৎ এভাবে চলার পরে লোকটি হঠাৎ একদিন অবশিষ্ট যব ওজন করে। সে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সংবাদ দেয় (যে, এতদিন খাওয়ার পরেও তার যব আগের মতই রয়েছে।) তিনি তখন বলেন, তুমি যদি তা ওজন না করতে তবে আজীবনই তা থেকে তোমরা আহার করতে পারতে এবং তোমাদের মৃত্যুর পরেও তা থেকে যেত।

অন্য হাদীসে জাবির (রা) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় একটি ছাগল ছানা এবং এক সা (প্রায় আড়াই কেজি) যব দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১,০০০ মানুষকে খাওয়ান। জাবির বলেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, তারা সকলেই পরিতৃপ্তির সাথে খেয়ে তা রেখে চলে গেলেন, অথচ আমাদের হাঁড়ি চুলার উপরেই ছিল এবং রুটি বানানোর জন্য মাখানো আটা তখনো শেষ হয়নি, বরং রুটি বানানোর কাজ চলছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আটা এবং হাঁড়িতে থুতু দিয়েছিলেন এবং বরকতের জন্য দু'আ করেছিলেন।

অন্য হাদীসে জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, তাঁর পিতা মৃত্যুর সময় অনেক ঋণ রেখে যান। তাঁদের যে পরিমাণ ফল ও ফসল উৎপন্ন হয় কয়েক বছর ধরে তা প্রদান করলেও তাতে তাদের ঋণ শোধ হয় না। তিনি মূল সম্পতিই পাওনাদারদের দিতে চান, কিন্তু পাওনাদারগণ তাতে রজি হন না। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অবগত করালে তিনি তাকে খেজুর বাগানে খেজুর কর্তনের নির্দেশ দেন। এরপর কয়েকটি খেজুরগাছের নিচে সেগুলি জমা করেন। তিনি তথায় গমন করেন এবং দু'আ করেন। তখন জাবির সেই খেজুর দিয়ে পাওনাদারদের সকল পাওনা পরিশোধ করার পরেও প্রতি বৎসর তারা যে পরিমাণ খেজুর কর্তন করতেন সেই পরিমাণ খেজুরই অবশিষ্ট থাকে।

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ক্ষুধার্ত দেখে তিনি তার বাড়ি থেকে কয়েকটি যবের রুটি তার বগলের মধ্যে করে এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খাওয়ার জন্য প্রদান করেন। তিনি সে রুটিগুলি দিয়ে উপস্থিত ৮০ জন সাহাবীকে পরিতৃপ্তির সাথে আহার করান।

অন্য হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, যাইনাব বিনতু জাহশ (রা)-এর সাথে বিবাহের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম অনেক মানুষের নাম বলে তাঁদেরকে দাওয়াত করতে তাঁকে নির্দেশ দেন। এত মানুষকে তিনি দাওয়াত দেন যে, নিমন্ত্রিত অতিথিগণ আগমন করলে তার বাড়ি ও বিশ্রামস্থল ভরে যায়। তখন তিনি তাদের সামনে একটি মগ এগিয়ে দেন, যে মগের মধ্যে পনির মিশ্রিত এক মুদ্দ (প্রায় অর্ধ কেজি) পরিমাণ খেজুরের ছাতু ছিল। তিনি মগটি অভ্যাগতদের সামনে রেখে তার মধ্যে নিজের তিনটি আঙুল ডুবিয়ে দেন। এরপর নিমন্ত্রিত অতিথিগণ সেই ছাতু ভক্ষণ করে প্রস্থান করেন। সকলের খাওয়ার পরেও মগের মধ্যে প্রায় আগের মতই ছাতু অবশিষ্ট থাকে।

আবূ আইউব আনসারী (রা) বলেন, (হিজরত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বাকরের মদীনায় আগমনের পরে) তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বাকর (রা)-কে দাওয়াত দেন এবং তাঁদের দুজনের পরিমাণ খাদ্য প্রস্তুত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন, আপনি আনসারদের নেতৃস্থানীয় (অধ্যক্ষগণ) ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ৩০ জনকে ডেকে আনুন। তিনি নির্দেশ মত ত্রিশজন আনসার নেতাকে ডেকে আনেন। তারা তৃপ্তির সাথে খাদ্য গ্রহণ করে অবশিষ্ট খাদ্য রেখে চলে যান। অতঃপর তিনি বলেন, এবার ৬০ জনকে ডাকুন। তিনি এবার ৬০ জনকে ডেকে অনেন এবং তারাও অনুরূপভাবে খাদ্য গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বলেন, এবার ৭০

জনকে ডাকুন। তারাও এভাবে খাদ্য গ্রহণ করেন এবং বাকি খাবার রেখে চলে যান। যারা সেই খাদ্য ভক্ষণ করে চলে যান তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে বেরিয়ে যান। আবূ আইউব আনসারী বলেন, এভাবে আমার সেই খাদ্য ১৮০ ব্যক্তি ভক্ষণ করেন।

সামুরা ইবনু জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক বাটি (bowl) মাংস আনয়ন করা হয়। সাহাবীগণ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দলে দলে তা থেকে ভক্ষণ করেন। এক দল উঠলে অন্য দল আহার করতে বসেন।

আব্দুর রাহমান ইবনু আবূ বাক্র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আমরা ১৩০ ব্যক্তি ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কারো কাছে কি কোনো খাবার আছে? তখন এক ব্যক্তি প্রায় এক সা' (প্রায় আড়াই কিলোগ্রাম) যবের আটা নিয়ে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মেশ ক্রয় করে তা রান্নার জন্য প্রস্তুত করেন। আটা দিয়ে রুটি বানানো হয় এবং মেষটিকে সেঁকা (রোস্ট করা) হয়। আল্লাহর কসম, একশত ত্রিশ জনের প্রত্যেককেই সেঁকা মাংস থেকে অংশ প্রদান করা হয়। এরপর অবশিষ্ট খাদ্য দুটি বড় খাঞ্চায় রাখা হয়। আমরা সকলেই সেই খাদ্য ভক্ষণ করি। এরপরও খাঞ্চা দুটিতে খাদ্য অবশিষ্ট থাকে। আমি তা উটের পিঠে করে নিয়ে যাই।

সালামা ইবনুল আকওয়া (রা), আবূ হুরাইরা (রা) এবং উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, এক যুদ্ধের সফরে তাঁরা খাদ্যের সঙ্কটে নিপতিত হন। সকলের খাদ্য নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন যার কাছে যা কিছু খাদ্য অবশিষ্ট আছে তা তার নিকট জমা করতে। তখন সবাই একমুষ্টি বা তার চেয়ে সামান্য বেশি খাবার এসে জমা করেন। কেউ কেউ এক সা' (প্রায় আড়াই কেজি) পরিমান খেজুর জমা দিলেন, যা ছিলো সর্বোচ্চ পরিমাণ। তখন সকল খাদ্য একটি চামড়ার পাটির উপরে রাখা হলো। সালামা ইবনুল আকওয়া বলেন, আমি দেখলাম যে একটি ছাগী মাটিতে শয়ন করলে যে স্থান দখল করে জমাকৃত সকল খাদ্য আনুমানিক সেই পরিমান স্থান দখল করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে সেই খাদ্য থেকে নিজ নিজ পাত্র ভরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। পুরো শিবিরে একটি পাত্রও আর অপূর্ণ থাকল না। এরপরও সেখানে খাদ্য অবশিষ্ট রয়ে গেল।

(৫) বৃক্ষ ও পাথরের আনুগত্য, কথা বলা ও সাক্ষ্য দেওয়া

ইবনু উমার (রা) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। এক বেদুঈন চলার পথে আমাদের কাছে আসে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঈমানের দাওয়াত দেন। বেদুঈন বলে, তুমি যা বলছ তার পক্ষে কে সাক্ষ্য দিবে? তিনি বলেন, মরুভূমির ঐ সবুজ

গাছটি আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিবে। গাছটি ছিল নিম্নভূমির অপর প্রান্তে। তখন গাছটি মাটির মধ্য দিয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে বেদুঈন লোকটির সামনে এসে দাঁড়ায়। লোকটি তিনবার গাছটিকে প্রশ্ন করে এবং তিনবারই গাছটি সাক্ষ্য প্রদান করে। এরপর গাছটি তার পূর্বস্থানে ফিরে যায়।

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য বের হন। তিনি ময়দানে আড়াল করার মত কিছুই দেখতে পেলেন না। এমন সময় তিনি লক্ষ্য করলেন যে, নিম্নভূমির প্রান্তে দুটি গাছ রয়েছে। তিনি একটি গাছের নিকট যেয়ে গাছটির একটি ডাল ধরে টান দিয়ে বললেন, আল্লাহর অনুমতিতে আমার অনুগত হও। তখন গাছটি নাকে রশি পরানো উটের ন্যায় তাঁর পিছে পিছে চলে এল। তখন তিনি অন্য বৃক্ষটির কাছে যেয়ে তাকেও অনুরূপভাবে বললেন, আল্লাহর অনুমতিতে আমার অনুগত হও। অতঃপর তিনি বৃক্ষ দুটি কাছাকাছি হওয়ার পরে তাদেরকে বললেন, আল্লাহর অনুমতিতে তোমরা উভয়ে একত্রিত হয়ে আমাকে আড়াল কর। তখন গাছ দুটি একে অপরের সাথে একত্রিত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আড়ালে বসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রয়োজন মেটানোর পর গাছ দুটি বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ নিজ স্থানে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে যায়।

ইবনু আববাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন বেদুঈনকে বলেন, তুমি বলত, আমি যদি ঐ খেজুরগাছ থেকে তার কাঁদিটিকে ডেকে নিয়ে আসি, তাহলে কি তুমি বিশ্বাস করবে যে, আমি আল্লাহর রাসূল? লোকটি বলে, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের কাঁদিটিকে ডাক দিলেন। কাঁদিটি লাফাতে লাফাতে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। তিনি বললেন, ফিরে যাও। তখন কাঁদিটি আবার তার নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

বুরাইদা ইবনুল হুসাইব (রা) বলেন, একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাঁর নুবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ দাবি করেন। তিনি উক্ত বেদুঈনকে বলেন, ঐ গাছটিকে যেয়ে বল, আল্লাহর রাসূল তোমাকে ডাকছেন। লোকটি গাছটির কাছে যেয়ে এ কথা বলে। তখন গাছটি ডানে ও বামে ঝুকে তার শিকড়গুলি মাটি থেকে তুলে নেয়। এরপর মাটির উপর দিয়ে গুড়ি-শিকড় টেনে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে: আস-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বেদুঈনকে বলেন, একে বল স্বস্থানে ফিরে যেতে। তখন গাছটি স্বস্থানে ফিরে যায়। বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলেন, আমাকে অনুমতি দিন যে আমি আপনাকে সাজদা করব। তিনি বলেন, না, আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করা বৈধ নয়। তখন বেদুঈন

বলেন, আমাকে অনুমতি দিন আমি আপনার হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় চুম্বন করব। তখন তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করেন।

প্রায় ২০ জন সাহাবী থেকে পৃথক পৃথক সূত্রে বর্ণিত হাদীসে তাঁরা বলেন, খেজুর গাছের গুড়ি কেটে খুঁটি বানিয়ে তার উপর মসজিদে নববীর ছাউনি দেওয়া ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দিতেন তখন এরূপ একটি গুড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন। যখন তাঁর খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বার বানানো হলো এবং তিনি মিম্বারে উঠে খুতবা দিতে শুরু করলেন, তখন আমরা শুনলাম যে, নবজাতক বাচ্চা হারানো উটের মত গুড়িটি কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে গুড়িটি ফেটে যায়। তার ক্রন্দনের আওয়াজে মসজিদ কম্পিত হচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে সমবেত মানুষেরা কাঁদতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুড়িটির কাছে এসে তার উপরে নিজের হাত রাখেন। এতে গুড়িটি শান্ত হয়ে যায়। তিনি বলেন, এতে হেলান দিয়ে আল্লাহর যিকর করতাম, এ যিকর হারানোর কারণে গুড়িটি ক্রন্দন করে। আল্লাহর শপথ, যদি আমি তাকে স্পর্শ না করতাম তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত সে এভাবেই কাঁদতে থাকত। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে গুড়িটিকে মিম্বারের নিচে দাফন করা হয়।

খেজুরের গুড়ির ক্রন্দনের এই সংবাদ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সংবাদ। সাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগেই তা প্রসিদ্ধ ছিল। অর্থের দিক থেকে তা মুতাওয়াতির বা অতি প্রসিদ্ধ হাদীস।

ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আহার করতেন তখন তাঁর সাথে আহার্য্য খাদ্যের তাসবীহ পাঠ আমরা শুনতে পেতাম।

(৬) ইঙ্গিতে প্রতিমাসমূহের পতন

ইবনু আববাস (রা) বলেন, কাবা ঘরের চতুর্পার্শ্বে ৩৬০টি প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সকল পাথরের মুর্তির পাগুলি সীসা দিয়ে পাথুরে মেঝের সাথে আটকানো ছিল। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন। তিনি তার হাতের খেজুরের ডালটি দিয়ে এ সকল প্রতিমা স্পর্শ না করে, শুধু সেগুলির দিকে ইশারা করলেন এবং বললেন "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।"[235] তিনি যখনই কোনো প্রতিমার মুখের দিকে ইশারা করলেন তখনই প্রতিমাটি চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর যখনই তিনি কোনো প্রতিমার পিঠের দিকে ইশারা করলেন, তখনই প্রতিমাটি উপুড় হয়ে পড়ে গেল। এভাবে সকল প্রতিমা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

---

[235] সূরা বানী ইসরাঈল (ইসরা), ৮১ আয়াত।

(৭) তাঁর পবিত্র হস্ত, ফুঁক বা থুথুতে রোগমুক্তি ও সুস্থতা

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন, উহদের যুদ্ধের দিন কাতাদা ইবনু নু'মান (রা) নামক সাহাবীর চোখে আঘাত লেগে চোখটি বেরিয়ে তার কপোলের উপর এসে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখটিকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দেন। চোখটি তখনি সুস্থ হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে তার দু চোখের মধ্যে এটিই অধিক সুস্থ ও ভাল ছিল।

উসমান ইবনু হানীফ (রা) বলেন, এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন। তিনি তাকে একটি দুআ শিখিয়ে দেন। অন্ধ ব্যক্তি এভাবে দুআ করলে আল্লাহ তাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন এবং সে সুস্থ দৃষ্টিশক্তি নিয়ে ফিরে আসে।

মুলায়িবুল আসিন্নার পুত্র বলেন, তিনি জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু মাটি নিয়ে তাতে থুতু নিক্ষেপ করে তা উক্ত দূতকে প্রদান করেন। সে যখন মাটি নিয়ে মুলায়িবের নিকট পৌঁছায় তখন তিনি মৃত্যুপথযাত্রী। তাকে মাটিটুকু খাওয়ানো হলে আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দেন।

হাবীব ইবনু ফুদাইক বলেন, তার পিতার চক্ষু সাদা হয়ে যায় এবং তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চোখে ফুঁক দেন। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। আমি দেখেছি যে, ৮০ বৎসর বয়সেও তিনি সূচের মধ্যে সূতা ঢুকাতেন।

খাইবার যুদ্ধের সময় আলী (রা) চক্ষুপ্রদাহে আক্রান্ত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীর (রা) চোখে থুতু দেন। এতে আলী এমনভাবে আরোগ্য লাভ করেন যেন কখনোই তাঁর চোখে কোনো অসুখ হয় নি।

সালামা ইবনুল আকওয়া খাইবারের যুদ্ধে তার ঊরুতে আঘাত পান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত স্থানে থুতু দেন এবং সালামা তৎক্ষনাৎ সুস্থ হয়ে যান।

খাস'আম গোত্রের একজন মহিলার পুত্র নির্বোধ ও বাকশক্তিহীন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু পানি নিয়ে পানির মধ্যে কুলি করেন এবং নিজের হস্তদ্বয় ধৌত করেন। এরপর তিনি পানিটুকু উক্ত বালককে প্রদান করে তাকে তা পান করাতে এবং তা দিয়ে তার দেহ মুছে দিতে নির্দেশ দেন। এতে বালকটি সুস্থ হয়ে যায় এবং সাধারণ মানুষদের চেয়েও অধিক বুদ্ধির অধিকারী হয়।

ইবনু আববাস (রা) বলেন, এক মহিলা তার এক পাগল পুত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করেন। তিনি ছেলেটির বুকে হাত বুলিয়ে দেন। এতে ছেলেটি বমি করে এবং তার পেট থেকে কাল কুকুর ছানার মত কিছু বের হয়। এরপর ছেলেটি সুস্থ হয়ে যায়।

কিশোর মুহাম্মাদ ইবনু হাতিবের বাহুর উপর একটি গরম হাঁড়ি উল্টে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে হাত বুলিয়ে দেন এবং সেখানে থুতু দেন। এতে সে তৎক্ষণাৎ সুস্থ হয়ে যায়।

শুরাহবীল আল-জু'ফীর (রা) হাতের তালুতে একটি আব (tumour) ছিল, যে কারণে তিনি ঘোড়ার লাগাম, তরবারী ইত্যাদি ধরতে পারতেন না। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলে তার সহানুভুতি কামনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার টিউমারটি ডলতে থাকেন। এভাবে টিউমারটি মিলিয়ে যায় এবং তার কোনো চিহ্নই তার হাতে আর থাকে না।

(৮) তাঁর দুআর অলৌকিক ফল

আনাস ইবনু মালিক (রা) বলেন, আমার মা (উম্মু সুলাইম) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার খাদেম আনাসের জন্য প্রার্থনা করুন। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি তার সম্পদ ও সন্তান বেশি করে দাও

এবং তাকে যা কিছু প্রদান কর সব কিছুতে বরকত প্রদান কর।' আনাস বলেন, আল্লাহর শপথ, আমার সম্পদ অনেক। আর আমার নিজের সন্তান ও সন্তানদের সন্তানগণের সংখ্যা প্রায় এক শত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রতি আহবান জানিয়ে পারস্য-সম্রাট কেসরার (Khosrau) নিকট পত্র লিখেন। পারস্য সম্রাট অত্যন্ত অভদ্রতার সাথে পত্রটি ছিঁড়ে ফেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে যেমন আমার পত্র ছিঁড়ে ফেলেছে, আল্লাহ তার সাম্রাজ্য ছিঁড়ে বিনষ্ট করবেন। ফলে অচিরেই পারস্য সাম্রাজ্যের বিনাশ ঘটে। পৃথিবীর কোথাও পারস্য সাম্রাজ্যের বা পারসিক আধিপত্যের কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

প্রসিদ্ধ আরবী কবি নাবিগা জা'দী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সামনে কিছু কবিতা পাঠ করেন। তখন তিনি বলেন: আল্লাহ তোমার মুখ বন্ধ না করেন। নাবিগা ১২০ বৎসর আয়ূ লাভ করেন, কিন্তু তাঁর একটি দাঁতও পড়েছিল না এবং অতিবৃদ্ধ বয়সেও তার মুখটি অত্যন্ত সুন্দর ছিল। কথিত আছে যে, বৃদ্ধকালে তার কোনো দাঁত পড়ে গেলে সেখানে নতুন দাঁত উঠত।

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনে মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন বেদুঈন মসজিদে প্রবেশ করে অনাবৃষ্টির জন্য কষ্ট প্রকাশ করে। তখন তিনি বৃষ্টির জন্য দুআ করেন। ফলে তখনই বৃষ্টিপাত

শুরু হয় এবং পরবর্তী শুক্রবার পর্যন্ত মদীনার মানুষের সুর্যের মুখ দেখতে পায় নি। পরের জুমুআয় উক্ত বেদুঈন অতিবৃষ্টির জন্য কষ্ট প্রকাশ করে। তখন তিনি আবার দুআ করেন, ফলে মেঘ কেটে যায়।

আবূ লাহাবের পুত্র উতবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গালিগালাজ করত এবং অত্যন্ত কষ্টপ্রদান করত। তিনি আল্লাহর কাছে বদ-দুআ করেন, যেন আল্লাহ তাঁর একটি কুকুরকে তার পিছনে লাগিয়ে দেন। উতবা বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। কাফিলা রাত্রিতে একস্থানে অবস্থান করে। উতবা বলে, মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বদ-দুআর কারণে আমার ভয় লাগছে। তখন কাফিলার সাথীরা তাদের মালপত্র উতবার চারিদিকে রেখে উৎবাকে ঘিরে পাহারা দিতে থাকে। এমতাবস্থায় একটি সিংহ এসে উতবাকে তার সাথীদের মধ্য থেকে তুলে নিয়ে যায়।

এরূপ আরেক অত্যাচারী অপরাধী মুহাল্লিম ইবনু জুসামাকে তিনি বদ-দুআ করেন। লোকটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার আত্মীয়রা তাকে কবরস্থ করে। কিন্তু লাশটি মাটি থেকে বেরিয়ে আসে। এভাবে যতবারই তারা তাকে কবর দেয় ততবারই লাশটি মাটি থেকে বেরিয়ে আসে। শেষে তারা লাশটি মাটির উপরে ফেলে রেখে চলে আসে।

একব্যক্তি বাম হাত ব্যবহার করে খাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডান হাত দিয়ে খেতে অনুরোধ করেন। লোকটি অহঙ্কার করে বলে, আমি ডান হাতে খেতে পারি না। তিনি বলেন, তুমি না পার! এরপর আর কখনো ঐ ব্যক্তি তার ডান হাত মুখে তুলতে পারত না।

এ বিষয়ক বর্ণনা এখানেই শেষ করছি। এরূপ আরো অগণিত ঘটনা সহীহ সনদে হাদীস গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়েছে। এ সকল মুজিযা বা অলৌকিক চিহ্ন প্রত্যেকটি পৃথকভাবে মুতাওয়াতির রূপে বর্ণিত হয়নি। তবে এ অর্থে শতশত সাহাবী থেকে শতশত পৃথক সনদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক হাদীস পৃথকভাবে মুতাওয়াতির না হলেও নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে তা মুতাওয়াতির। যেমন আলীর (রা) বীরত্ব বা হাতিম তাঈর দানশীলতা বিষয়ক বর্ণনাদি। আর সামগ্রিকভাবে মুতাওয়াতির অর্থই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নুবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।[236]

---

[236] মার্ক ও লূক তাদের সুসমাচারে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলির চেয়ে একক সূত্রে বর্ণিত সহীহ হাদীস অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। মার্ক ও লূক লোকমুখে শোনা কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাঁরা কার কাছ থেকে শুনেছিলেন, তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু, তাদের লেখা পুস্তক তাদের নিকট থেকে কেউ গ্রহণ, পাঠ বা শ্রবণ করেছেন কিনা, করলে কতটুকু করেছেন, নাকি অন্য কেউ তাদের নামে লিখে চালিয়েছেন ইত্যাদি কোনো তথ্যই সংরক্ষিত

৪. ১. ২. ব্যক্তিত্ব, বিধান ও মানবতার প্রয়োজন

৪. ১. ২. ১. তাঁর মহোত্তম চরিত্র ও আচরণ

দ্বিতীয় যে বিষয়টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রমাণ করে তা তাঁর মহান চরিত্র ও অতুলনীয় সদাচারণ। তাঁর মধ্যে সকল মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সর্বোত্তম মানবীয় গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল। জ্ঞান, কর্ম, বংশমর্যাদা, দেশের মর্যাদা, দৈহিক গুণাবলি ও মানসিক গুণাবলির চরম উৎকর্ষতা ও পূর্ণতা তিনি লাভ করেন। তাঁর গুণাবলি বিচার করলে যে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, সকল গুণের এরূপ সমন্বয় একজন নবী বা ভাববাদী ভিন্ন কারো মধ্যে হতে পারে না। কারণ, এ সকল গুণাবলির কোনো একটি দিক হয়ত অন্য মানুষদের মধ্যেও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সকল গুণের এরূপ সমন্বয় নবীগণ ছাড়া অন্যদের মধ্যে সম্ভব নয়। এজন্য এরূপ সকল পূর্ণতার গুণের সমন্বয় তার নবুয়তের অন্যতম প্রমাণ। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

নেই। মথি ও যোহনের লেখা সুসমাচার যদি সত্যিই শিষ্য মথি ও যোহনের লেখা হয় তাহলেও তার কোনো সূত্র নেই। তাদের লেখা বই কে তাদের থেকে শুনেছেন তারও প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে একক বর্ণনায় বর্ণিত হাদীসগুলির সনদ বা অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা সংরক্ষিত রয়েছে। চারটি সুসমাচারের লেখক সকলেই যে ঘটনাবলি লিখেছেন সেগুলিও একক সূত্রে বর্ণিত। এগুলির মূল্যও 'খাবারুল ওয়াহিদ' বা একক সূত্রে বর্ণিত হাদীসের চেয়ে বেশি কিছুই নয়।

ওয়াসাল্লাম-এর চরম বিরোধীরাও তাঁর মধ্যে এ সকল গুণের অধিকাংশই বিদ্যমান ছিল বলে স্বীকার করেছেন।

৪. ১. ২. ২. তাঁর ধর্মব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

তৃতীয় যে বিষয়টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রমান করে তা তাঁর ধর্মব্যবস্থা বা শরীয়তের বৈশিষ্ট্য। বিশ্বাস, ইবাদত-উপাসনা, জাগতিক ও সামাজিক দায়িত্ব ও কর্মকান্ড, রাষ্ট্র, বিচার ও প্রশাসন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক শিষ্টাচার, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ইত্যাদি সকল দিকে ইসলামের যে বৈশিষ্ট্য ও পূর্ণতা রয়েছে তা নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে যে, এগুলি অবশ্যই আল্লাহর প্রদত্ত ও ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং যিনি এগুলি নিয়ে আগমন করেছেন তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত নবী বা ভাববাদী। পঞ্চম অধ্যায়ে পাঠক জেনেছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীয়ত বা কুরআন ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে পাদরিগণের আপত্তি অত্যন্ত দুর্বল ও ভিত্তিহীন। একান্তই বিদ্বেষ, অযৌক্তিক পক্ষপাত এবং বিরোধিতার জন্য বিরোধিতার কারণেই তারা এ সকল কথা বলে।

৪. ১. ২. ৩. তাঁর আগমন ও বিজয়ের অবস্থা

চতুর্থ যে বিষয়টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রমাণ করে, তা তাঁর প্রকাশ ও বিজয়ের অবস্থা। তিনি এমন এক সমাজে নবুয়ত দাবি করেন, যে সমাজের মানুষদের কোনো

ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মীয় প্রজ্ঞা ছিল না। তাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে তিনি ঘোষণা দেন যে, আমি আল্লাহর নিকট থেকে আলোকময় গ্রন্থ ও মহান প্রজ্ঞা নিয়ে আগমন করেছি। আমি সমস্ত বিশ্বকে বিশ্বাস ও সততার আলোকে আলোকিত করব। তিনি ছিলেন সামাজিক শক্তিতে দুর্বল এবং তাঁর সাহায্যকারীগণ ও অনুসারীগণও ছিলেন নগণ্য ও দুর্বল। তা সত্ত্বেও তিনি জগতের সকল মানুষের বিরুদ্ধে সুদৃঢ়ভাবে দন্ডায়মান হন। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, শক্তিধর রাষ্ট্রপ্রধান, সমাজপতি সকলের বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান নেন। তাদের মতামত ভ্রান্ত, তাদের বুদ্ধি অপরিপক্ক ও তাদের ধর্ম বাতিল বলে তিনি ঘোষণা করেন। তিনি তাদের রাষ্ট্রগুলিকে পরাজিত করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তাঁর ধর্ম সকল ধর্মের উপর প্রকাশ ও বিজয় লাভ করে। সময়ের আবর্তনের সাথে সাথে সকল দেশে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

তাঁর শত্রুগণ ছিল সংখ্যায়, অস্ত্রে ও শক্তিতে অনেক বেশি। তাঁর ধর্ম ইসলামের আলো নিভিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তাঁর ধর্মের সকল চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য তাদের আগ্রহ, উদ্দীপনা, দৃঢ়তা, গোঁড়ামি, অন্ধ আবেগ ও উন্মাদনা ছিল সীমাহীন ও অপ্রতিরোধ্য। তা সত্ত্বেও তারা সফল হতে পারেন নি। আল্লাহর সাহায্য ও আসমানী সহযোগিতা ছাড়া কি তা সম্ভব ছিল?

ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য তাঁর নুবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে। গীতসংহিতা ১/৬ নিম্নরূপ: "কারণ সদাপ্রভু ধার্মিকগণের পথ জানেন, কিনতু দুষ্টের পথ বিনষ্ট হইবে (For the LORD knoweth the way of the righteous: but the way of the ungodly shall perish)।"

গীতসংহিতা ৫/৬: "তুমি মিথ্যাবাদীদিগকে বিনষ্ট করিবে, সদাপ্রভু রক্তপাতীকে ও ছলপ্রিয়কে ঘৃণা করেন (Thou shalt destroy them that speak leasing: the LORD will abhor the bloody and deceitful man)।"

গীতসংহিতা ৩৪/১৬: "সদাপ্রভুর মুখ দুরাচারদের প্রতিকূল; তিনি ভূতল হইতে তাহাদের স্মরণ উচ্ছেদ করিবেন।"

গীতসংহিতা ৩৭/১৭ ও ২০: "(১৭) কারণ দুষ্টদের বাহু ভগ্ন হইবে; কিনতু সদাপ্রভু ধার্মিকদিগকে (the righteous) ধরিয়া রাখেন।... (২০) কিনতু দুষ্টগণ বিনষ্ট হইবে, সদাপ্রভুর শত্রুগণ মাঠের তৃণশোভার সমান হইবে; তাহারা অনতর্হিত, ধূমের ন্যায় অনতর্হিত হইবে।"

প্রেরিত ৫/৩৫-৩৯ শ্লোকে ইয়াহূদীদের ব্যবস্থা-গুরু গমলীয়েলের (Gamaliel) নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে: "(৩৫) হে ইস্রায়েল-লোকেরা, সেই লোকদের বিষয়ে তোমরা কি করিতে উদ্যত হইয়াছ, তদ্বিষয়ে সাবধান হও। (৩৬) কেননা ইতিপূর্বে থুদা (Theudas) উঠিয়া আপনাকে মহাপুরুষ করিয়া

বলিয়াছিল, এবং কমবেশ চারি শত জন তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিল; সে হত হইল, এবং যত লোক তাহার অনুগত হইয়াছিল সকলে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল, কেহই রহিল না। (৩৭) সেই ব্যক্তির পরে নাম লিখিয়া দিবার সময়ে গালীলীয় যিহূদা (Judas of Galilee) উঠিয়া কতকগুলি লোককে আপনার পশ্চাৎ টানিয়া লইয়াছিল; সেও বিনষ্ট হইল, এবং যত লোক তাহার অনুগত হইয়াছিল, সকলে ছড়াইয়া পড়িল। (৩৮) এক্ষণে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা এই লোকদের হইতে ক্ষানত হও, তাহাদিগকে থাকিতে দেও; কেননা এই মন্ত্রণা কিমবা এই ব্যাপার যদি মনুষ্য হইতে হইয়া থাকে, তবে লোপ পাইবে; (৩৯) কিনতু যদি ঈশ্বর হইতে হইয়া থাকে, তবে তাহাদিগকে লোপ করা তোমাদের সাধ্য নয়, কি জানি, দেখা যাইবে যে, তোমরা ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিতেছ (if this counsel or this work be of men, it will come to nought: But if it be of God, ye cannot overthrow it; lest haply ye be found even to fight against God)।”

উপরের বক্তব্যগুলির আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ধার্মিক (righteous) না হতেন তবে সদাপ্রভু তার পথ বিনষ্ট করতেন, লাঞ্ছিত করতেন এবং ভূতল হইতে তাঁর স্মরণ উচ্ছেদ করতেন, বাহু ভগ্ন করতেন, ধূমের ন্যায় অন্তর্হিত করতেন, তাঁর অনুসারীরা ছড়িয়ে পড়ত, তার কথা ও কর্ম বিনষ্ট করতেন। কিন্তু তিনি সে সব কিছুই করেন নি। এতে প্রমাণিত

যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধার্মিক। এতে সন্দেহ নেই, যে সকল ইয়াহূদী-খৃস্টান মুহাম্মাদের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস করেছেন বাইবেলের উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের সাথেই যুদ্ধ করছেন। তবে সময় নিকটবর্তী এবং অচিরেই তারা জানতে পারবেন। মহান আল্লাহ বলেন: “অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়।”[237]

তারা কখনোই ইসলামকে মুছে ফেলতে পারবেন না। আল্লাহই তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: “তারা আল্লার আলো (Allah's Light) ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলো পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপসন্দ করে।”[238]

৪. ১. ২. ৪. মানবতার প্রয়োজনের সময়েই তাঁর আগমন

পঞ্চম যে দিকটি প্রমাণিত করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যিই আল্লাহর প্রেরিত নবী বা ভাববাদী ছিলেন তা তার আগমনের সময় ও মানবতার প্রয়োজন বিবেচনা করা। তিনি এমন এক সময়ে আবির্ভুত হলেন, যখন বিশ্বের মানব জাতির জন্য একজন পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন ছিল যিনি সঠিক পথের নির্দেশনা দিবেন এবং তাদেরকে সত্য ধর্মের দিকে আহবান করবেন।

---

[237] সূরা শু‘আরা, ২২৭ আয়াত।

[238] সূরা সাফফ, ৮ আয়াত।

আরবগণ ছিল পৌত্তলিকতা ও কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার মত ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত। পারস্যবাসীরা ছিল দুই ঈশ্বর-বাদ ও মাতা ও কন্যাকে বিবাহ করার মত ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত। তুর্কী-মঙ্গোল জাতি ছিল জনপদ ধ্বংস ও মানবসভ্যতার বিনাশে লিপ্ত। ভারতের মানুষ ছিল গরু, গাছপালা ও পাথর-মুর্তির পূজা-অর্চনায় লিপ্ত। ইয়াহূদী জাতি ছিল ধর্মের বিকৃতি, ঈশ্বরের প্রতি মানবীয় গুণারোপ, সত্যের অস্বীকার ও মিথ্যার প্রচারে লিপ্ত। খৃস্টান জাতি ছিল ত্রিত্ববাদ, ক্রুশ-পূজা এবং সাধু ও সাধ্বীদের মুর্তির উপাসনায় লিপ্ত। অনুরূপভাবে পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের অনুসারীগণ বিভ্রান্তি ও কুসংস্কারের চোরাবালিতে ডুবে ছিল। সত্যকে ভুলে তারা অসত্য ও অসম্ভবকে নিয়ে মেতে ছিল।

মহান মহিমান্বিত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ কি এমতাবস্থায় তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষকে পরিত্যাগ করবেন? বিশ্ববাসীর প্রতি করুণার প্রতীক কাউকে তিনি পাঠাবেন না? তা তো হতে পারে না!

আর মানবতার এই কঠিন সময়ে একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউই আবির্ভুত হন নি। তিনিই এই মহান ধর্ম ও ব্যবস্থা দিয়ে যান এবং এই সুমহান সৌধ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সকল বিভ্রান্ত আচার-রীতি এবং বাতিল ধর্মবিশ্বাস অপসারিত করেন। একত্ববাদের সূর্য উদিত হয় এবং আল্লাহর পবিত্রতার জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়। বহু-ঈশ্বরবাদিতা, দ্বিত্ববাদ,

ত্রিত্ববাদ, ঈশ্বরের প্রতি মানবীয় গুণাবলি আরোপ ইত্যাদি সকল বিভ্রান্তির অন্ধকার অপসারিত হয়। তাঁর উপর আল্লাহর অগণিত সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক এবং তিনি লাভ করুণ পরিপূর্ণ মর্যাদা।

এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন: "হে গ্রন্থানুগামি-ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ, রাসূল প্রেরণে বিরতির পর আমার রাসূল তোমাদের নিকট এসেছে, সে তোমাদের নিকট স্পষ্ট ব্যাখ্যা করছে, যাতে তোমরা বলতে না পার, 'কোনো সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী আমাদের নিকট আসে নি'; এখন তো তোমাদের নিকট একজন সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী এসেছে। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[239]

---

[239] সূরা মায়িদা, ১৯ আয়াত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:
পূর্ববর্তী নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী
৪. ২. ১. বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃতি

ষষ্ঠ যে বিষয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে তা তাঁর আগমনের বিষয়ে পূর্ববর্তী নবীগণ বা ভাববাদীগণের ভবিষ্যদ্বাণী, যা পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থগুলিতে বিদ্যমান। এ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পর্যালোচনার পূর্বে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য:

৪. ২. ১. ১. ভবিষ্যদ্বাণীর বিদ্যমানতা

বাইবেলীয় বা ইস্রায়েলীয় নবী বা ভাববাদিগণ আগামী দিনের অনেক বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁরা নবূখদ্নিৎসর (নেবুকাদনেজার, Nebuchadnezzar), কোরস (সাইরাস: Cyrus), আলেকজান্ডার এবং তার উত্তরাধিকারীগণ, ইদোম, মিসর, নীনবী, বাবিল প্রভৃতি দেশ ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। কাজেই তাঁরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করবেন না এরূপ চিন্তা করা অবাস্তব ও অযৌক্তিক।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তাঁর প্রকাশের সময়ে 'একটি সরিষা-দানার তুল্য', 'অতি ক্ষুদ্র বীজ', কিন্তু পরে তিনি এমন বৃক্ষ হয়ে উঠলেন যে, 'আকাশের পক্ষিগণ আসিয়া তাহার

শাখায় বাস করল'।[240] তিনি প্রতাপশালী পরাক্রান্ত ক্ষমতাধর অধিপতি ও সম্রাটদের ক্ষমতা চূর্ণ করেছেন। পূর্ববর্তী ভাববাদীগণের মূল আবাসস্থল সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও যিরূশালেমে তার ধর্ম পরিপূর্ণরূপে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তা প্রসারিত ও প্রচারিত হয়েছে। সকল ধর্মের উপরে তা প্রাধান্য লাভ করেছে। যুগের পর যুগ তা প্রতিষ্ঠিত থাকল। এ পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে তার আলো প্রসারিত হচ্ছে। এ সকল ঘটনা অন্যান্য ঘটনার চেয়ে অনেক বড় ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ইদোম, নীনবী ও অন্যান্য দেশের ঘটনার চেয়ে পরিমাণে ও গুরুত্বে এগুলি কোনো অংশেই কম নয়। এজন্য সুস্থ জ্ঞান একথা স্বীকার করতে পারে না যে, এ সকল ভাববাদী ক্ষুদ্র ও কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবেন, অথচ সেগুলির চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এত বড় বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলবেন না।

৪. ২. ১. ২. ভবিষ্যদ্বাণীর অস্পষ্টতা

ভবিষ্যদ্বাণী সাধারণত ইঙ্গিতময় হয়, পূর্ণ ব্যাখ্যাত হয় না। পূর্ববর্তী ভাববাদী পরবর্তী ভাববাদী সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, সাধারণত সেই ভবিষ্যদ্বাণী তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন না। সাধারণত ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয় না যে, অমুক সালে, অমুক দেশে,

---

[240] মথি ১৩/৩১-৩২ শ্লোকে যীশুর বাক্য থেকে গৃহীত।

অমুক গোত্রে, অমুক আকৃতি ও প্রকৃতির অধিকারী অমুক নামে একজন ভাববাদী আগমন করবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য থাকে। তবে বিশেষভাবে জ্ঞানী ও ধর্মপুস্তক সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞ মানুষেরা পারিপার্শ্বিক ইঙ্গিত ও সূত্রাদির মাধ্যমে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন। অনেক সময় ভবিষ্যদ্বাণী এত অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয় যে, সর্বোচ্চ জ্ঞানী ও ধর্মজ্ঞ মানুষেরাও তা বুঝতে পারেন না। পরবর্তী ভাববাদী আবির্ভুত হয়ে, নিজে যখন দাবি করেন যে, আমিই সেই ভাববাদী যার বিষয়ে পূর্ববর্তী ভাববাদী অমুক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং তার এই দাবি বিভিন্ন অলৌকিক চিহ্নের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তখনই কেবল তারা বুঝতে পারেন যে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে একেই বুঝানো হয়েছিল। এরূপ ভাববাদীর আবির্ভাব, দাবি পেশ ও দাবি প্রমাণের আগে তারা কিছুই বুঝতে পারেন না। এজন্য এ সকল ধর্মজ্ঞ ও অভিজ্ঞ মানুষদেরকে তিরস্কারও করা হয়।

এ কারণেই যীশু ইয়াহূদী পণ্ডিত ও ধর্মগুরুদেরকে তিরস্কার করেছেন। তিনি তাদেরকে তিরস্কার করে বলেন, "হা ব্যবস্থাবেত্তারা, ধিক্ তোমাদিগকে, কেননা তোমরা জ্ঞানের চাবি হরণ করিয়া লইয়াছ; আপনারা প্রবেশ করিলে না, এবং যাহারা প্রবেশ করিতেছিল, তাহাদিগকেও বাধা দিলে।" লূকের সুসমাচারের ১১/৫২ শ্লোকে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসলিম আলিমগণ বলেছেন, সকল আসমানী কিতাবেই কোনো না কোনোভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত সংবাদ, পূর্বাভাস বা ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। কিন্তু এগুলি ইঙ্গিতময়। যদি এগুলি সাধারণদের কাছে সুস্পষ্ট হতো তবে তাদের আলিম-পণ্ডিতগণ এগুলি গোপন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হতেন না। এরপর ভাষান্তরের ফলে অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা বৃদ্ধি পায়। হিব্রু থেকে সিরীয় ভাষায়, সিরীয় থেকে আরবী ভাষায়, এভাবে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদের সাথে সাথে এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী আরো বেশি দুর্বোধ্য হয়ে যায়।

৪. ২. ১. ৩. ভাববাদীর অপেক্ষায় ইস্রায়েলীয় জাতি

বাইবেলই প্রমাণ করে যে, ইস্রায়েলীয় জাতি খৃস্ট ও এলিয় ছাড়াও অন্য একজন ভাববাদীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। যোহনের সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ে রয়েছে: "১৯ আর যোহনের সাক্ষ্য এই, যখন যিহূদিগণ কয়েক জন যাজক ও লেবীয়কে দিয়া যিরূশালেম হইতে তাঁহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, আপনি কে? ২০ তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না; তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খ্রীষ্ট (the Christ/the Messiah/the annointed) নই। ২১ তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি? আপনি কি এলিয় (Elias)? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী (that prophet)? তিনি উত্তর

করিলেন, না। ... ২৫ আর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খ্রীষ্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন, তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন?”

এখানে “সেই ভাববাদী” বলতে সেই প্রতিশ্রুত ও আকাঙ্খিত ভাববাদীকে বুঝানো হয়েছে, যাব বিষয়ে দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ে মোশি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন[241]।

এভাবে আমরা দেখছি যে, ইস্রায়েলীয়গণ মাসীহ বা খৃস্ট ছাড়াও অন্য আরেকজন প্রতিশ্রুত নবীর জন্য অপেক্ষা করছিল। তাঁর বিষয়টি তাদের মধ্যে এত প্রসিদ্ধ ও সুপরিজ্ঞাত ছিল যে, তাঁর কোনো নাম-পরিচয় বলার প্রয়োজন হতো না, শুধু ‘সেই ভাববাদী’ বললেই সকলেই বুঝতে পারতেন।

যোহন ৭/৪০-৪১ নিম্নরূপ: “(৪০) সেই সকল কথা শুনিয়া লোকসমূহের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, ইনি সত্যই সেই ভাববাদী। (৪১) আর কেহ কেহ বলিল, ইনি সেই খ্রীষ্ট।”

এ কথা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, খৃস্ট এবং সে ভাববাদী দুজন দু ব্যক্তি হবেন। এজন্যই তারা একজনের বিপরীতে অন্যের কথা বলেছেন। আর এ সকল বক্তব্য থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে উক্ত প্রতিশ্রুত ভাববাদী

---

[241] দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/১৫-২২।

যীশুখৃস্টের আগে আগমন করেন নি। তাহলে নিশ্চিতভাবেই জানা যাচ্ছে যে, তিনি তাঁর পরে আগমন করবেন। আর আমরা জানি যে, যীশুর পরে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া আর কোনো মহান ভাববাদী আসেন নি। কাজেই আমরা বুঝতে পারি যে, ইস্রায়েলীয়গণ যে প্রতিশ্রুত ভাববাদীর অপেক্ষা করত তিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

যীশু বিভিন্ন সময়ে ভন্ড ভাববাদীগণ থেকে সতর্ক করেছেন। যেমন মথি ৭/১৫ শ্লোকে যীশুর নিম্নোক্ত বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে: "ভাক্ত ভাববাদিগণ (false prophets) হইতে সাবধান; তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে, কিনতু অনতরে গ্রাসকারী কেন্দুয়া (ravening wolves)।" এরূপ বক্তব্যকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের সত্যতার বিরুদ্ধে ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। কারণ যীশু এখানে ভাক্ত ভাববাদী বা ভন্ড নবী থেকে সাবধান করেছেন, সত্য ভাববাদী থেকে নয়।[242] এজন্য তিনি 'ভাক্ত' কথাটি উল্লেখ করেছেন। হ্যাঁ, যদি তিনি বলতেন, 'আমার পরে যত ভাববাদী আগমন করবে সকলের থেকে সাবধান থাকবে'

---

[242] বরং উপর্যুক্ত আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলিতে যীশু স্পষ্টতই বলেছেন যে, তার পরে অনেক ভাববাদী আগমন করবেন, কেউ ভাক্ত এবং কেউ সঠিক যারা স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করবে এবং কেউ ভাক্ত। ফলের মাধ্যমেই সত্য ভাববাদী থেকে ভন্ডকে পৃথক করা যাবে।

তবে সে কথা বাহ্যত তাদের দাবির পক্ষে প্রমাণ হতে পারত। কিন্তু যীশু এরূপ কোনো কথা বললেও, পাদরিগণ সে কথা ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হতেন; কারণ যীশুর পরে অনেক ভাববাদীর ভাববাদিত্ব তারা বিশ্বাস করেন বলে নতুন নিয়মের পুস্তকাদি থেকে প্রমাণিত।[243]

যীশুখৃস্টের ঊর্ধ্বারোহণের পরে প্রথম শতাব্দীতে অনেক ভাক্ত ভাববাদীর আবির্ভাব হয় বলে আমরা নতুন নিয়ম থেকে জানতে পারি।[244] যীশু মূলত এ সকল ভাক্ত ভাববাদী ও ভাক্ত খৃস্ট থেকে সাবধান করেছেন। তিনি সত্য ভাববাদী থেকে সতর্ক করেন নি। আর এজন্যই তিনি উপর্যুক্ত বক্তব্যে ভাক্ত ভাববাদীগণ থেকে সাবধান করার পরে মথি ৭/১৬, ১৭ ও ২০ শ্লোকে তিনি বলেছেন: "(১৬) তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে (Ye shall know them by their fruits)। লোকে কি কাঁটা গাছ হইতে দ্রাক্ষাফল, কিমবা শিয়ালকাঁটা হইতে ডুমুর ফল সংগ্রহ করে? (১৭) সেই প্রকারে প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফল ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে।... (২০) অতএব তোমরা উহাদের ফল দ্বারাই উহাদিগকে চিনিতে পারিবে।"

---

[243] বাইবেলের নতুন নিয়মে বারংবার স্বীকার করা হয়েছে যে, যীশুখৃস্টের পরেও অনেক ভাববাদী এসেছেন। প্রেরিত ১১/২৭-২৮; ২১/১০-১১।

[244] ২ করিন্থীয় ১১/১২-১৩; ১ যোহন ৪/১; প্রেরিত ৮/৯-১০; ১৩/৬।

নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সত্য ভাববাদী। তাঁর ফলই তা প্রমাণ করে। বিরোধিগণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিষয়ে যে সকল অপবাদ ও বিভ্রান্তি প্রচার করেন, সেগুলি ভিত্তিহীন ও মূল্যহীন। এছাড়া বিরোধীদের অপবাদ নেই কার বিরুদ্ধে? সকলেই জানেন যে, ইয়াহূদীগণ মরিয়মের পুত্র যীশুকে অবিশ্বাস করেন এবং তাকে মিথ্যাবাদী ও ভন্ড বলে বিশ্বাস করেন। তাদের বিশ্বাস অনুসারে বিশ্বের শুরু থেকে তাঁর আবির্ভাব পর্যন্ত তাঁর চেয়ে খারাপ আর কোনো মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নেয় নি। অনুরূপভাবে পাদরিগণের স্বদেশীয় ইউপোরীয় হাজার হাজার পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক ও গবেষক যীশুর নিন্দা করেন। তারা প্রথমে খৃস্টান ছিলেন। পরে তারা খৃস্টধর্মকে ঘৃণা করে তা পরিত্যাগ করেন। তারা তাঁকে অবিশ্বাস করেন এবং তাঁকে ও তাঁর ধর্মকে নিয়ে উপহাস করেন। তাদের মতামতের পক্ষে তারা অনেক বইপুস্তক রচনা করেছেন। এ সকল বইপুস্তক বিশ্বের সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইউরোপে প্রতিদিন এদের সংখ্যা বাড়ছে। যীশুর বিরুদ্ধে ইয়াহূদীদের নিন্দা এবং ইউরোপীয় নাস্তিক পণ্ডিতদের নিন্দা যেমন খৃস্টান পাদরিগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরুদ্ধে ত্রিত্ববাদী খৃস্টান পাদরি ও পণ্ডিতগণের অপবাদ আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. ২. ১. ৪. বাইবেলীয় নামসূহের অনুবাদ, সংযোজন ও পরিবর্তন

অতীতে ও বর্তমানে সকল যুগে ইয়াহূদী-খৃস্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণের অতি পরিচিত একটি অভ্যাস যে, তাঁরা ধর্মগ্রন্থের অনুবাদে অধিকাংশ সময়ে নামগুলির অনুবাদ করেন এবং নামের পরিবর্তে নামের অর্থ উল্লেখ করেন। এ বিষয়টি অত্যন্ত বড় অন্যায় ও বিভ্রান্তিকর। এছাড়া এ সকল পুস্তকের যে বাণীকে তারা ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করেন সেগুলির সাথে কখনো কখনো নিজেদের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা সংযোগ করেন, অথচ মূল ঐশ্বরিক বাক্য ও ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন না। এ দুটি বিষয় তাদের কাছে অত্যন্ত সহজ ও অতি পরিচিত অভ্যস্ত কর্ম।

যদি কেউ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ পাঠ ও তুলনা করেন তবে এ জাতীয় অনেক উদাহরণ দেখতে পারবেন। বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান নামসমূহের অনুবাদ করা, নামের পরিবর্তে অর্থের ভিত্তিতে অন্য শব্দ ব্যবহার করা এবং তাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা সংযোজন করা অতীত-বর্তমান সকল যুগে বাইবেল লেখক ও অনুবাদকগনের চিরচারিত স্বভাবজাত রীতি। কাজেই তাঁদের পক্ষে মোটেও অস্বাভাবিক নয় যে, তাঁরা বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলির মধ্যে তাঁর কোনো নাম অনুবাদ করে নামের

পরিবর্তে অর্থ লিখবেন, বা এক শব্দের পরিবর্তে অন্য শব্দ লিখবেন, বা ব্যাখ্যা হিসেবে বা ব্যাখ্যা ছাড়াই কোনো কথা সংযোগ করবেন। আর এরূপ পরিবর্তনের ফলে এসকল ভবিষ্যদ্বাণী অর্থ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এবং বাহ্যত এগুলির সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্পৃক্ততা অনুধাবন করা অসুবিধাজনক হয়ে গিয়েছে।

এছাড়া পাঠক ইতোপূর্বে দেখেছেন যে, তাঁদের অভ্যন্তরীণ দল-উপদলের পক্ষের প্রমাণ বিকৃত বা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে বাইবেলে বিকৃতি করার ক্ষেত্রে তাঁরা কখনোই কোনো দুর্বলতা বা অবসাদ প্রদর্শন করেন নি। নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ে প্রযোজ্য হতে পারে এমন সকল ভবিষ্যদ্বাণীকে এভাবে পরিবর্তন করার বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ ছিল খুবই বেশি। তাঁদের অভ্যন্তরীণ দল উপদলের মতামতের পক্ষের প্রমাণ বিকৃত করার যে আগ্রহ তাঁদের ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহ ছিল মুসলিমদের পক্ষের প্রমাণ বিকৃত করার। কাজেই তারা যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলিতে অনুবাদ, ব্যাখ্যা, সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে বিকৃতি সাধন করে থাকেন বা তা অস্পষ্ট ও অবোধগম্য করে থাকেন তবে তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

একারণেই আমরা দেখি যে, মুসলিম উম্মাহর পূর্ববর্তী লেখকগণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বাইবেল থেকে যে সকল উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, সেগুলির সাথে বর্তমান যুগে প্রচলিত অনুবাদগুলির অনেক স্থানে মিল পাওয়া যায় না। বাহ্যত এর কারণ এরূপ পরিবর্তন ও বিকৃতি। এ সকল মুসলিম আলিম তাঁদের যুগে প্রচলিত আরবী অনুবাদ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। পরবর্তী যুগে অনুবাদের মধ্যে পরিবর্তন ও সংশোধনের ধারা অব্যাহত থেকেছে। অনুবাদের পার্থক্যের কারণেও এরূপ হতে পারে। তবে পরিবর্তনের বিষয়টিই অন্যতম কারণ; কারণ আমরা দেখছি যে, খৃস্টান ধর্মগুরুগণের লেখনি ও অনুবাদের মধ্যে পরিবর্তন, সংযোজন ও সংশোধনের এই অভ্যাস এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

উপরের বিষয়গুলি অনুধাবন করার পরে আমরা বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ক সুসমাচার ও ভবিষ্যদ্বাণীগুলির মধ্য থেকে সামান্য কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী আলোচনা করব। বাইবেলের পুস্তকগুলিতে বহুবিধ বিকৃতি সাধিত হওয়ার পরেও বাইবেলের পুস্তকসমূহের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ক অনেক সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে।[245]

৪. ২. ২. বাইবেলের চারটি ভবিষ্যদ্বাণী

আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী মূল গ্রন্থে বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষয়ক ১৮টি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী আলোচনা করেছেন। এখানে মাত্র ৪টি ভবিষ্যদ্বাণী আলোচনা করা হলো:

৪. ২. ২. ১. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ক প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী

দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/১৭-২২: "(১৭) তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, উহারা ভালই বলিয়াছে। (১৮) আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী (a Prophet from among their brethren, like unto thee) উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার

---

[245] ভবিষ্যদ্বাণীগুলি স্বভাবতই অস্পষ্ট হয়। এছাড়া বিকৃতি ও অনুবাদের কারণে আরো অস্পষ্ট হয়েছে। সুসমাচার লেখকগণ পুরাতন নিয়মের অনেক বক্তব্য উদ্ধৃত করে দাবি করেছেন যে, এগুলি যীশুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী, অথচ যীশুর ক্ষেত্রে সেগুলির প্রয়োগযোগ্যতা বা যীশুর সাথে সেগুলির সংশ্লিষ্টতা খুবই অস্পষ্ট ও দুর্বল। এ দিক থেকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পর্যালোচনা করলে পাঠক নিশ্চিত হবেন যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো।

মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। (১৯) আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব। (২০) কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলে, কিমবা অন্য দেবতাদের নামে যে কেহ কথা বলে, সেই ভাববাদীকে নিহত হইতে হইবে।[246] (২১) আর তুমি যদি মনে মনে বল, সদাপ্রভু যে বাক্য বলেন নাই, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? ২২ [তবে শুন,] কোন ভাববাদী সদাপ্রভুর নামে কথা কহিলে যদি সেই বাক্য পরে সিদ্ধ না হয়, ও তাহার ফল উপস্থিত না হয়, তবে সেই বাক্য সদাপ্রভু বলেন নাই; ঐ ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলিয়াছে, তুমি তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইও না।"

ইয়াহূদীগণ দাবি করেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদটি যিহোশূয়ের বিষয়ে বলা হয়েছে। আর খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, কথাটি যীশুর[247] বিষয়ে বলা হয়েছে। উভয় দাবিই ভিত্তিহীন। নিঃসন্দেহে এ কথাগুলি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

[246] গ্রন্থকারের প্রদত্ত আরবী পাঠ অনুসারে এ অনুবাদ। বাংলা বাইবেলে "মরিতে হইবে"।

[247] একই ব্যক্তি স্বয়ং ঈশ্বর এবং তিনিই আবার ঈশ্বরের ভাববাদী!

আগমন বিষয়ক সুসংবাদ ছাড়া কিছুই নয়। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি তা প্রমাণ করে:

(১) বাইবেলের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে নিশ্চিত জানা যায় যে, যীশুর সমসাময়িক ইয়াহূদীগণ এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিশ্রুত একজন ভাববাদীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন এবং তারা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিশ্রুত এই ভাববাদী মসীহ বা খৃস্ট নন, বরং অন্য একজন হবেন। কাজেই এখানে যে ভাববাদীর আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে তিনি কখনোই যিহোশূয় হতে পারেন না বা যীশুও হতে পারেন না।[248]

(২) এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে "তোমার সদৃশ (like unto thee)"। যিহোশূয় ও যীশু কেউই মোশির সদৃশ বা মোশির তুল্য হতে পারেন না।

কারণ যিহোশূয় ও যীশু উভয়েই ইস্রায়েল সন্তানগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর ইস্রায়েল সন্তানগণের মধ্যে কেউ মোশির তুল্য বা সদৃশ হতে পারেন না। দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪/১০-এ বলা হয়েছে: "মোশির

---

[248] যীশুকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিশ্রুত ভাববাদী বলে দাবি করলে খৃস্টানদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, তিনি 'খৃস্ট' ছিলেন না; কারণ প্রতিশ্রুত মসীহ (খৃস্ট) ও প্রতিশ্রুত ভাববাদী দুই ব্যক্তি হবেন, এক ব্যক্তি নন। আর এখানে যিহোশূয়কে বুঝানো হলে তো আর ইহূদীগণ হাজার হাজার বছর ধরে 'সেই ভাববাদী'-র আগমনের অপেক্ষায় থাকতেন না।

তুল্য কোন ভাববাদী ইস্রায়েলের মধ্যে আর উৎপন্ন হয় নাই (there arose not a prophet since in Israel like unto Moses)।”

এছাড়া মোশির সাথে যিহোশূয় ও যীশুর কোনো সাদৃশ্য নেই। কারণ মোশি ছিলেন ঐশ্বরিক গ্রন্থ ও বিধিনিষেধময় নতুন ব্যবস্থা প্রাপ্ত একজন ভাববাদী। পক্ষান্তরে যিহোশূয় ও যীশু এরূপ কিছুই লাভ করেন নি। বরং তাঁরা মোশির ব্যবস্থার অনুসারী ছিলেন। এছাড়া মোশির ব্যবস্থায় শাস্তি, দন্ড, গোসলের বিধান, পবিত্রতা ও শুচিতার বিধান, শুচি ও অশুচি খাদ্য ও পানীয় ইত্যাদির বিধান রয়েছে। প্রচলিত নতুন নিয়ম থেকে প্রমাণিত হয় যে, যীশুর ব্যবস্থায় এ সব কিছুই নেই। মোশি তার জাতির মানুষের কাছে সম্মানিত মর্যাদাময় নেতা ছিলেন, সকলেই যার আনুগত্য করত এবং তার আদেশ ও নিষেধ কার্যকর করা হতো। যীশু এরূপ ছিলেন না। এছাড়া খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন তার অনুসারীদের পাপমুক্তির জন্য। মোশি তার অনুসারীদের পাপমুক্তির জন্য ক্রুশে আরোহণ করেন নি।

(৩) এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে: “উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে (from among their brethren)”। আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, ইস্রায়েল সন্তানদের দ্বাদশ বংশ সকলেই তখন মোশির নিকট উপস্থিত ছিলেন। যদি এ ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য হতো যে, এ প্রতিশ্রুত ভাববাদী ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের কোনো বংশে জন্মগ্রহন করবেন,

তবে এখানে ঈশ্বর "উহাদের মধ্য হইতে" বলতেন, "উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে" বলতেন না। 'ভ্রাতৃগণ' কথাটি থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, প্রতিশ্রুত ভাববাদী ইস্রায়েলীদের দ্বাদশ বংশের কোনো বংশের অন্তর্ভুক্ত হবেন না, বরং দ্বাদশ বংশের সকলের 'ভ্রাতৃগণের' মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। যেহেতু যিহোশূয় ও ঈসা আলাইহিস সালাম উভয়েই ইয়াকূব আলাইহিস সালাম বা ইস্রায়েলের সন্তান, সেহেতু তাঁরা উভয়েই ইস্রায়েল-সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই তাঁরা এ ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য হতে পারেন না।

প্রকৃত সত্য হলো, এখানে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বুঝানো হয়েছে, কারণ তিনি ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের ভ্রাতৃগণ অর্থাৎ ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর বংশধর ছিলেন। আর বাইবেলে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-কে ইস্রায়েল-সন্তানদের ইসমাঈল ও তাঁর বংশধরের "ভ্রাতৃগণ" বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ হাগার (Hagar) বা হাজেরাকে তাঁর পুত্র ইসমাঈলের বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে প্রতিশ্রুতিতে 'ভ্রাতৃগণ (brethren) শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আদিপুস্তক ১৬/১২ শ্লোকে বলা হয়েছে: "সে তাহার ভ্রাতৃগণের সম্মুখে (সকল ভ্রাতার সম্মুখে) বসতি স্থাপন করিবে।" (he shall dwell in the presence of all his brethren)।"

অনুরূপভাবে আদিপুস্তক ২৫/১৮ শ্লোকে ইসমাঈলের বিষয়ে 'ভ্রাতৃগণ' শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। "তিনি তাহার সকল ভ্রাতার (all his brethren) সম্মুখে বসতিস্থান পাইলেন।"

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইস্রায়েল-সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ ইসমায়েল সন্তানগণের বংশধর, এজন্য এ ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে প্রযোজ্য।

(৪) উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, 'আমি উৎপন্ন করিব (আরবী বাইবেলের ভাষ্য অনুসারে: আগামীতে উৎপন্ন করিব)'। আর এ কথা বলার সময় যিহোশূয় ইস্রায়েল সন্তানগণের সাথে মোশির নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং মোশির স্থলাভিষিক্ত ভাববাদী তিনি। কাজেই এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর ক্ষেত্রে কিভাবে প্রযোজ্য হবে?

(৫) এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে: " তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব"। একথা থেকে বুঝা যায় যে, এই ভাববাদীর উপর পৃথক 'আসমানী কিতাব' অবতীর্ণ হবে এবং নিরক্ষর হওয়ার কারণে তিনি তা লিখিতভাবে পাঠ করতে পারবেন না, বরং মুখস্থ রেখে মুখে পাঠ করবেন। এ দুটি বিষয়ের কোনোটিই যিহোশূয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাঁর উপর কোনো পৃথক "বাক্য" নাযিল হয় নি, এবং তিনিও মুখের বাক্য নয়, বরং লিখিত তাওরাত থেকে পাঠ করতেন।

(৬) এ ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে: " আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না

করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব"। এ ভাববাদীর বৈশিষ্ট্য বুঝানোর জন্য একথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, এই প্রতিশোধ বিশেষ ধরনের শাস্তি, যা সাধারণ ভাববাদীগণের কথা অমান্য করলে প্রযোজ্য নয়। কজেই এ প্রতিশোধ বলতে শুধু পারলৌকিক জাহান্নামের শাস্তি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা শাস্তি হতে পারে না। কারণ যে কোনো ভাববাদীর কথায় কর্ণপাত না করলেই এরূপ প্রতিশোধ বা শাস্তি আল্লাহ প্রদান করেন। এভাবে বুঝা যায় যে, এখানে প্রতিশোধ বলতে 'ব্যবস্থা' নির্ধারিত প্রতিশোধ বুঝানো হয়েছে। এ ভাববাদী আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হবেন তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলে তাকে শাস্তি প্রদানের। এ বিষয়টি যীশুর ক্ষেত্রে কোনোভাবেই প্রয়োজ্য নয়; কারণ তাঁর ব্যবস্থায় তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলে বা ব্যবস্থা পালন না করলে কোনো শাস্তি, দন্ড বা যুদ্ধের বিধান নেই। এজন্য এ বিষয়টি শুধু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাঁর মাধ্যমে প্রদত্ত আল্লাহর বিধান অমান্য করলে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে শত্রুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা জিহাদের ব্যবস্থা মহান আল্লাহ তাঁকেই দিয়েছিলেন।

(৭) উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে, ঈশ্বর যে কথা বলেন নি, সে কথা যদি কোনো ভাববাদী ঈশ্বরের নামে বলে তবে তাকে নিহত হতে হবে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সত্য ভাববাদী না হতেন তবে তিনি অবশ্যই নিহত

হতেন। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ এ বিষয়ে বলেছেন: “সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত, আমি অবশ্যই তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী।”[249]

কিন্তু তিনি নিহত হন নি বা বিনষ্ট হন নি। তাঁকে হত্যার বা গুপ্ত হত্যার জন্য কাফিরদের প্রানান্ত প্রচেষ্টা ছাড়াও তিনি নিজে বহুবার যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করেছেন, একাকী যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থেকেছেন, কিন্তু তাঁর শত্রুরা তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হয় নি। তাঁর বিষয়ে আল্লাহ বলেছেন: “আল্লাহ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন।”[250] আর আল্লাহ তাঁর এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। কেউ তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হয় নি। স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে তিনি সর্বোচ্চ সঙ্গীর সাথে মিলিত হয়েছেন।[251] পক্ষান্তরে খৃস্টানদের

---

[249] সূরা হাক্কা, ৪৪-৪৬ আয়াত।

[250] সূরা মায়িদা, ৬৭ আয়াত।

[251] এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অলৌকিক চিহ্নসমূহের অন্যতম। খৃস্টানগণ বিশ্বাস করেন যে, যীশু তার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং সেভাবেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পক্ষান্তরে চারিদিকে শত্রুপরিবেষ্ঠিত অবস্থাতেই আল্লাহ ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাঁকে রক্ষা করবেন, কেউ তাঁকে হত্যা করতে পারবে না। একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনিশ্চিত না হলে কেউ এরূপ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না। আর আমরা দেখছি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং কেউ তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয় নি।

বিশ্বাস অনুসারে যীশু নিহত হয়েছেন এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। এজন্য যদি কেউ দাবি করেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যীশুর বিষয়ে কথিত, তবে তাতে প্রমাণিত হবে যে, তিনি মিথ্যাবাদী ভাববাদী ছিলেন বা ঈশ্বরের নামে তিনি মিথ্যা বলেছিলেন। ইয়াহূদীরা তাঁর বিষয়ে এরূপ বিশ্বাসই পোষণ করে। নাঊযু বিল্লাহ!

বিশেষ দ্রষ্টব্য: মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিহত হন নি, বরং স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন, কাজেই উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য। এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর খৃস্টান ধর্মগুরুগণ তাদের বাইবেল পরিবর্তন করেন। প্রাচীন আরবী অনুবাদগুলিতে দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/২০ শ্লোক নিম্নরূপ ছিল: “কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্বক তাহা বলে, কিমবা অন্য দেবতাদের নামে যে কেহ কথা বলে, সেই ভাববাদীকে নিহত হইতে হইবে।” কিন্তু খৃস্টানধর্মগুরুগণ একে পরিবর্তন করে ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের অনুবাদে লিখেছেন: “.... সেই ভাববাদীকে মরিতে হইবে।” এভাবে তারা নিহত হওয়ার পরিবর্তে মরার কথা লিখলেন। তাদের উদ্দেশ্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নুবুওয়াতের সত্যতা অস্বীকার করার পথ তৈরি করা। নিহত হওয়া ও মরার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। সত্য ও ভন্ড উভয় প্রকারের ভাববাদীই মৃত্যুবরণ করবে, এতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার সুযোগ থাকে না। তবে এ

বিকৃতির মাধ্যমে তার সত্য পুরোপুরি গোপন করতে পারেন নি। নিম্নের বিষয় লক্ষ্য করুন:

(৮) উপরের ভবিষ্যদ্বাণীর ২২ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোনো ভাববাদী সদাপ্রভুর নামে মনগড়া কিছু বলেন, তবে তিনি তা কখনো সিদ্ধ হতে দেন না, বরং তার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। প্রথম অনুচ্ছেদে পাঠক দেখেছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সত্য নবী ছিলেন।

(৯) ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন যে, তোরাহ-এ যে ভাববাদী আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই সেই প্রতিশ্রুত ভাববাদী। তবে তাদের কেউ তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছেন, যেমন মুখাইরিক, আব্দুল্লাহ ইবনু সাল্লাম, কা’ব আল-আহবার। অন্য অনেক ইয়াহূদী তাঁকে প্রতিশ্রুত ভাববাদী বুঝতে পেরেও অবিশ্বাসের মধ্যেই থেকেছেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু সূরবা, হুয়াই ইবনু আখতাব, তার ভাই আবূ ইয়াসির ইবনু আখতাব। আর এরূপ অবিশ্বাস তো খুবই স্বাভাবিক। বাইবেল থেকে জানা যায় যে, যীশুর সমসাময়িক অনেক ইয়াহূদী পণ্ডিত তাঁর নুবুওয়াত ও মুজিযা সঠিক বলে স্বীকার করেন, কিন্তু তারা ঈমান গ্রহণ করেন নি। সুসমাচার লেখক যোহনের সাক্ষ্য অনুসারে

মহাযাজক কায়াফা (Caiaphas) একজন ভাববাদী ছিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, যীশুই প্রতিশ্রুত মসীহ বা খৃস্ট। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতি ঈমান আনেন নি। বরং তাঁকে 'ঈশ্বর-নিন্দা'র (blasphemy) অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাকে মৃত্যুদন্ড প্রদানের নির্দেশ দেন। যোহনলিখিত সুসমাচারের ১১ ও ১৮ অধ্যায়ে তা বলা হয়েছে।[252]

প্রথম আপত্তি: এখানে কেউ বলতে পারেন যে, 'ইস্রায়েল সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ' বলতে শুধু ইসমাঈল সন্তানগণকেই বুঝানো হবে এমন তো নয়। বরং ইসমাঈল সন্তানগণ ছাড়াও এষৌ[253]-এর বংশধর এবং অব্রাহামের অন্য স্ত্রী কটুরার পুত্রদের বংশধরগণও 'ইস্রায়েল সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ' বলে গণ্য। (কাজেই এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী তো এদের মধ্য থেকেও আসতে পারেন।)

এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য যে, হ্যাঁ, তারাও ইস্রায়েল সন্তানগণের ভ্রাতৃগণ' বলে গণ্য। তবে তাদের মধ্য থেকে এ সকল বৈশিষ্ট্য সহ কোনো ভাববাদী আবির্ভুত হন নি। এছাড়া ইশ্মায়েলের বংশধরদের জন্য আল্লাহ যেভাবে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের জন্য সেরূপ কোনো প্রতিশ্রুতি দেন নি। পক্ষান্তরে ইশ্মায়েলের

[252] যোহন ১১/৪৯-৫৭, ১৮/১-২৪।

[253] ইসহাকের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং যাকোব বা ইস্রায়েল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

বংশধরদেরকে মহা মর্যাদা দানের বিষয়ে হাগার (Hagar)[254] এবং অবরাহামকে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[255]

এ ছাড়া ইসহাক যাকোবকে যে আশীর্বাদ করেন এবং এরপর এষৌকে যে আশীর্বাদ করেন তা থেকে জানা যায় যে, এষৌ-এর বংশধরদের মধ্যে এই প্রতিশ্রুত ভাববাদীর আগমন সম্ভব নয়। আদিপুস্তকের ২৭ অধ্যায়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[256]

---

[254] বিবি হাজেরা

[255] আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে ঈশ্বর অবরাহামকে বলেন: "আর ইশ্মায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব (I will make him a great nation)।

[256] বাইবেল থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বরকে প্রতারণা করা ও ধোঁকা দেওয়া খুবই সহজ! শেষ বয়সে ইসহাক অন্ধ হয়ে যান। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌকে বলেন, আমাকে প্রান্তর থেকে মৃগ শিকার করে সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করে খাওয়াও, যেন আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্বাদ করে। এষৌ প্রান্তরে গমন করলে ছোট ভাই যাকোব বড় ভাইয়ের পোশাক পরে, নিজেকে এষৌ বলে দাবি করে পিতার নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। পিতা বারংবার তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সেই এষৌ কিনা। বারংবার নিশ্চয়তা প্রদানের পরে পিতা তাকে আশীর্বাদ করেন। তিনি মূলত এষৌকেই আশীর্বাদ করেন। এরপর প্রকাশ পায় যে, সবই ছিল প্রবঞ্চনা ও ধোঁকা। কিন্তু ঈশ্বর এই ধোঁকায় প্রবঞ্চিত হয়ে প্রবঞ্চক যাকোবকেই দুধ, মধু ও সকল কর্তৃত্ব দিতে বাধ্য হন! আর সহজ, সরল, সত্যবাদী ও পিতার

দ্বিতীয় আপত্তি: দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে মোশি বলেছেন: "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ এক ভাববাদী (a Prophet from the midst of thee, of thy brethren) উৎপন্ন করিবেন...।" এখানে "তোমার মধ্য হইতে" কথাটি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, এই প্রতিশ্রুত ভাববাদী ইস্রায়েল সন্তানগণের মধ্য থেকে আবির্ভুত হবেন, ইশ্মায়েল সন্তানগণের মধ্য থেকে নয়।

এ আপত্তির বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, আরবী ও হিব্রু ব্যাকরণ অনুসারে (তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে) কথাটি (তোমার মধ্য হইতে) কথাটির "বদল", অর্থাৎ আংশিক বা সংশোধন মূলক প্রতিকল্প বাক্যাংশ। আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় তা 'বদল ইশতিমাল' বা 'আংশিক পরিবর্তন' অথবা 'বদল ইদরাব' বা 'সংশোধনমূলক পরিবর্তন' বলে গণ্য। আর উভয় ক্ষেত্রেই প্রথম শব্দ

নির্দেশ যথাযথ পালনকারী এষৌ-এর ভাগ্যে জোটে সকল অভিশাপ। আর ঈশ্বর সদাপ্রভু সেই অভিশাপ বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হলেন!!! যাইহোক যাকোবের জন্য ইসহাক আশীর্বাদ করেন: "তুমি আপন জ্ঞাতিদের কর্তা হও, তোমার মাতৃপুত্রেরা তোমার কাছে প্রণিপাত করুক।" আর এষৌকে তিনি আশীর্বাদ করে বলেন: "তুমি খড়্গজীবী এবং আপন ভ্রাতার দাস হইবে"। এথেকে বুঝা যায় যে, এষৌ-এর বংশে কোনো মহান ভাববাদী জন্ম নিতে পারেন না।

বা বাক্যাংশটি বক্তার উদ্দেশ্য বহির্ভুত বলে গণ্য।[257] এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বাক্যাংশই মূল উদ্দেশ্য, প্রথম বাক্যাংশ সংশ্লিষ্ট মাত্র। আর সকল অবস্থায় এ বক্তব্য মূলত আমাদের বক্তব্যের বিরোধী নয়।[258] কারণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করেন এবং সেখানেই তাঁর প্রতিশ্রুত অবস্থা পূর্ণতা লাভ করে। মদীনার মধ্যে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইয়াহূদীগণ বসবাস করতেন। খাইবার, বনূ কাইনূকা, বনূ নাযীর ও অন্যান্য ইয়াহূদী গোত্র তথায় বসবাস করতেন। তাদের অভ্যন্তরে বা তাদের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[257] আরবী-হিব্রু বা সেমিটিক ভাষায় এবং অন্যান্য ভাষায় এভাবে একটি শব্দ বা বাক্যাংশ বলে তারপর অন্যটি বললে তাকে বদল বা বিকল্প বলা হয়। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিই উদ্দেশ্য। যেমন আমি তোমাকে- তোমার ভাইকে দেখেছি, আমি বইটি- বইটির অর্ধেক পড়েছি ইত্যাদি।

[258] "তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে" বক্তব্যটির দুটি অংশ বাহ্যত পরস্পর বিরোধী। হয় একটি বাক্যাংশ পরবর্তী কালে সংযোজিত, অথবা দুটির একটি রূপক। পরবর্তী কালে সংযোজিত হলে প্রথম বাক্যাংশটিই (তোমার মধ্য হইতে) সংযোজিত বলে গণ্য হবে, কারণ পরবর্তী ১৮ আয়াতে ঈশ্বরের নিজের ভাষায় যে বক্তব্য রয়েছে তাতে এ কথাটুকু নেই। আর যদি দুটি বাক্যাংশই সঠিক বলে গণ্য হয় তবে একটি রূপক বা প্রশস্ত অর্থে গ্রহণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রেও প্রথম বাক্যাংশটিই রূপক বলে গণ্য হবে। কারণ পরবর্তী আয়াতে এই কথাটুকু নেই এবং ব্যাকারণ ও ভাষার দিক থেকে পরবর্তী শব্দ বা বাক্যাংশই মূল বলে গণ্য করা হয়। গ্রন্থকার তা ব্যাখ্যা করেছেন।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠিত হন। এভাবে তিনি একদিকে ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন এবং অন্যদিকে ইস্রায়েল সন্তানদের ভ্রাতৃগণের মধ্য থেকে আবির্ভূত হলেন। এছাড়া ভ্রাতৃগণের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থই নিজেদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া।[259]

বাইবেলের উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুত নবী "মূসা আলাইহিস সালাম-এর সদৃশ বা তার অনুরূপ হবেন বলে বলা হয়েছে। নিম্নে মূসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্যের কয়েকটি দিক দেখুন:

---

[259] দ্বিতীয় বিবরণের ১৮/১৫ শ্লোকে প্রথম বাক্যাংশটুকু (তোমার মধ্য হইতে) যে পরবর্তী সংযোজন তার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, মোশি পরবর্তী ১৮ আয়াতে যখন এই প্রতিশ্রুতি ঈশ্বরের ভাষায় পুনরাবৃত্তি করেন তখন সেখানে এই কথাটুকু উল্লেখ করেন নি। অনুরূপভাবে যীশুর প্রেরিত শিষ্য পিতর এই প্রতিশ্রুতি উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু তাঁর উদ্ধৃতির মধ্যে (তোমার মধ্য হইতে) কথাটুকু উল্লেখ করেন নি। (প্রেরিত ৩/২২) আবার স্তিফানও (Stephen) এই প্রতিশ্রুতি উদ্ধৃত করেছেন। তার উদ্ধৃতিতেও এই কথাটুকু নেই। (প্রেরিত ৭/৩৭)। সর্বোপরি শমরীয় তোরাহ-এ দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/১৫ শ্লোকে 'তোমার মধ্য হইতে' কথাটুকু নেই। শমরীয় আয়াতের পাঠ নিম্নরূপ: "তোমার সকল ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে আমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই কথায় তোমরা কর্ণপাত করিবে।" এ বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, হিব্রু বাইবেলে দ্বিতীয় বিবরণের ১৮/১৫ শ্লোকে এ কথাটি অতিরিক্ত সংযোজন করা হয়েছে।

(১) মোশির মত তিনিও আল্লাহর বান্দা ও রাসূল (দাস ও ভাববাদী)।[260]

(২) পিতা ও মাতার সন্তান।

(৩) বিবাহিত ও সন্তান-সন্ততির পিতা।

(৪) উভয়কেই জিহাদ বা যুদ্ধ করার ও অবিশ্বাসী ও পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(৫) উভয়ের ব্যবস্থায় ব্যভিচার ও অন্যান্য অপরাধের শাস্তি ও দন্ড প্রদানের নির্দেশ রয়েছে।

(৬) উভয়েই ব্যবস্থা নির্ধারিত শাস্তি প্রদান ও প্রয়োগে সক্ষম ছিলেন।

(৭) উভয়েই নিজ জাতির মধ্যে সম্মানিত নেতা ছিলেন, যাকে সকলেই মান্য করেছেন এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধ পালন করেছেন।

(৮) উভয়ের শরীয়ত বা ব্যবস্থায় প্রার্থনা বা ইবাদতের সময় দেহ ও পরিচ্ছদের পবিত্রতা অর্জনের বিধান রয়েছে, অপবিত্রতা, মহিলাদের মাসিক বা প্রসবোত্তর অপবিত্রতা থেকে গোসল করার নির্দেশ রয়েছে।

---

[260] বাইবেলে বারংবার মোশিকে আল্লাহর দাস ও রাসূল বলা হয়েছে।

(৯) উভয় শরীয়তে মৃত প্রাণী, জবাই না করা প্রাণী ও প্রতিমার জন্য উৎসর্গীত প্রাণী অবৈধ করা হয়েছে।

(১০) উভয় ব্যবস্থায় অপরাধ-আইন ও বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

(১১) উভয় ব্যবস্থায় সুদ নিষিদ্ধ।

(১২) উভয়েই স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন এবং স্বাভাবিকভাবে কবরস্থ হয়েছেন।

এরূপ আরো অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলি দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মূসা আলাইহিস সালাম-এর সদৃশ বা তুল্য (like unto thee/Moses) ছিলেন। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন: "আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ, যেরূপ রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফিরাউনের নিকট।"[261]

৪. ২. ২. ২. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ক দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী

দ্বিতীয় বিবরণের ৩৩/১-২: "(১) আর ঈশ্বরের লোক মোশি মৃত্যুর পূর্বে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে যে আশীর্বাদে আশীর্বাদ করিলেন তাহা এই। (২) তিনি কহিলেন: সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন, সেয়ীর

[261] সূরা মুয্যাম্মিল, ১৫ আয়াত।

হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন; পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন, দশ সহস্র (অযুত অযুত)[262] পবিত্রের সহিত (নিকট হইতে)[263] আসিলেন; তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল। (The LORD came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints: from his right hand went a fiery law for them)[264]

এখানে 'সীনয় হইতে সদাপ্রভুর আগমনের' অর্থ মোশিকে তোরাহ প্রদান করা এবং 'সেয়ীর হইতে উদিত হওয়ার' অর্থ যীশুকে ইনজীল প্রদান করা। আর পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করার অর্থ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা। কারণ 'পারণ পর্বত' মক্কার একটি পর্বত। আদিপুস্তক ২১/২০-২১ শ্লোকে ইশ্মায়েলের বর্ণনায় বলা হয়েছে: "(২০) পরে ঈশ্বর বালকটির সহবর্তী হইলেন, আর সে বড় হইয়া উঠিল, এবং প্রানতরে থাকিয়া ধনুর্ধর হইল। (২১) সে পারণ প্রানতরে বসতি করিল (he dwelt in the wilderness of Paran)। আর তাহার মাতা তাহার বিবাহার্থে মিসর দেশ হইতে এক কন্যা আনিল।"

---

[262] বাংলা বাইবেলে "অযুত অযুত", ইংরেজিতে (ten thousands)।

[263] বাংলা বাইবেলে 'নিকট হইতে' লেখা হয়েছে। তবে ইংরেজি (with) এর অনুবাদ 'সহিত' হওয়া বাঞ্ছনীয়।

[264] দ্বিতীয় বিরণ ৩৩/২।

নিঃসন্দেহে ইশ্মায়েলের অবস্থান মক্কায় ছিল। যদ্বারা জানা যায় যে, পারণ প্রান্তর বলতে মক্কাকেই বুঝানো হয়েছে এবং পারণ মক্কার একটি পর্বতের নাম।[265] উপরন্তু শমরীয় তাওরাতে সুস্পষ্টত পারানকে হিজাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৫১ সালে মুদ্রিত শমরীয় তাওরাতে ইশ্মায়েলের বর্ণনায় আদিপুস্তকের ২১/২১ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "সে হিজাজে অবস্থিত পারণ প্রানতরে বসতি করিল।"

এ পারণ প্রান্তরে বা হিজাজে ও মক্কায় ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর বংশে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া অন্য কোনো নবী-ভাববাদীর আবির্ভাব ঘটে নি। এতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, 'পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করার' অর্থ মক্কায় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ করা। কারণ কোনো স্থানে আল্লাহর ওহী বা প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হলে বা 'ঐশ্বরিক প্রতাপ' প্রকাশ পেলেই বলা চলে যে, আল্লাহ অমুক স্থান থেকে আগমন করলেন, অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশনা বা বিধান সেখান থেকে আগমন করল।

---

[265] এ বিষয়ে হবক্কূক ভাববাদীর পুস্তকের ৩ অধ্যায়ের তিন আয়াতে বলা হয়েছে: "ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন, পারণ পর্বত হইতে পবিত্রতম আসিতেছেন। [সেলা] আকাশমন্ডল তাঁহার প্রভায় সমাচ্ছন্ন, পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ (God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise)। মুহাম্মাদ অর্থই প্রশংসিত: praised।

ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ স্বীকার করেন যে, সিনাই-এ তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছে। অনুরূপভাবে সেয়ীর বা ফিলিস্তিনে ইঞ্জিল বা সুসমাচারের আগমন ঘটেছিল। কাজেই পারণ থেকে তেজ প্রকাশের অর্থ মক্কায় কুরআন কারীম অবতীর্ণ হওয়া। আর কুরআনের প্রথম অবতরণ শুরু হয়েছিল পারণ পর্বতের সর্বোচ্চ অংশে, হেরা পাহাড়ের গুহায়।

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, দশ সহস্র পবিত্র ব্যক্তিসহ (with ten thousands of saints) আগমন এবং দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা (from his right hand went a fiery law for them) মোশি বা যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অযুত অযুত বা দশ সহস্র পবিত্র ব্যক্তি বলতে সাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে[266] যারা তাঁর সহযোগিতায় রত ছিলেন, তাঁর অনুসরণ করে ও তাঁর সাথে শত্রুদের মুকাবিলা করে দীনকে বিজয়ী করেন।

বস্তুত যে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি সাধ্যমত নিরপেক্ষতার সাথে যদি যাচাই করেন যে পারণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশকারী, অযুত অযুত পবিত্রের সাথে আগমন কারী, দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় বিধান-সহ আগমনকারী নবী কে? তাহলে তিনি সুনিশ্চিত বুঝতে

[266] মক্কা বিজয়ের সময় তিনি দশ সহস্র সাথী সহ মক্কায় আগমন করেন।

পারবেন যে, তিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া কেউ নন।

যেহেতু এ ভবিষ্যদ্বাণীটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াত প্রমাণ করে, এজন্য খৃস্টান ধর্মগুরুগণ বাইবেলের কোনো কোনো আধুনিক অনুবাদে "দশ সহস্র (অযুত অযুত) পবিত্রের সহিত আসিলেন (he came with ten thousands of saints)" এবং "তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল (from his right hand went a fiery law for them)"-এ দুটি বাক্য উল্লেখ করছেন না বা পরিবর্তন করছেন।

বাইবেলের এ বাণীটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তিনজন নবীর- মূসা আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের এবং তাঁদের উপর তিনটি আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ঘোষণা করছে। বাইবেলের এ বক্তব্যটি কুরআনের সূরা তীন-এর ১-৩ আয়াতের বক্তব্যের সাথ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ আয়াতগুলিতে মহান আল্লাহ বলেন: "(১) শপথ তীন ও যাইতুন-এর (২) শপথ সিনাই পর্বতের (৩) এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর।"

এ তিন আয়াতে উপর্যুক্ত তিনজন নবীর প্রেরণের স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে "তীন ও যায়তূন" বলে ফিলিস্তিনের কথা উল্লেখ

করা হয়েছে, কারণ সেখানেই এ দুটি ফলের উৎপাদন ব্যাপক। এরপর সিনাই পর্বত ও মক্কার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনার পার্থক্য হলো, কুরআনে গুরুত্বের পর্যায়ক্রমিকতায় ক্রমবৃদ্ধি এবং বাইবেলে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা হয়েছে। গুরুত্বের দিক থেকে সিনাই পর্বতে প্রাপ্ত মূসা আলাইহিস সালাম-এর প্রত্যাদেশ ফিলিস্তিনে (সেয়ীরে) প্রাপ্ত ঈসা আলাইহিস সালাম-এর প্রত্যাদেশের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ[267] এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ তাঁদের উভয়ের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অনুরূপভাবে মক্কা ফিলিস্তিন ও সিনাই থেকে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন।

পক্ষান্তরে বাইবেলের বক্তব্যে ঐতিহাসিক ক্রম ও ধারাবাহিকতা বর্ণনা উদ্দেশ্য। এজন্য প্রথমে সিনাই, এরপর ফিলিস্তিন এবং সবশেষে মক্কা বা পারণ পর্বতের কথা বলা হয়েছে। এখানে মূসা আলাইহিস সালাম-এর নুবুওয়াতকে প্রভাতের আগমনের সাথে তুলনা করা হয়েছে, ঈসা আলাইহিস সালাম-এর নুবুওয়াতকে সূর্যোদয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াতকে দিবসের সর্বগ্রাসী প্রকাশ ও শক্তিময়

---

[267] বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যীশু বারংবার ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মূসার (আ) বিধান ও প্রত্যাদেশের অধীন এবং সেটি পালন ও পূর্ণতা দানের জন্যই তিনি এসেছেন।

আলোর বিকীরণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। স্বভাবতই তৃতীয় পর্যায়টি প্রথম দুটি পর্যায়ের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও ব্যাপকতর। এ সময়েই সূর্য তার পরিপূর্ণ তেজ প্রকাশ করে এবং সকল সৃষ্টি আলো, তাপ ও শক্তি লাভ করে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ দীন ও গ্রন্থ যেভাবে আপন তেজে শিরক, কুফর, মুর্তিপূজা, পাপ ও অনাচারের অন্ধকার অপসারণ করেছে পৃথিবীর বুকে আর কোনো ধর্মই সেভাবে তেজ প্রকাশ করে নি।

৪. ২. ২. ৩. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ক তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী

আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ের ২০ আয়াতে ঈশ্বর অবরাহামকে ইশ্মায়েলের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন: "আর ইশ্মায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব (And as for Ishmael, I have heard thee: Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation)

"আমি তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব (multiply him exceedingly) কথাটি কোনো কোনো প্রাচীন আরবী অনুবাদে নিম্নরূপ: "আমরা তাহাকে বৃদ্ধি করিব **মাদমাদ** দ্বারা।"

৫ম হিজরী শতকের (খৃস্টীয় দ্বাদশ শতকের) প্রসিদ্ধ আলিম কাযী ইয়ায (৫৪৪ হি/১১৪৯খৃ) তার ‘আশ-শিফা’ গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে ‘মাদমাদ’ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি নাম। এখানে “আমি তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব” এবং “আমি তাহাকে বড় জাতি করিব” বাক্যদ্বয় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াতের ভবিষ্যদ্বাণী। কারণ ইশ্মায়েলের বংশে তিনি ছাড়া আর কোনো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি যিনি এ জাতিকে বড় জাতি (great nation) করেছেন। ইশ্মায়েল বংশে তিনিই একমাত্র নবী যাঁর আগমনের মধ্য দিয়েই ইশ্মায়েল বংশ বড় জাতিতে পরিণত হয়। মহান আল্লাহ কুরআনে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর প্রার্থনা উদ্ধৃত করেছেন। কুরআনের ভাষায় তাঁরা বলেন: “হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করো, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে, তাদেরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”[268]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আহমদ কুরতুবী (১২৭৩ খৃ) তার ‘আল-ই’লাম বিমা ফী দীনিন নাসারা মিনাল ফাসাদি ওয়াল আওহাম’

---

[268] সূরা বাকারা, ১২৯ আয়াত।

(খৃস্টধর্মের অন্তর্ভুক্ত বিভ্রান্তি ও কল্পকাহিনীর বিবরণ) নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হিব্রু পাঠে এখানে দু স্থানে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামের সাংখ্যিক মান দেওয়া হয়েছে। ইয়াহূদীদের মধ্যে সংখ্যার একটি হিসাব প্রচলিত। প্রত্যেক বর্ণের একটি সাংখ্যিক মান রয়েছে এবং শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত অক্ষরগুলির সাংখ্যিক মান হিসাব করে তারা বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেন। এ হিসাব অনুসারে এ শ্লোকে সংখ্যার ভাষায় দুইবার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথমবার: 'অতিশয়' বা 'অনেক অনেক' (exceedingly)। হিব্রু ভাষায় শব্দটি 'বিমাদমাদ'। হিব্রু ও আরবী বর্ণমালার সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে এ শব্দটির সংখ্যা ৯২: বা=২, মীম=৪০, আলিফ=১, দাল=৪, দ্বিতীয় মীম=৪০, আলিফ=১, দাল=৪, মোট ৯২। মুহাম্মাদ শব্দের অক্ষরগুলির গণনাফলও ৯২: মীম=৪০, হা=৮, মীম=৪০, দাল=৪।

দ্বিতীয়বার: 'বড় জাতি' (great nation)। হিব্রু ভাষায় এখানে বলা হয়েছে: "লুগাই গাদূল"। হিব্রু ভাষায় জীম ও সাদ নেই। এজন্য হিব্রু ভাষায় গাইনই জীমের স্থলাভিষিক্ত। হিব্রু ভাষায় লাম=৩০ ও গাইন=৩, ওয়াও=৬, ইয়া=১০, গাইন=৩, দাল=৪, ওয়াও=৬, লাম=৩০। এখানেও মোট ৯২।

আব্দুস সালাম ছিলেন দশম হিজরী শতাব্দী বা ১৬শ খৃস্টীয় শতকের একজন ইয়াহূদী ধর্মগুরু ও পণ্ডিত। তিনি ইসলাম গ্রহণের

পরে ‘আর-রিসালা আল-হাদীয়া’ (পথনির্দেশক পুস্তিকা) নামে একটি ছোট্ট পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ইয়াহূদী ধর্মগুরুদের অধিকাংশ দলিলপ্রমাণের ভিত্তি বর্ণমালার বর্ণগুলির সংখ্যাতাত্ত্বিক মানের উপর। এ শ্লোকে বিদ্যমান “বিমাদমাদ” শব্দকে “মুহাম্মাদ” শব্দের প্রতি ইঙ্গিত হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়ে ইয়াহূদী পণ্ডিতদের আপত্তি তিনি বিভিন্ন ইয়াহূদী ব্যবহারের ভিত্তিতে খণ্ডন করেছেন।

উপরের বিষয়টি বাদ দিলেও আক্ষরিকভাবেই বাইবেলের উপর্যুক্ত বক্তব্য মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের সুসংবাদ। কারণ এখানে ইসমাঈলের আলাইহিস সালাম প্রশংসা ও মর্যাদা বৃদ্ধির সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাকে অতিশয় বৃদ্ধি করবেন এবং বড় জাতি করবেন। এদ্বারা কখনোই স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধি বুঝানো হয় নি। কারণ স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধিতে কোনো মর্যাদা নেই। কারণ সকল মানুষেরই বংশবৃদ্ধি হয়। নিঃসন্দেহে এখানে বিশেষ মর্যাদাময় বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর উত্তরপুরুষ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগে ইসমাঈলের বংশধর ইতিহাসে বা মানব সভ্যতায় কোনো বিশেষ বৃদ্ধি বা “বড় জাতি” হিসেবে প্রকাশ লাভ করেন নি। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমেই এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁর মাধ্যমেই ইসমাঈলের আলাইহিস সালাম

বংশ ও বংশের অনুসারী “অতিশয় বৃদ্ধি” পেয়েছে এবং বিশ্ব সভ্যতায় “বড় জাতি” হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। যদি কেউ তা অস্বীকার করেন তাহলে তাকে বলতে হবে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছাড়া কখন ও কিভাবে ইসমাঈলকে আলাইহিস সালাম বড় জাতিতে পরিণত করার এ প্রতিশ্রুতি আল্লাহ পুরণ করেছেন?

৪. ২. ২. ৪. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ক চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণী

দ্বিতীয় বিবরণের ৩২ অধ্যায়ের ২১ আয়াতে ইস্রায়েল-সন্তানদের অবিশ্বাস, মুর্তিপূজা, অনাচার ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে: “উহারা অনীশ্বর দ্বারা (with that which is not God) আমার অনতর্জ্বালা জন্মাইল, স্ব স্ব অসার বস্তু (অসার উপাস্য: idols)[269] দ্বারা আমাকে অসন্তুষ্ট করিল; আমিও নজাতি দ্বারা (with those which are not a people) উহাদের অনতজ^র্ালা জন্মাইব, মূঢ় জাতি (a foolish nation) দ্বারা উহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিব।”

এ ভবিষ্যদ্বাণীর মর্ম আরো সুস্পষ্ট হয় যিশাইয় ৬৫/১-৬ শ্লোক দ্বারা: “(১) যাহারা জিজ্ঞাসা করে নাই, আমি তাহাদিগকে আমার অনুসন্ধান করিতে দিয়াছি; যাহারা আমার অন্বেষণ করে নাই, আমি

[269] ইংরেজি কিং জেমস ভার্সন বা অথরাইজড ভার্সনে (with their vanities) এবং রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্সনে (with their idols) লেখা হয়েছে। আরবী বাইবেলে (তাদের অসার উপাস্যগণ দ্বারা) লেখা হয়েছে।

তাহাদিগকে আমার উদ্দেশ পাইতে দিয়াছি; যে জাতি আমার নামে আখ্যাত হয় নাই, তাহাকে আমি কহিলাম, 'দেখ, এই আমি, দেখ এই আমি।'। (২) আমি সমস্ত দিন বিদ্রোহী প্রজাবৃন্দের প্রতি আপন অঞ্জলি বিস্তার করিয়া আছি; তাহারা আপন আপন কল্পনার অনুসরণ করিয়া কুপথে গমন করে। (৩) সেই প্রজারা আমার সাক্ষাতে নিত্য নিত্য আমাকে অসন্তুষ্ট করে, উদ্যানের মধ্যে বলিদান করে, ইষ্টকের উপরে সুগন্ধিদ্রব্য জ্বালায়। ৪ তাহারা কবর-স্থানে বসে, গুপ্তস্থানে রাত্রি যাপন করে (Which remain among the graves, and lodge in the monuments); {মুর্তি-প্রতিমার মন্দিরে রাত্রিযাপন করে}[270] তাহারা শূকরের মাংস ভোজন করে, ও তাহাদের পাত্রে ঘৃণার্হ মাংসের ঝোল থাকে; ৫ তাহারা বলে, স্বস্থানে থাক, আমার নিকটে আসিও না, কেননা তোমা অপেক্ষা আমি পবিত্র। ইহারা আমার নাসিকার ধূম, সমস্ত দিন প্রজ্বলিত অগ্নি। ৬ দেখ, আমার সম্মুখে ইহা লিখিত আছে; আমি নীরব থাকিব না, প্রতিফল দিব; ইহাদের কোলেই প্রতিফল দিব।''

এখানে মূঢ় (আরবী বাইবেলে: জাহিল) জাতি বলতে আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ তারা ছিল মূঢ়তা, মুর্খতা, ও বিভ্রান্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে। তাদের নিকট কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল না। ধর্মীয় জ্ঞান বা

---

[270] ১৮৪৪ সালের আরবী বাইবেল থেকে।

বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন-বিজ্ঞান কিছুই তাদের ছিল না। তারা মুর্তি বা জড়-পূজা ছাড়া কিছুই জানত না। ‘যাহারা জিজ্ঞাসা করে নাই’ এবং ‘ যাহারা আমার অন্বেষণ করে নাই’ বলতেও আরবদেরকেই বুঝানো হয়েছে। কারণ আল্লাহর সত্ত্বা, গুণাবলি ও ব্যবস্থা সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ছিল। তারা আল্লাহর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না এবং অনুসন্ধানও করত না। এ বিষয়ে কুরআন কারীমে বলা হয়েছে: “আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্য অনুগ্রহ করেছেন, তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের জন্য রাসূল প্রেরণ করে, সে তাঁর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করে, তাদেরকে পরিশোধন করে এবং কিতাব (গ্রন্থ) ও হিকমাহ (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।”[271]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন: “তিনিই প্রেরণ করেছেন অজ্ঞ-নিরক্ষরদের মধ্যে একজন রাসূল তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দান করেন, যদি তারা এর আগে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল।”[272]

দাসী হাগারের (হাজেরার) পুত্র ইশ্মাইলের বংশধর হওয়ার কারণে এবং ধর্মবিষয়ক অজ্ঞতার কারণে ইয়াহূদীগণ তাদেরকে ঘৃণা করত।

---

[271] সূরা আল-ইমরান, ১৬৪ আয়াত।

[272] সূরা জুমুআ: ২ আয়াত।

ইয়াহূদীরা ইবরাহীমের স্বাধীন স্ত্রীর সন্তান, আল্লাহর আশীর্বাদ-প্রাপ্ত, নবীগণের বংশধর, আসমানী কিতাব ও ব্যবস্থার অনুসারী হিসেবে নিজেদেরকে উন্নত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতি বলে মনে করত।

কিন্তু তারা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়। অনিশ্বর বা মুতি-প্রতিমার পূজা, বিভিন্ন অনাচার ও পাপ তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। উপরের বক্তব্যদ্বয়ে তাদের এ সকল অনাচারের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ সকল কারণে মহান প্রতিপালক এ বিদ্রোহী জাতিকে পরিত্যাগ করে উম্মাতে মুহাম্মাদীকে বেছে নিয়েছেন।

তাহলে এ আয়াতের অর্থ, ইস্রায়েলীয়গণ তাদের স্ব স্ব অসার দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করে আমাকে অসন্তুষ্ট করে। এজন্য তাদেরই নিকট ঘৃণিত একটি মুর্খ ও মূঢ় জাতির দ্বারা আমি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করব।[273] তিনি তাঁর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। তিনি ইয়াহূদীগণ

---

[273] এখানে অন্য একটি বিষয় লক্ষণীয়। ইহূদীগণ একত্ববাদ বিনষ্ট করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে। এর বিপরীতে একটি মুঢ় জাতিকে প্রকৃত ও সত্য একত্ববাদ প্রদান করে তাদের মাধ্যমে আল্লাহ ইস্রায়েলীয়গণকে অসন্তুষ্ট করেন। আর এজন্যই মুসলিমদের প্রতি ইহূদীদের অন্তর্জ্বালা ও অসন্তুষ্টি চিরন্তন। তাত্ত্বিকভাবে তারা স্বীকার করতে বাধ্য যে, খৃস্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ইত্যাদি অত্যন্ত বিকৃত, ঘৃণ্য ও ঈশ্বরের অবমাননাকর বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে ইসলামী একত্ববাদ, মুর্তিপূজার বিরোধিতা, ইবাদত-বন্দেগি, শুচিতা-অশুচিতা ইত্যাদি সবই বিশুদ্ধ একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও ইহূদী ধর্ম-ব্যবস্থার কাছাকাছি। কিন্তু

কর্তৃক ঘৃণিত এই মূঢ় জাতির মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করেন। তাঁর মাধ্যমে তিনি তাদেরকে সত্য পথের নির্দেশনা দান করেন। ইয়াহূদীরা যে জাতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করত সে জাতির মধ্যে শেষ নবীকে প্রেরণ করে, তাকে কিতাব ও হিকমাত প্রদান করে এবং তাঁর মাধ্যমে তাদেরকে সুপথে পরিচালিত করে ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে চূড়ান্তভাবে অসন্তুষ্ট করেছেন ও তাদের অন্তর্জ্বালা জন্মিয়েছেন।

ইয়াহূদীদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াত পাওয়ার পরে আরব ও মুসলিম জাতি ইয়াহূদীদেরকে যেভাবে অসন্তুষ্ট করেছে এবং অন্তর্জ্বালা দিয়েছে আর কোনো জাতি সেভাবে ইয়াহূদীদেরকে অসন্তুষ্ট করতে বা অন্তর্জ্বালা দিতে পারে নি। যদিও পারসিকগণ এবং রোমানগণ একাধিকবার ফিলিস্তিনে ইয়াহূদীদের রাজ্য বিনষ্ট করেছে এবং তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু মূসা আলাইহিস সালাম-এর নুবুওয়াত ও গ্রন্থের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ইয়াহূদীদের স্থায়ী অন্তর্জ্বালা ও অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করার মত কোনো নবী বা আসমানী গ্রন্থ তাদের মধ্যে প্রকাশ পায় নি। কিন্তু মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের প্রতি তাদের অসন্তুষ্টি এতই বেশি ও চিরস্থায়ী যে, এদের ধ্বংস করার জন্য তারা যে কোনো অপবিত্র, মুর্তিপূজক ও বহু-ঈশ্বরবাদী জাতির সাথে সকল প্রকার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মাত ইয়াহূদীদেরকে সামরিক ভাবে পরাজিত করেছে তো বটেই, উপরন্তু ইয়াহূদীদের মধ্যে নুবুওয়াতের ধারা থেমে যাওয়ার পরে মহান আল্লাহ তাঁর নুবুওয়াত ও কিতাব এ উম্মাতকে প্রদান করেন। ফলে ইয়াহূদীরা আরবদের সাথে কপটতা ও চাটুকারিতার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাদেরকে ভয় পেতে থাকে। নিঃসন্দেহে ইয়াহূদীদের জন্য অন্তর্জ্বালা ও অসন্তুষ্টির এ হলো চূড়ান্ত পর্যায়।[274]

---

[274] যে সকল জাতি দ্বারা ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়গণকে অসন্তুষ্ট করেছেন তাদের অন্যতম ব্যাবিলনীয় জাতি, গ্রীক-রোমান জাতি ও আরব জাতি। এদের মধ্যে আরবগণই ছিল মূঢ় বা জাহিল হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। অন্যান্যরা শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান-দর্শনে ইস্রায়েলীগণের সমপর্যায়ের বা তার চেয়েও অধিক উন্নত ছিল। বাইবেলের এ আয়াতের ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কোথাও কোনো ইউরোপীয় গবেষক, পন্ডিত বা পাদরি স্বীকার করবেন না যে, ব্যাবিলনীয়গণ বা গ্রীকগণ মুর্খ জাতি বা তারা আরবগণ বা ইহূদীগণের তুলনায় মুর্খ ছিল। এছাড়া আমরা দেখেছি যে, অসন্তুষ্টির মূল বিষয়- অসার দেবদেবীর উপাসনা বনাম প্রকৃত একত্ববাদ লাভ। এ দিক থেকে আরবগণ ছাড়া অন্য কোনো জাতি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে নি। সর্বোপরি এরূপ চিরন্তন অসন্তুষ্টি আর কোনো জাতির প্রতি তাদের নেই। খৃস্টানগণ দীর্ঘদিন তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেন বটে, তবে খৃস্টানগণ তো ইস্রায়েলীয়দেরই অন্তর্ভুক্ত, তাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। কাজেই তাদেরকে ভিন্ন জাতি বা মূঢ় জাতি বলে গণ্য করার কোনো উপায় নেই। এছাড়া ইহূদীদের অন্তর্জ্বালার সবচেয়ে বড় বিষয় ফিলিস্তিন ও যেরুজালেমের অধিকার। এখানেও আরবজাতিকে তাদের স্থায়ী অন্তর্জ্বালার উৎস বানিয়েছেন আল্লাহ। ইতিহাসের যে

যদি কেউ বলেন যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীতে "নজাতি (which are not a people)", "মূঢ় জাতি (a foolish nation)" বলতে বা 'যাহারা জিজ্ঞাসা করে নাই (that asked not for me)', 'যাহারা আমার অন্বেষণ করে নাই (that sought me not)', 'যে জাতি আমার নামে আখ্যাত হয় নাই (a nation that was not called by my name)' বলতে যীশু খৃস্টের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তাহলে তা একান্তই ভিত্তিহীন, অবাস্তব ও অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বলে গণ্য হবে। কারণ, যীশুখৃস্ট তো ইস্রায়েল জাতির সদস্য ও ইস্রায়েল জাতির মধ্যে ও তাঁদেরই জন্য (unto the lost sheep of the house of Israel) প্রেরিত হয়েছিলেন। সামান্য বুদ্ধি-বিবেকের অধিকারী কোনো ব্যক্তিও দাবি করতে পারেন না যে, কোনো জাতির মানুষ সে জাতির মধ্যে একজন মহান ভাববাদীর আবির্ভাব বা প্রসিদ্ধিলাভে মনোকষ্ট ও অন্তর্জ্বালা লাভ করবে। বরং অন্য কোনো জাতি বা "পরজাতি (the Gentiles)"-দের মধ্যে, বিশেষ করে ইয়াহূদীরা যাদেরকে "বাঁদীর সন্তান" ও মুর্খ জাতি হিসেবে অত্যন্ত ঘৃণা করত তাদের মধ্যে

কোনো পাঠক জানেন যে, বিগত দেড় হাজার বৎসর ধরে ইহূদীগণ ইউরোপে ও সর্বত্র অত্যাচারিত হয়েছেন এবং একমাত্র আরব ও মুসলিম দেশগুলিতেই পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তিতে অবস্থান করেছেন। কিন্তু ইহূদীদেরকে প্রশ্ন করলে দেখবেন, তাদের অন্তর্জ্বালা অত্যাচারীদের প্রতি তত নয়, যতটা আরব ও মুসলিমদের প্রতি।

ভাববাদীর আবির্ভাবে ও তাদের উন্নতি ও প্রসিদ্ধিতেই তাদের অন্তর্জ্বালা ও মনোকষ্ট হতে পারে।

এছাড়া খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত আরবগণ ছাড়া অন্য কোনো জাতি আরবদের মত মূঢ় বা মুর্খ জাতি বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে নি। আরব জাতি ছাড়া অন্যান্য জাতির মধ্যে, বিশেষত গ্রীক, রোমান ও পারসিক জাতির মধ্যে সাধারণভাবে লেখাপড়া ও বিশেষভাবে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা বিদ্যমান ছিল। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, এ ভবিষ্যদ্বাণীটি আক্ষরিকভাবে আরব জাতির মধ্যে এক মহান নবীর- মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর- আবির্ভাবের কথা বলেছে, যার আবির্ভাব পৌত্তলিকতা, প্রতিমাপূজা, শূকরের মাংস ভক্ষণ ও অন্যান্য অনাচার-পাপাচারে লিপ্ত ইয়াহূদী জাতির স্থায়ী মনোকষ্ট ও অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করবে।

বস্তুত ইয়াহূদী-খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আবির্ভাব বিষয়ক অনেক ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। কোথাও তাঁর কথা, কোথাও তাঁর উম্মাতের কথা, কোথাও তাঁর উপর অবতীর্ণ ওহীর কথা, কোথাও তাঁর জিহাদের কথা, কোথাও তাঁর আযান ও তাসবীহের কথা, কোথাও মক্কা মুকার্রামার কথা, কোথাও ইসলামের ব্যাপক প্রসারতার কথা বলা হয়েছে। অন্যান্য স্থানে

যীশুখৃস্ট উদাহরণ ও নমুনার মাধ্যমে তাঁর ও তাঁর উম্মাতের কথা বলেছেন, যেগুলি সুসমাচারগুলিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।[275]

---

[275] মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিছু ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। যিশাইয়র পুস্তকের ২১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "১৩ আরর দেশের উপরে দায়িত্ব The burden upon Arabia (বাংলা বাইবেলে: আরব বিষয়ক ভারবাণী)। হে দদানীয় (Dedanim) পথিক দলসমূহ, তোমরা আরবে বনের মধ্যে রাত্রি যাপন করিবে। ১৪ তোমরা তৃষিতের কাছে জল আন; হে টেমা-দেশবাসীরা (Tema), তোমরা অন্ন লইয়া পলাতকদের সহিত সাক্ষাৎ কর। ১৫ কেননা তাহারা খড়্গের সম্মুখ হইতে, নিষ্কোষিত খড়্গের, আকর্ষিত ধনুর ও ভারী যুদ্ধের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। ১৬ বস্তুতঃ প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, বেতনজীবীর বৎসরের ন্যায় আর এক বৎসর কাল মধ্যে কেদরের (Kedar) সমস্ত প্রতাপ লুপ্ত হইবে; ১৭ আর কেদর-বংশীয় বীরগণের মধ্যে অল্প ধনুর্ধর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, কারণ সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর, এই কথা বলিয়াছেন।"

একটি ভবিষ্যদ্বাণী যতটুকু স্পষ্ট হতে পারে তার চেয়েও স্পষ্টতর এই ভবিষ্যদ্বাণী। এখানে স্পষ্টভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরত ও বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উন্মুক্ত নিষ্কোষিত তরবারীর সম্মুখ থেকে পলায়ন করেন। পথিমধ্যে তাইমা/তিহামার উম্মু মা'বাদের নিকট থেকে পানি, দুগ্ধ ইত্যাদি গ্রহণ করেন। পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে বদরের যুদ্ধে কেদারের বা আরবের প্রতাপ লুপ্ত হয়। তাদের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ যোদ্ধা এই যুদ্ধে নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরত ও বদরের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োগ সম্ভব নয়।

যিশাইয়র পুস্তকের ৬০ অধ্যায়ে রয়েছে: "১ উঠ, দীপ্তিমতী হও, কেননা তোমার দীপ্তি উপস্থিত। সদাপ্রভুর প্রতাপ তোমার উপরে উদিত হইল। .... ৬ তোমাকে আবৃত করিবে উষ্ট্রযূথ, মিদিয়নের ও ঐফার দ্রুতগামী উষ্ট্রগণ; শিবা দেশ হইতে সকলেই আসিবে; তাহারা সুবর্ণ ও কুন্দুরু আনিবে, এবং সদাপ্রভুর প্রশংসার সুসমাচার প্রচার করিবে। ৭ কেদরের সমস্ত মেষপাল তোমার নিকটে একত্রীকৃত হইবে, নবায়োতের মেষগণ তোমার পরিচর্যা করিবে; তাহারা আমার যজ্ঞবেদির উপরে উৎসৃষ্ট হইয়া গ্রাহ্য হইবে, আর আমি আপনার ভূষণস্বরূপ গৃহ বিভূষিত করিব। (All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee, the rams of Nebaioth shall minister unto thee: they shall come up with acceptance on mine altar, and I will glorify the house of my glory)

এখানেও স্পষ্টত মক্কাকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে মক্কার পবিত্র ঘরের বিশ্বব্যাপী মর্যাদা লাভ ও বিশ্বের সর্বত্র থেকে মানুষের হজ্জে আগমনের কথা বলা হয়েছে। একমাত্র মক্কার 'আপনার ভূষণস্বরূপ গ্রহ' (the house of my glory) পবিত্র কাবাঘর ছাড়া অন্য কোথাও কেদরের সমস্ত মেষপাল একত্রীকৃত হয় নি। যিরূশালেমের ধর্মধামেও না, খৃস্টানদের মহাচার্চ, ভ্যাটিকান বা অন্য কোথাও নয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে, একমাত্র কেদরের সমস্ত মেষপালই সম্পূর্ণভবে খৃস্টীয় চার্চের প্রভাব থেকে মুক্ত থেকেছে।

হবক্কূকের পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ের বক্তব্য: "৩ ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন, পারণ পর্বত হইতে পবিত্রতম আসিতেছেন। আকাশমন্ডল তাঁহার প্রভায় সমাচ্ছন্ন, পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় (হাম্দ) পরিপূর্ণ। (God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise)

আমরা দেখেছি যে, পারণ পর্বত ও পারণ প্রান্তর মক্কার প্রান্তর, যেখানে ইসমাঈল (আ) ও তাঁর বংশধর বসতি করেন। এখানে পারণের পবিত্রতম বলতে স্পষ্টতই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বুঝানো হয়েছে। বিশেষত পরের বাক্যে 'পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ' বলে স্পষ্টতই তাঁর নাম 'মুহাম্মাদ' বা প্রশংসিত তা বুঝানো হয়েছে।

গীতসংহিতার ৭২ গীতে বলা হয়েছে: "৮ তিনি এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্যনত, ঐ নদী অবধি পৃথিবীর প্রানত পর্যনত কর্তৃত্ব করিবেন। ৯ তাঁহার সম্মুখে মরুনিবাসীরা নত হইবে, তাঁহার শত্রুগণ ধুলা চাটিবে। ১০ তর্শীশ ও দ্বীপগণের রাজগণ নৈবেদ্য আনিবেন; শিবা ও সবার রাজগণ উপহার দিবেন। ১১ হাঁ, সমুদয় রাজা তাঁহার কাছে প্রণিপাত করিবেন; সমুদয় জাতি তাঁহার দাস হইবে। ১২ কেননা তিনি আর্তনাদকারী দরিদ্রকে, এবং দুঃখী ও নিঃসহায়কে উদ্ধার করিবেন। ১৩ তিনি দীনহীন ও দরিদ্রের প্রতি দয়া করিবেন, তিনি দরিদ্রগণের প্রাণ নিস্তার করিবেন। ১৪ তিনি চাতুরী ও দৌরাত্ম হইতে তাহাদের প্রাণ মুক্ত করিবেন, তাঁহার দৃষ্টিতে তাহাদের রক্ত বহুমূল্য হইবে; ১৫ আর তাহারা জীবিত থাকিবে; ও তাঁহাকে শিবার সুবর্ণ দান করা যাইবে, লোকে তাঁহার নিমিত্ত নিরনতর প্রার্থনা করিবে, সমস্ত দিন তাঁহার ধন্যবাদ করিবে (prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised)।"

এ কথাগুলিও স্পষ্টত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিষয়ে বলা হয়েছে। তিনি ও তাঁর উম্মাতই সমুদ্র থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ও পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত রাজত্ব লাভ করেন। একমাত্র তাঁর সামনেই মরুনিবাসীরা নত হয় এবং বিভিন্ন রাজ্যের রাজার বশ্যতা স্বীকার করে। তিনিই দরিদ্র ও অসহায়দের রক্ষার জন্য সর্বজনীন আইন প্রদান করেন ও কল্যাণমুখি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। কেবলমাত্র

ইসলাম ধর্মেই নিয়মিত ও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর উপর সালাত-সালাম পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে। সর্বোপরি একমাত্র তিনিই সবত্র 'প্রশংসিত' (মুহাম্মাদ)।

যিশাইয়র পুস্তকের ৫ অধ্যায়ের ২৬ আয়াতে রয়েছে: "তিনি দূরস্থ জাতিগণের প্রতি পতাকা তুলিবেন, পৃথিবীর প্রানতবাসীদের জন্য শিস দিবেন; আর দেখ, তাহারা দ্রুতগমনে সত্বর আসিবে।" বাহ্যত এখানে হজ্জের বিষয়ে বলা হয়েছে।

যিশাইয়র পুস্তকের ২১ অধ্যায়ে রয়েছে: "৬ বস্তুতঃ প্রভু আমাকে এই কথা কহিলেন, যাও, এক জন প্রহরী নিযুক্ত কর; সে যাহা যাহা দেখিবে, তাহার সংবাদ দিউক। ৭ এবং সে দেখিল দুই জন করিয়া অশ্বারোহীসহ একটি রথ, গর্দভের একটি রথ এবং উষ্ট্রের একটি রথ, এবং সে যথাসাধ্য সাবধানে কর্ণপাত করিল: And he saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses, and a chariot of camels; and he hearkened diligently with much heed (বাংলা বাইবেলে: "যখন সে দল দেখে, দুই দুই জন করিয়া অশ্বারোহীদিগকে, গর্দভের দল, উষ্ট্রের দল দেখে তখন সে যথাসাধ্য সাবধানে কর্ণপাত করিবে।") ... ৯ আর দেখ, এক দল লোক আসিল; অশ্বারোহীরা দুই দুই জন করিয়া আসিল। আর সে প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল, 'পড়িল, বাবিল পড়িল, এবং তাহার দেবগণের সমস্ত ক্ষোদিত প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইল। (Babylon is fallen, is fallen; and all the graven images of her gods he hath broken unto the ground)। এখানেও বাহ্যত গর্দভের রথ বলতে যীশুকে এবং উটের রথ বলতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বুঝানো হয়েছে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের পরে তাঁরই সাহাবীদের হাতে বাবিলের পতন ঘটে এবং তথাকার প্রতিমাগুলি ভূমিসাৎ হয়।

হগয় ভাববাদীর পুস্তকের ২ অধ্যায়ের ৭ আয়াতে বলা হয়েছে: ৭ আর আমি সর্বজাতিকে কম্পান্বিত করিব; এবং সর্বজাতির মনোরঞ্জন বস্তু সকল আসিবে

(And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come)।

রেভারেন্ড প্রফেসর ডেভিড বেঞ্জামিন আরমেনীয়ার একজন বিশপ ছিলেন। তিনি খৃস্টধর্মের উপরে সর্বোচ্চ লেখাপড়া করেন এবং গ্রীক, ল্যাটিন, সিরিয়ান, আরামাইক, হিব্রু, কালডীয়ান ইত্যাদি ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন ১৯০০ সালের দিকে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত অনেকগুলি মূল্যবান পুস্তকের একটি (Muhammad in the Bibble)। এই পুস্তকে তিনি হিব্রু, আরামাইক ও অন্যান্য ভাষার পান্ডলিপি থেকে প্রমাণ করেছেন যে, এখানে (desire) বা মনোরঞ্জন শব্দের স্থলে মূলত 'হামদা' বা 'আহমদ' শব্দ রয়েছে। তিনি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করেছেন।

গীতসংহিতার ৯৬ গীতের ৪ আয়াতে বলা হয়েছে: ''কেননা সদাপ্রভু মহান ও অতি কীর্তনীয় (For the LORD is great, and greatly to be praised)।'' এই আয়াতের প্রাচীন আরবী অনুবাদে 'মুহাম্মাদ' শব্দটি স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে বলে হিজরী অষ্টম শতকের প্রসিদ্ধ আলিম ইবনু তাইমিয়া (৭২৮হি/১৩২৮খৃ) উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয় যে, তৎকালীন সময়ে ১৪শ খৃস্টীয় শতকে সিরিয়ান ও কালদীয় খৃস্টানদের মধ্যে যে বাইবেল প্রচলিত ছিল তিনি এবং তৎকালীন মুসলিম আলিমগণ সেগুলির উপরেই নির্ভর করতেন। তাদের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়ে বাইবেলের পুস্তকগুলিকে অধ্যায় ও পংক্তিতে ভাগ করার নিয়ম প্রচলিত হয় নি। এজন্য তিনি শুধু পুস্তকের নাম উল্লেখ করেছেন, অধ্যায় ও পংক্তির নম্বর উল্লেখ করেন নি। এছাড়া তিনি বাইবেল থেকে আরো কয়েকটি উদ্ধতি প্রদান করেছেন, যেগুলিতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, কিন্তু উদ্ধৃতিগুলি বর্তমান

উপসংহার:

আমি মহান আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাকে এ সংক্ষেপিত গ্রন্থটি সমাপ্ত করার তাওফীক প্রদান করেছেন। আমার অনেক ভাই "ইযহারুল হক্ক" গ্রন্থের সংক্ষেপ প্রকাশের মহান দায়িত্ব পালনের জন্য আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। আমি মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থন করছি, এ গ্রন্থের মাধ্যমে তারা যে আশা করেছিলেন তা যেন মহান আল্লাহ পূরণ করেন। আমি মহান আল্লাহর দরবারে আরো প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন গ্রন্থটির দ্বারা সত্য-সন্ধানী পাঠককে উপকৃত করেন।

সম্মানিত পাঠক, এ গ্রন্থ থেকে আপনি "পবিত্র বাইবেল" বা "কিতাবুল মুকাদ্দাস"-এর পুরাতন ও নতুন নিয়মের গ্রন্থগুলির প্রকৃত

প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের একটি আয়াতে বলা হয়েছে: "হে ঈশ্বরের পবিত্র, মুহাম্মাদ, তোমার নাম চিরস্থায়ী।" এই পুস্তকের অন্য আয়াতে রয়েছে: "হে ঈশ্বরের পবিত্রতম, মুহাম্মাদ, আমি তোমার বিষয় জানিয়েছি।" অন্য আয়াতে রয়েছে: "আমার প্রিয় ও আমার পুত্র আহমদ।" অন্য আয়াতে রয়েছে: "আমরা পৃথিবীর প্রান্ত থেকে মুহাম্মাদের রব শুনিলাম।" তিনি যহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তক থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ কেদারের সন্তানগণকে একটি পুস্তক দান করবেন এবং তাদেরকে ইহূদীদের উপর প্রাধান্য দান করবেন। বর্তমান প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান যিশাইয় ও যিহিষ্কেল ভাববাদীর পুস্তকদ্বয়ে এই আয়াতগুলি পাওয়া যায় না।

অবস্থা জানতে পেরেছেন। এ গ্রন্থ প্রমাণ করেছে যে, ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের নিকট পুরাতন ও নতুন নিয়মের কোনো একটি পুস্তকেরও কোনো অবিচ্ছিন্ন বর্ণনা-সূত্র নেই। আসমানী কিতাব বা ওহীলব্ধ গ্রন্থ হওয়ার কোনো বৈশিষ্ট্য এ গ্রন্থগুলির মধ্যে নেই। উপরন্তু গ্রন্থগুলির বৈপরীত্য, পরস্পর বিরোধী সাংঘর্ষিক বক্তব্য, ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতিতে পরিপূর্ণ।

এছাড়া এ গ্রন্থ প্রমাণ করেছে যে, ত্রিত্ববাদ এবং যীশুখৃস্টের ঈশ্বরত্বের মতবাদ বাতিল ও ভিত্তিহীন। এ গ্রন্থ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে, যীশুখৃস্ট আল্লাহর সৃষ্ট একজন মানুষ ছিলেন এবং তিনি আল্লাহর দাস (বান্দা) ও প্রেরিত (রাসূল) ছিলেন।

খৃস্টান মিশনারি, প্রচারক ও প্রাচ্যবিদগণ কুরআন কারীম ও হাদীস শরীফের বিরুদ্ধে যে সকল অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি উত্থাপন ও প্রচার করেন সেগুলি এ গ্রন্থে জ্ঞানবৃত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে বাতিল ও ভিত্তিহীন প্রমাণ করা হয়েছে। অসংখ্য অকাট্য দলিল প্রমাণ করে যে, কুরআন কারীম মহান আল্লাহর বাণী, যা তিনি তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর অবতীর্ণ করেন।

আমরা দেখেছি যে, ইয়াহূদী-খৃস্টানগণের ধর্মগ্রন্থগুলি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। এ সকল গ্রন্থের বিকৃতি সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত অনেক ভবিষ্যদ্বাণী

এগুলির মধ্যে বিদ্যমান, সেগুলির সত্যতা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নুবুওয়াত ছাড়া অন্য কোনোভাবে বাস্তবায়িত হয় না। “বাইবেলের” অনেক বক্তব্যই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য নবী ছিলেন এবং তিনি জগৎসমূহের জন্য প্রেরিত রাসূল ছিলেন।

সুপ্রিয় বিজ্ঞ পাঠক, আসুন আমরা হটকারিতা, জিদ ও গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে নিজেদের মুক্তির জন্য সেই দ্বীনকে বাছাই করি, যা মহান আল্লাহ সকল মানুষের জন্য পছন্দ করেছেন। তিনি বলেছেন: “নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন।”

হে আল্লাহ, আমাদেরকে বিভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে রক্ষা করুন। আর আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর নিমিত্ত।